Title - Akhanda-Samhita,Khanda.11
Author - Sri Sri Swarupananda Paramhansa Deva
Language - bengali
Pages - 294
Publication Year - 1943
Created by SRI Tapan Kr Mukherjee, Dhanbad
Khanda 11

স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবের

উপদেশ - বাণী

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রী শ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব
Collected by Mukherjee T.K.,Dhanbad
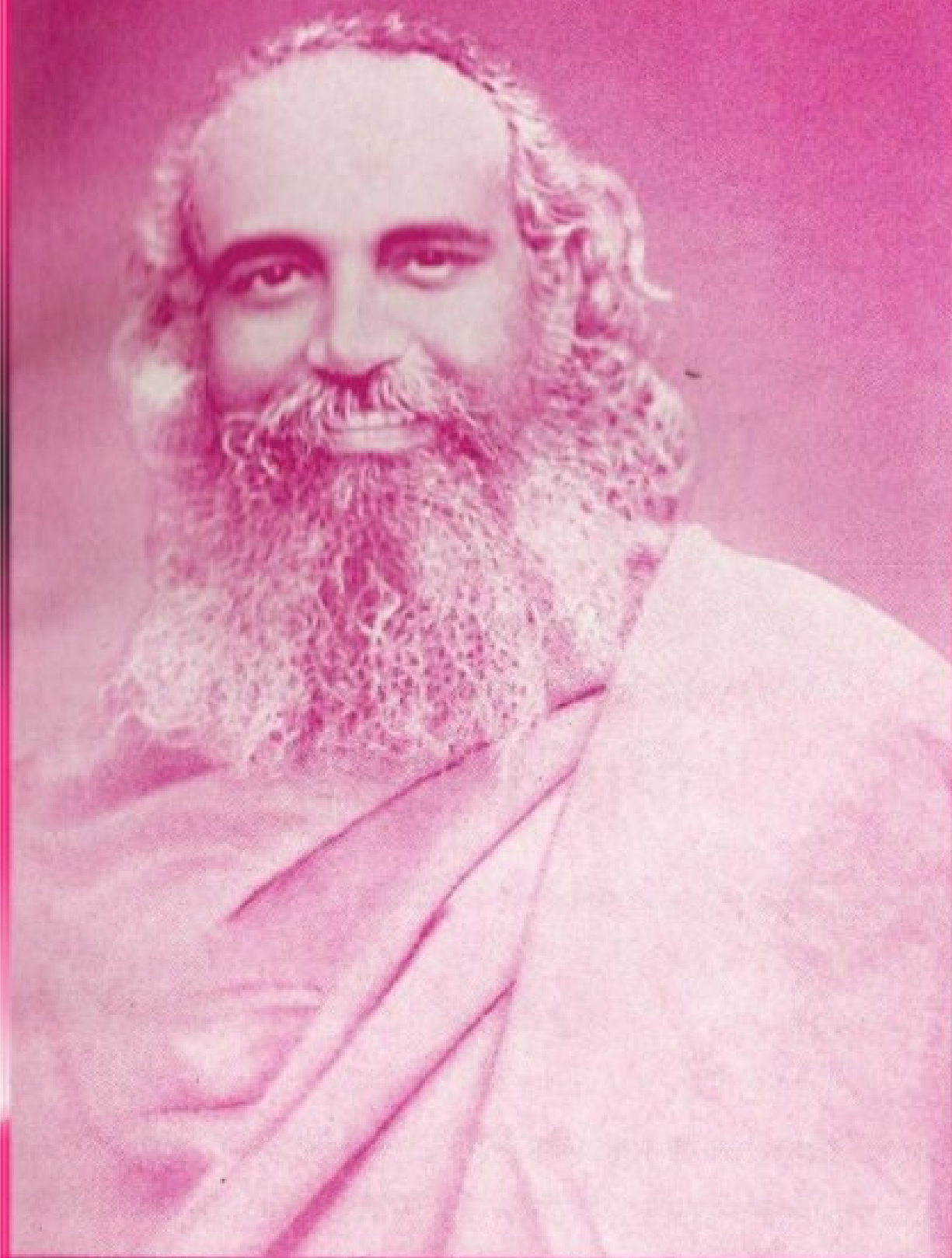
ওঁ

অখণ্ড-সংহিতা

বা

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের

উপদেশ-বাণী

একাদশ খণ্ড

কুমিল্লা,
১১ই পৌষ, ১৩৪০

গত রাত্রে অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব কুমিল্লা আসিয়াছেন। সহরে দুই তিনটী প্রিয় স্থানে শ্রীশ্রীবাবামণি প্রিয়জনদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। সর্ব্বত্রই অল্লাধিক দর্শনার্থীর ভিড় হইয়াছে। কেহ শুধু একটী ভক্তিনত প্রণাম করিয়াই নিঃশব্দে অবস্থান করিয়াছেন, কেহ বা প্রশ্ন করিয়াছেন।

ত্রিবিধ কর্ত্তব্য

একজনের একটী প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —তোমার যত রকমের যত কর্ত্তব্য আছে, একটু হিসাব কর্লেই তাকে তিনটী ভাগে বিভক্ত ক'রে নিতে পার। এক রকমের কর্ত্তব্য আছে, যা তুমি অবশ্য করণীয় বলেই জ্ঞান কচ্ছ, কিন্তু তার উদ্‌যাপনে ভগবদ্‌ভক্তির হ্রাস ঘটে। এক রকমের কর্ত্তব্য আছে, যাতে ভক্তির হ্রাসও ঘটে না, বৃদ্ধিও ঘটে না। এক রকমের কর্ত্তব্য আছে, যার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উভয় ফলই ভগবদ্‌ভক্তি। এই ত্রিবিধ কর্ত্তব্যের মধ্যে শেষোক্ত কর্ত্তব্যই শ্রেষ্ঠ, প্রথমোক্ত কর্ত্তব্য হেয়। শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্যই সর্ব্বতোভাবে পালনীয়, হেয় কর্ত্তব্য একান্ত প্রযত্নে বর্জ্জনীয়।

নাম ও পাপমুক্তি

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —ভগবানের নামে যখন রুচি এসেছে দেখ্‌বে, তখনই জান্‌বে যে, তোমার অতীতের পাপ, অপরাধ ও অজ্ঞান ক্ষয় পেতে আর দেরী নেই। ভগবানের নাম স্মরণ-মাত্র যখন তোমার ভিতরে এমন অপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হবে, স্বর্গসুখ, সাম্রাজ্য-লাভের সুখ, এমন কি জীবন্মুক্তির সুখের প্রতি বিন্দুমাত্র লোভ হবে না, তখন জান্‌বে যে, পাপ আর তোমাকে স্পর্শ কত্তে অধিকারী নয়, তুমি সর্ব্বপাপের উর্দ্ধে, সকল অশান্তির উর্দ্ধে, পরমপ্রেমলোকে স্থান পাবার যোগ্য হয়েছ। সুতরাং প্রাণপণে নাম কর্বে, যেন কর্ত্তে কর্ত্তে রুচি আসে, আগত রুচি প্রগাঢ় হয়

এবং প্রগাঢ় রুচির ভিতরে গভীরতম আনন্দের পরিবিকাশ ঘটে।

জীবসেবা ও পরসুখ

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —ব্যক্তিগত সুখলাভের প্রতি তোমার চিত্ত যত অনাসক্ত হবে, ততই তুমি সুখাধিকারী হবে। পরসুখই তোমার লক্ষ্য হউক। পরসুখ বল্‌তে মোটাকথায় জানবে তোমা ব্যতীত অন্য ব্যক্তিদের সুখ। সূক্ষ্মভাবে জান্‌বে পরম সুখ, যে সুখের চেয়ে বড় সুখ ত্রিজগতে কোথাও কিছু নেই। অপর ব্যক্তিদের সুখের ভিতরে নিজের সুখকে অন্বেষণ করা পরসুখ লাভেরই একটী প্রারম্ভিক উপায়। জীবসেবা এই জন্যই তোমার পরমকুশলের হেতু। জীবসেবা কর্ব্বে নিত্য কুশলের পানে চেয়ে, আর নিত্যকুশলের পানে ছুটে যাবে অবিরাম জীবসেবা কত্তে কত্তে।

জীবসেবার দুই দৃষ্টি-কোণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, জীবমাত্রকেই দুটি দৃষ্টিতে দেখ্‌তে পার। এক দৃষ্টি এই যে, প্রত্যেক জীবের মধ্যেই তুমি আছ, সুতরাং যে জীবেরই তুমি সুখ-সম্পাদন কর, সে সুখের তুমিই অধিকারী হচ্ছ। আর এক দৃষ্টি এই যে, তোমার পরমারাধ্য জীবন-দেবতা তাঁর বিশ্বব্যাপিনী মহাশক্তি নিয়ে চেতনারূপে প্রত্যেক জীবের ভিতর দিয়েই তোমার সেবা তোমার জীবনারাধ্যের চরণে গিয়ে পৌছুচ্ছে। এই দুইয়ের যেকোন একটী দৃষ্টি-কোণ থেকে দেখ্‌লে জীবসেবায় বন্ধন বাড়ে না, বন্ধন কমে। নতুবা, জীবসেবা থেকেও বন্ধন-বৃদ্ধির ভয় আছে।

নাম অপ্রাকৃত ও অতীন্দ্রিয়

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —মঙ্গলময় ভগবানের পবিত্র নামকে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য প্রাকৃত বস্তু বলে জ্ঞান করা ভুল। নাম অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব। মুখে তুমি যে নাম উচ্চারণ কর, কর্ণে তুমি যে নাম শ্রবণ কর, তা ত' নামের ধ্বন্যাত্মক প্রতীক মাত্র। লেখনী দিয়ে তুমি যে নাম লেখ, তা ত' নামের অক্ষরাত্মক প্রতীক মাত্র। শ্রবণ, উচ্চারণ আর লিখনের মধ্য দিয়ে ত' তুমি আর নামের যথার্থ স্বরূপ অনুভব কত্তে পার না ! তবে, এই অপূর্ণ শ্রবণ, অপূর্ণ উচ্চারণ, অপূর্ণ মনন, পূর্ণ উচ্চারণের, পূর্ণ মননের তোমার পরম সহায়ক।

পরনিন্দকের সঙ্গ-বর্জ্জন

অপর একটী প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— সাধুজনের যারা নিন্দা করে, তাদের সঙ্গে বাক্যালাপও পাপ, তাদের সঙ্গ নরকের জনক। কুতার্কিক পরনিন্দক লোকদের কাছ থেকে সর্ব্ব-প্রযত্নে দূরে থাকবে। কারণ, তাদের সঙ্গে থেকে ভগবানে অবিশ্বাস, নামে অরুচি এবং সাধনে নিষ্ঠাহীনতা জন্মায়।

নিন্দককে নিন্দা করিও না

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তুমি যাদের শুভানুধ্যায়ী, তা'দিগকে পরনিন্দকের সঙ্গ-বর্জ্জনের পরামর্শ দেওয়া তোমার কর্ত্তব্য।

* নামের স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীবাবামণি প্রায় দুই ঘণ্টাকাল উপদেশ করিয়াছিলেন। লিপিকারের অক্ষমতাহেতু সামান্যই লিখিত হইতে পারিয়াছে।

কেননা, নিত্য তুমি যাদের সঙ্গে থাক্‌বে, তারা পরনিন্দকের কুসংসর্গের ফলে নিজেরা যদি পুনঃ পরনিন্দক হয়ে দাঁড়ায়, তবে তোমার দাঁড়াবার স্থান জগতে থাকে না। কিন্তু একটী বিষয়ে সাবধান থেকো। একজনকে পরনিন্দকের সঙ্গ-বর্জ্জনে হিতোপদেশ দিতে গিয়ে নিজে পুনরায় পরনিন্দারূপ মহাপাপে লিপ্ত হয়ো না। পরনিন্দককে নিন্দা না ক'রে লোককে তার সঙ্গ-বর্জ্জনে উৎসাহিত করা এক কঠিন ব্যাপার। কিন্তু এই কঠিন কাজটাই তোমাকে কত্তে হবে।

নিন্দা ও যথার্থ-ভাষণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অনেকে বলেন,—"নিন্দা ত' কচ্ছি না, কচ্ছি যথার্থ-ভাষণ। মাতালকে মাতাল বলা নিন্দা নয়, তস্করকে তস্কর বলাও নিন্দা নয়, অসতীকে অসতী বলা নিন্দা নয়, লম্পটকে লম্পট বলাও নিন্দা নয়,—এ যে হচ্ছে যথার্থ-ভাষণ ! যথার্থ-ভাষণে পাপ নেই, পাপ হচ্ছে অযথার্থ দোষ আরোপ করায়।" কথাটায় যুক্তি আছে কিন্তু সত্য নেই। মাতালকে মাতাল না বলেও যদি আমি তার সঙ্গ থেকে আমার প্রিয়জনদের রক্ষা কত্তে পারি, তবে আমি তথাকথিত যথার্থ ভাষণেও জিহ্বাকে আসক্ত কর্ব্ব না,—পরনিন্দাবর্জ্জী পুরুষের এই হবে মনোবৃত্তি। অনেক ক্ষেত্রে যথার্থ-ভাষণেও নিন্দার পাপ আসে, কারণ, কুচরিত্র ব্যক্তির চরিত্র-বর্ণনায় তোমার ভিতরে কুচরিত্র এসে বাসা বাঁধবার সুযোগ পায়।

যথার্থ-ভাষণ ও হিংসা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই তথাকথিত যথার্থ-ভাষণের পিছনের উদ্দেশ্য অনেক সময়ে থাকে পরের মনে কষ্ট দেওয়া। কাণাকে কাণা বলা নিশ্চয়ই যথার্থ-ভাষণ, কিন্তু তাতে কাণার মনে কষ্ট হয়। এমন যথার্থ-ভাষণ বর্জ্জনীয়। খোঁড়াকে খোঁড়া বল্‌লে যথার্থ-ভাষণই হবে, কিন্তু খোঁড়ার প্রাণে তাতে ব্যথার সৃষ্টি হবে। এ ক্ষেত্রে যথার্থ ভাষণ হিংসারই নামান্তর। ভক্তিবাদীরা যখন আচার্য্য শঙ্করকে বা বুদ্ধদেবকে নিয়ে নানা প্রকার তথাকথিত যথার্থ-ভাষণ বলেন, তখন তাঁদের উদ্দেশ্য থাকে, শঙ্করকে বা বুদ্ধদেবকে হেয় করা বা তাঁদের অনুবর্ত্তিগণের প্রাণে ব্যথা দেওয়া। এরূপ যথার্থ-ভাষণ হিংসাবৃত্তির চরিতার্থতার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। একজন প্রবীণ ব্রাহ্মণকে বল্‌তে শুনেছি, "শ্রীগৌরাঙ্গের হ'ল ভাবাবেশে সংজ্ঞালোপ, আর জিজ্ঞাসু পাঠান সৈনিকদের কাছে তিনি বল্‌লেন,—ভাই, আমার ব্যারাম হয়েছিল,—।" এই কথা বলেই তিনি এমন সব যথার্থ-ভাষণ সুরু ক'রে দিলেন, ঐতিহাসিক যা অসত্য বল্‌তে পারবেন না, কিন্তু বৈষ্ণব-মাত্রেরই প্রাণে যাতে মর্ম্মান্তিক ক্লেশ হবে। মহম্মদের জীবনী নিয়ে এরূপ অনেক যথার্থ-ভাষণ হয়েছে, যাতে সমাজের মঙ্গল হয় নি একটী কণা, অথচ বহু মহম্মদ-ভক্তের প্রাণে কষ্টের সঞ্চার করা হয়েছে। তবে মহম্মদের চেলারা বৈষ্ণবদের মত "মেরেছ কলসীর কাণা, তাই ব'লে কি প্রেম দিব না," এই মতের নন, গুরুনিন্দার প্রতিশোধ তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রের মুখে নিতে চমৎকার অভ্যস্ত, ফলে ইংল্যান্ড-জার্ম্মেণীর মত নিতান্ত স্বাধীন দেশ ছাড়া অন্য দেশে এইরূপ যথার্থ-ভাষণ কিছু ভয়ে ভয়েই হয়েছে।

কিন্তু একজন যাকে যথার্থ-ভাষণ মনে কচ্ছে, অপরজন তাতে গুরুতর মনঃপীড়া পাচ্ছে,—এরূপ ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ ব্যক্তির সাধারণতঃ ভাষক ব্যক্তিরা বা ব্যক্তিদের হিংসাই লক্ষ্য ক'রে থাকেন। এইরূপ ভাষণ বর্জ্জনীয়।

অপ্রিয় যথার্থ-ভাষণ কখন প্রশস্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু এরূপ স্থলও আছে, যেখানে কঠোর সত্য, নিতান্ত অপ্রীতিকর ও লজ্জাজনক সত্য নির্ভয়ে প্রকাশ কত্তে হয়, এবং তাতে নিন্দার পাপ আসে না। তুমি একজনের চরিত্র-সংশোধন কত্তে চাও, তাকে পশুত্বের নিম্নতম স্তর থেকে টেনে এনে দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত কত্তে চাও, এস্থলে তার মঙ্গলের উদ্দেশ্যে প্রাণভরা প্রেম নিয়ে তার কু-চরিত্র তার কাছে তুমি বর্ণন করতে পার। তারই হিতের জন্য তারই নিকটে তার অপকর্ম্মসমূহের বিবৃতি দিয়ে এই সব অনিষ্টকর কাজ থেকে প্রতিনিবৃত্ত করতে চেষ্টা তুমি করতে পার। এমনকি, এরূপ কুকার্য্যের অনুষ্ঠান ক'রে অন্যত্র যদি অন্য কেউ পরিণামে গভীর দুঃখের পঙ্কে নিমগ্ন হয়ে থাকে, তবে সেই দৃষ্টান্তের আলোকে এসে সৎপথ প্রদর্শনের জন্য এবং সৎপথে চলবার উৎসাহ দেবার জন্য পাপিষ্ঠেরও পাপ-বর্ণনা কত্তে পার। যথার্থ-ভাষণ এই ক্ষেত্রেই প্রশস্য।

হিংসা-বৃত্তি রাক্ষসতার জননী

পরিশেষে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বৈষ্ণবদের এক গ্রন্থে

একটী পয়ার আছে।* যথা,—

"কলিযুগে রাক্ষস সকল বিপ্রঘরে
জন্মিবেক সুজনের হিংসা
করিবারে।"

অর্থাৎ মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্মের অনুবর্ত্তনে যে সকল মহাপুরুষ যত্নশীল হয়েছিলেন, তাঁদের অনেককেই নিন্দক ব্রাহ্মণদিগকে হিংসা পরায়ণ রাক্ষসগণের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। লঙ্কাদ্বীপে জন্মালেই কেউ রাক্ষস হয় না, অন্তরের ভিতরে হিংসা-বৃত্তিকে স্থান দিতে গেলেই মানুষ রাক্ষস হয়, মানব-শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরও সেই রাক্ষসত্ব থেকে রক্ষা নেই। যাতে হিংসা-রাক্ষসীর করতলগত হয়ে তোমরা কেউ মানুষ নামের অযোগ্য না হও, তার জন্য তোমাদের সকলের প্রাণপণ প্রয়াস একান্ত আবশ্যক। রাক্ষসীর পেটে জন্মগ্রহণ ক'রেই সদাচারী, জিতেন্দ্রিয়, অনিন্দক, ভগবদ্ভক্ত বিভীষণ দেবতার তুল্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়েছেন, আর তোমরা মানুষের পেটে জন্মেও কি শেষটায় হিংসাবৃত্তি আর নিন্দা-প্রবৃত্তির দোষে রাক্ষস হবে ?

কুমিল্লা
১১ই পৌষ, ১৩৪০

জীবনের দুই মহৎ কর্ত্তব্য

ভক্তদের সহিত কথাবার্ত্তা হইতেছে।

একজন জিজ্ঞাসুর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,

---

* চৈতন্য ভাগবত, আদি, ১৬শ

—তোমার জীবনের সবগুলি কাজই প্রধানতঃ দুইটী উদ্দেশ্যে পরিচালিত হওয়া চাই। একটী হচ্ছে, নিজে প্রেমিক হওয়া, প্রেমের সুমধুর আস্বাদন লাভ করা, অনিত্য জগতের সকল অনিত্যত্ব খণ্ডন ক'রে মরদেহ নিয়েই অমৃত আস্বাদন করা। দ্বিতীয়টী হচ্ছে, সকলকে প্রেমিক করা, সকলকে দিব্যানন্দের অধিকারী করা, ভেদাভেদ অগ্রাহ্য ক'রে সকলকে প্রেমপ্রবাহের মহা-বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া। তোমার অন্তর্মুখ কর্ত্তব্য নিজেকে প্রেমিক করা, তোমার বহির্ম্মুখ কর্ত্তব্য জগতের সকলকে প্রেমরস সম্ভোগে সমর্থ করা। এই দুইটী পরমমঙ্গল উদ্দেশ্যের পানে তাকিয়ে পথ চল, তোমার পা কখনো বিপথে যাবে না।

সে দিন নহেক দূর

শ্রীশ্রীবাবামণি গাহিলেন,—

সে দিন নহেক দূর
(তোর) অভিমান হবে দূর ,
ভিতরে বাহিরে এক হবি তুই
কৃপায় চির-প্রভুর।
ধরাধরি করি' হাতে,
সকলেরে নিয়ে সাথে,
অভয়-অমৃত কুড়াইবি তোরা
বিলাইবি সুপ্রচুর।
একাকী না করি' পান
সবারে করিবি দান,

নিজেও বুঝিবি, সবারে বুঝাবি,
তাঁর প্রেম কি মধুর!
নিজেও কাঁদিবি যত,
সবারে কাঁদাবি তত,
(হবে) নিত্য-প্রেমের সজল জলদে
হৃদয় চিরমেদুর।

নিখিল বিশ্বের মুক্তি

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —রূপ বল, বিদ্যা বল, জ্ঞান বল, ধন বল, ত্যাগ বল, আর তপস্যা বল, সবই সার্থক যদি তোমার উদ্ধারের সাথে সাথে জগদুদ্ধার হয়। একাকী মুক্তি দুর্ব্বলের, একাকী মুক্তি স্বার্থপরের। পরার্থপর সকল ব্যক্তি নিখিল বিশ্বের মুক্তি ছাড়া নিজের মুক্তি কখনো প্রার্থনা করেন না।

নামে রুচির লক্ষণ

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, - —নামে রুচির লক্ষণ জানো ? একবার নাম উচ্চারণে শতবার নামোচ্চারণের যখন সাধ যায়, তখন বুঝবে নামে রুচি এসেছে। এক রসনায় নামোচ্চারণ ক'রে প্রাণ তৃপ্তি মানে না, শত রসনা হোক্, এই আকাঙ্ক্ষা জাগে। একবার শ্রবণেই সঙ্গে সঙ্গে এমন ভাবের উদ্দীপন হয় যে, শত শত বার যেন শুনতে পাই। এইরূপ যখন হবে, তখন বুঝবে যে, নামে রুচি এসেছে। দুই

কর্ণে শ্রবণ ক'রেও সাধ মিটে না, দ্বিশত কর্ণ চাই, দ্বিসহস্র কর্ণ চাই, আমার এই একটী মাত্র দেহেই লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি কর্ণ চাই।

নামে রুচি ও লোক-মান

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নামের এমন এক আশ্চর্য্য শক্তি যে, তোমার ভিতরে যখন নামে রুচি এসেছে, তখন সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিকের নরনারী তোমার প্রতি সুতীব্র আকর্ষণ অনুভব ক'রে বিনা আমন্ত্রণে ছুটে আসবে। তখন কিন্তু সাবধান! তখন যদি লোকমান আর প্রতিপত্তির দিকে দৃষ্টি দাও, সঙ্গে সঙ্গে নামে রুচি হ্রাস পাবে, একেবারে সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে। যাতে মন লোক-প্রতিষ্ঠায় না ম'জে যেতে পারে, তার জন্য অবিরাম শুধু নামেই লেগে থাক্‌বে। নাম-সেবার ফলে যে মান, নাম সেবার ফলেই সেই মানের প্রতি অনাসক্ত ভাব এসে যাবে। তোমার অবিরাম নাম-সেবার ফল বিক্রী ক'রে তুমি লোকমান আহরণ কর্ব্বে, এর চেয়ে বড় দুর্দ্দশা ভক্তজীবনে আর কি আছে ? অনেক দেবমন্দিরই দেখে থাক্‌বে, যেখানে দেবতার মূর্ত্তি কার্য্যতঃ পূজকের বা সেবাইতের ভোগ-সামগ্রীর পাহারাদার ছাড়া আর কিছুই নন,—নিজেরা স্ত্রী-পুত্র পরিজন নিয়ে দিব্যি আরামে 'প্রসাদ' নাম দিয়ে চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় আহার কর্ব্বে আর দেবতার 'প্রণামী' নাম দিয়ে দর্শকের কাছ থেকে নৈবেদ্য ও অর্থ আদায় ক'রে তা' দিয়ে জুয়ার আড্ডা, নয় শুঁড়ীর বাড়ীর খরচ সঙ্কুলান কর্ব্বে,—একার্য্য যেমন পাপ, নাম-সেবার ফল বিক্রী

ক'রে লোকমর্য্যাদা অর্জ্জনও তেমনি পাপ।

শাস্ত্রজ্ঞানী ও তত্ত্বজ্ঞানী

অপর একটী প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শাস্ত্রজ্ঞান আর তত্ত্বজ্ঞান এক বস্তু নয়। অনেক সময়ে শাস্ত্রজ্ঞান তত্ত্বজ্ঞানের সহায়ক, অবশ্য যদি শাস্ত্রজ্ঞান তোমার অহঙ্কার, বহির্ম্মুখতা ও মদ বৃদ্ধি না ক'রে। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান সকল সময়ে শাস্ত্রজ্ঞানের তেমন তোয়াক্কা রাখে না। তত্ত্ব অসীম, শব্দ তাকে প্রকাশের জন্য অসম্পূর্ণ একটী প্রতীক। সুতরাং যত বড় শাস্ত্রজ্ঞানীই তুমি হও, তত্ত্বজ্ঞানীর চেয়ে তুমি বড় নও। ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী বা শাস্ত্র-শিরোমণি হওয়া শাস্ত্রজ্ঞান-সাপেক্ষ কিন্তু প্রেমিক হওয়া তত্ত্বজ্ঞান-সাপেক্ষ। প্রভূত শাস্ত্রজ্ঞানও অনেক সময়ে অজ্ঞানতার নামান্তর। আসল জ্ঞানের উন্মেষ হ'লে অন্তরের নীচতা আপনি দূরে যায়, অসরলতা, কপটতা, হিংসা-দ্বেষ-ঈর্ষ্যাপরায়ণতা চিরতরে পলায়ন করে, সন্তোষ, স্নিগ্ধতা, সততা আপনি এসে যায়। সুতরাং পণ্ডিত হ'তে পার, আর না পার, জ্ঞানী হও, এই হবে সর্ব্বাগ্রে কাম্য।

নগরপাড় (কুমিল্লা)
১৩ই পৌষ, ১৩৪০

গতকল্য অপরাহ্নে শ্রীশ্রীবাবামণি কোম্পানীগঞ্জের নিকটস্থ নগরপাড় গ্রামে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত রায়ের বাড়ীতে আসিয়াছেন।

সন্তানের জন্ম ভগবদিচ্ছাধীন

দূরাবস্থিত এক গ্রাম হইতে স্বামিসহ একটী মহিলা আসিয়াছেন তিনি সন্তান-হীনা। তাঁর একান্ত প্রার্থনা যে, দৈববলে তাঁর অন্ততঃ একটী পুত্র-সন্তান হউক এবং তিনি সেই শিশুকে পালন করিয়া প্রাণের শান্তি লাভ করুন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মা, তোমরা স্বভাবতই মা। নিজের পেটে কোনো সন্তান ধারণ কর্লেও মা, না কর্লেও মা। তোমার ভিতরে যে স্বাভাবিক মাতৃত্ব রয়েছে, সেই তোমাকে বাইরে আবার সন্তান পালন ক'রে নিজেকে চরিতার্থ কত্তে প্রেরণা দিচ্ছে। কিন্তু মা, সন্তান হওয়া আর না-হওয়া ত' তোমার ইচ্ছাধীন নয়! এ ব্যাপার সম্পূর্ণ ভগবদিচ্ছাধীন। কত জন চেষ্টা করে, সন্তান যেন না হয়, কারণ, তারা সন্তান পালন কত্তে অক্ষম,—তবু তাদের সন্তান হচ্ছে। আবার তোমার মত কত জন প্রার্থনা কচ্ছে, কোনও প্রকারে একটী কানা খোঁড়া ছেলে হলেও যেন হয়, কিন্তু বারো বৎসর তপস্যা ক'রেও সন্তান হচ্ছে না। সুতরাং সন্তানের জন্য উতলা না হ'লে সম্পূর্ণরূপে ভগবানে নির্ভর কর। তিনি দিতে হয় দেবেন, না দিতে হয় না দেবেন।

বন্ধ্যাত্বের শোনিতগত কারণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —ভগবদিচ্ছাই প্রধান। তবে, সন্তান হওয়া না-হওয়ার মধ্যে কতকগুলি নৈসর্গিক কারণও রয়ে গিয়েছে, যেগুলি উপলক্ষ। অনেক সময়ে স্বামীর রক্তের ভিতরে

এমন মারাত্মক বিষ থাকে, যার দরুণ সম্পূর্ণরূপে যোগ্যা স্ত্রীও সন্তানের জননী হয় না। অনেক সময়ে স্ত্রীর জরায়ুর ভিতরে এমন বিশৃঙ্খলা থাকে, যাতে স্বামী সম্পূর্ণ শক্তিমান্ হওয়া সত্ত্বেও সন্তান জন্মে না। এ সব স্থলে দ্রুত চিকিৎসার প্রয়োজন। চিকিৎসা সঠিকভাবে চল্‌লে রোগারোগ্যের সঙ্গে সঙ্গে সন্তানোৎপত্তি ঘটে। শরীরে গুরুতর শোণিত-ঘটিত পীড়া থাক্‌লে, তাদের পুত্র-কন্যা জড়বুদ্ধি, বিকলাঙ্গ, অল্পজীবী হয়ে জন্মায়। এই জন্য ভগবান্ এই সব ক্ষেত্রে বন্ধ্যাত্ব প্রদান ক'রে সমাজকে জড়বুদ্ধি, ও বিকলাঙ্গ পুত্র-কন্যার হট্টগোল থেকে রক্ষা করেন। এটা মন্দের ভাল বল্‌তে হবে।

সন্তান লাভের জন্য আত্মগঠন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অনেক স্থলে স্বামী এবং স্ত্রী দুজনেই শোণিতগত উৎকট বিষ থেকে মুক্ত থাকেন কিন্তু কতকগুলি কারণে পুত্র-কন্যার জনক-জননী হ'তে পারেন না। এক কারণ হচ্ছে,—অবিরাম অবিশ্রাম ইন্দ্রিয়-চর্চ্চা ক'রে ক'রে শরীরকে একেবারে নিস্তেজ ক'রে দেওয়া। এস্থলে দীর্ঘকাল সংযম-ব্রত পালন ক'রে ক্ষয়িত বলের পূরণ ক'রে নিলেই সন্তান-সন্ততির জন্ম আরম্ভ হয়ে থাকে। অপর কারণ হচ্ছে, বিবাহিত জীবনের কর্ত্তব্য ভাল ক'রে না জানা এবং প্রত্যেকটী আবশ্যকীয় বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ থাকা। সন্তান লাভের উদ্দেশ্য নিয়ে মিলিত হ'তে হ'লে তার জন্যও আত্মগঠন প্রয়োজন। তোমরা হা-হুতাশ পরিত্যাগ ক'রে সেভাবে আত্মগঠন কর। সন্তান হবে কি

না হবে, সেটী ভগবানের ইচ্ছা। কিন্তু এমন ভাবে আত্মগঠনে যত্নশীল হও যেন সন্তান কেউ এলে গর্ব্ব ক'রে বল্‌তে পারে, "আমি মানুষেরই ঔরসে মানুষেরই গর্ভে জন্মেছি।" পশুবুদ্ধি পরাধীন সন্তান এই গর্ব্ব কত্তে পারে না।

দত্তকপুত্র গ্রহণের উদ্দেশ্য

দত্তকপুত্র গ্রহণের কথা উঠিলে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আগেকার দিনে যে লোকে দত্তক-পুত্র গ্রহণ কত্ত, তার ভিতরে একটা মস্ত উদ্দেশ্য ছিল এই যে, নির্দ্দিষ্ট বংশের সাধন-ভজনের দ্বারা, কৌলিক বৈশিষ্ট্যের ধারা কেউ যেন অব্যাহত ভাবে রক্ষা ক'রে যায়। পরের ছেলেকে এনে নিজের সম্পত্তিটুকু দিয়ে দেওয়ার তাৎপর্য্য এই ছিল যে, সে যদি নিমকহারাম না হয়, তা' হলে কুল-দেবতার পূজা, বংশের বিশিষ্ট পার্ব্বণ সব সে নিখুঁত ভাবে রক্ষা ক'রে যাবে। তখন প্রত্যেকের নিজস্ব একটী কৌলিক ধারা ছিল, যা' অন্য কুলের ধারা থেকে সব সময়েই বিশিষ্ট থাক্‌ত। প্রত্যেক গৃহের কুল-দেবতা অপর গৃহের কুল-দেবতা থেকে একটা বিশিষ্ট কৌলীন্যের অধিকারী ব'লে গণ্য করা হত। আমার বাড়ীর গদাধর খুব জাগ্রত, তোমার বাড়ীর দামোদর তত জাগ্রত নন, এরূপ একটা মনোভাব অনেকের মধ্যেই থাক্‌ত। ফলে, অপুত্রক থাকার দরুণ গদাধরের সেবা-পূজা বন্ধ হ'য়ে যাবে এবং তাতে এই বংশের সকল লোক নরকস্থ হবে, এরূপ একটা অস্পষ্ট আশঙ্কাও থাকত। সুতরাং দত্তক-পুত্র গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। মুনি-ঋষিদের

যুগে দত্তক গ্রহণের কথা বড় একটা শুনা যায় না, কিন্তু ক্ষেত্রজ পুত্র লোকে এই উদ্দেশ্যেই লাভ কত্তে চেষ্টিত হত।

দত্তক ও পিণ্ড-প্রত্যাশা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু বাছা, যুগের যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটেছে। নানা প্রকার সংস্কৃতির সংমিশ্রণে এবং সীমবদ্ধ দেবতাদের প্রতি সর্ব্বসাধারণের বিশ্বাস ও অনুরাগ ক্রমশঃ শিথিল হ'তে থাকায় অনেক বংশের কৌলিক বৈশিষ্ট্য কিছুই থাক্‌ছে না। সুতরাং আমার সম্পত্তি পরে এসে খাবে, এই দুর্ভাবনা থেকে রক্ষা পাবার জন্যই লোকে দত্তক গ্রহণ কচ্ছে। কিন্তু মানুষের দৃষ্টিশক্তি এতই ক্ষীণ যে, যাকে দত্তক-রূপে গ্রহণ করা হয়েছে, সেও যে একান্তই পর, এইটুকু দেখেও দেখা যাচ্ছে না। পিণ্ডের আসায় দত্তক নেওয়া? সেটা অবশ্য মনকে বুঝাবার একটা মস্ত যুক্তি। কিন্তু দত্তকের দেওয়া পিণ্ডে তোমার যতখানি মুক্তি হবে, তোমার সম্পত্তি জন-সাধারণের হিতে বা ধর্ম্মার্থে দান ক'রে গেলে বিনা পিণ্ডেও তার চেয়ে অনেক অধিক মুক্তি হবে। দত্তক নিলে তোমার পিণ্ড দেবে একজনে, কিন্তু ভীষ্মের পুত্র ছিল না, দত্তকও ছিল না, তবু তাঁর মুক্তি হয়েছে। ভীষ্মের জন্য পিতৃপক্ষে জল তিলাঞ্জলি লক্ষ লক্ষ লোকে দিচ্ছে। জীবন ভ'র যদি পাপানুষ্ঠান কর, তবু শ্রাদ্ধ আর পিণ্ডের জোরে সদ্‌গতি লাভের আশা ক'রো না। জীবন জুড়ে যদি সৎকাজ কর, এবং মৃত্যুর পূর্ব্বে ব্যক্তিগত সব সম্পত্তি যদি সদনুষ্ঠানে দান ক'রে যাও, তবে তাতে শ্রাদ্ধ-পিণ্ড প্রভৃতি না হ'লেও সদ্‌গতি আটক

হবে না।

কাহাকে দত্তক নেওয়া উচিত

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দত্তকই যদি নিতেই হয়, তবে এমন কাউকে নেওয়া উচিত, যে নিরাশ্রয়, যে পিতৃ-মাতৃহীন, যে দয়ার যোগ্য, যে পালনের যোগ্য। দত্তক-গ্রহণে স্বজাতি খোঁজা দেশব্যাপী বদ্ধমূল সংস্কার এবং আইন এখন পর্য্যন্ত এর ব্যত্যয় সহ্য করে না। কিন্তু হৃদয়-বৃত্তির শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষের জন্য প্রত্যেক অপুত্রক অপুত্রিকার খুঁজে বেড়ান উচিত যে, কোথায় কে মাতৃহীন পিতৃহীন কোন্ অন্ধকার কোণে মায়ের খোঁজে বাপের খোঁজে ধুঁকে মরছে। মাতৃহীনকে মা দেওয়াই দত্তক গ্রহণের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, পিতৃহীনকে পিতা দেওয়াই দত্তক গ্রহণের একমাত্র সার্থকতা হওয়া উচিত। তোমরা দেশাচার-লোকাচার প্রভৃতির উর্দ্ধে আরোহণ কর, স্বাধীন মনে স্বাধীন প্রাণে স্বাধীন বিচারে নিজেদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ কর। একজনের স্বাধীন চিন্তা দশজনের ভিতরে স্বাধীন চিন্তা দিবে। তাতেই আস্তে আস্তে দেশের শ্রী ফিরে যাবে।

নগরপাড়, কুমিল্লা
১৪ই পৌষ, ১৩৪০

ভারতের জাতীয় প্রতিভা

বাঙ্গরা হইতে কয়েকটী যুবক শ্রীশ্রীবাবামণির উপদেশ শুনিতে আসিয়াছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমি বারংবার তোমাদের শুনিয়েছি

যে, ধর্ম্মই ভারতের জাতীয় প্রতিভা। আধুনিক শিক্ষাগর্ব্বী দু একজন তথাকথিত মনীষীকে একথা বল্‌তে শুনা যায় যে, কোনও দেশেরই নাকি কোনও "জাতীয় প্রতিভা" নেই, যে কোনও দেশকেই নাকি যে কোনো ছাঁচে গ'ড়ে তোলা যায়, এক একটী দেশের ভাগ্য এবং কর্ম্মগতি নাকি শুধু শিক্ষা আর প্রতিবেশ দিয়ে প্রাচীন কৃষ্টি ও সংস্কার থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন ক'রে নেওয়া যায়। পাণ্ডিত্যের ভান ক'রে যত লোক যত কথা বলেছেন, তার মধ্যে এর মত নির্জ্জলা মিথ্যা বোধ হয় আর কিছু হ'তে পারে না। ইংরেজের জাতীয় প্রতিভা আত্মপ্রত্যয়। জার্ম্মাণদের জাতীয় প্রতিভা সংগঠন ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা। ফরাসীদের জাতীয় প্রতিভা স্বাধীনতা-প্রিয়তা ও সৌন্দর্য্যজ্ঞান। ঐতিহাসিক বিপর্য্যয়ে এই সকল জাতির যার ভাগ্যে যে পরিণতিই ঘটুক, কেউ কি এখনো এরূপ আশঙ্কা কত্তে পারেন যে, এই সকল জাতি কখনও নিজ নিজ জাতির বিশিষ্ট প্রতিভা বর্জ্জন কত্তে সমর্থ হবে ? নিশ্চয়ই হবে না। ভারতবর্ষ কখনও তার জাতীয় প্রতিভার বিশিষ্টতাকে বিসর্জ্জন দিতে সমর্থ হবে না। ভারতের মৃত্তিকা-রেণুগুলির যদি কথা বলবার ক্ষমতা থাক্‌ত, তাহ'লে প্রত্যেকটী ধূলিকণা অনন্তকাল ধ'রে ধর্ম্মেরই মহিমা, ধর্ম্মেরই গরিমা, ধার্ম্মিকেরই কাহিনী প্রচার কত্ত। অথবা ক্ষমতা নেই, একথা বলছি কেন ? প্রত্যেকটী ধূলিকণা অবিরাম ধর্ম্মের ধ্বনি উচ্চারণ ক'রে যাচ্ছে, তোমাদের যোগ-শ্রুতির উন্মেষ হ'লে তোমরা সে মর্ম্মগীতি অবিরাম শুন্‌তে পাবে। হিমাচলের গিরি-গহ্বর থেকে কন্যাকুমারীর সমুদ্রতট পর্য্যন্ত, দ্বারকার

বারিধিবক্ষ থেকে ব্রহ্মকুণ্ডের গহনারণ্য পর্য্যন্ত প্রতিটী মৃত্তিকাপিণ্ড যুগযুগসঞ্চিত তপস্যার অবদান বক্ষে ধরে ভবিষ্যতের মহামানবদের আবির্ভাবের প্রতীক্ষা কচ্ছে। ভারতের আকাশ, ভারতের বাতাস ধর্ম্মের ভাবে ওতপ্রোত, ধর্ম্মের নেশায় মাতোয়ারা। ভারতের কাননে বৃক্ষলতার পত্রমর্ম্মরণে, কুঞ্জে কুঞ্জে পিককুলকূজনে, ভৃঙ্গগণের গুঞ্জরণে অনুক্ষণ ধর্ম্মেরই গান, ধর্ম্মেরই বাণী। ভারতের রাখাল গোঠে গাভী নিয়ে যায় ধর্ম্মেরই গান গেয়ে গেয়ে, যাত্রা-গান শোনে, কবি-গান শোনে, তাও ধর্ম্মেরই বিষয় নিয়ে। ভারতের কাব্য, শিল্পকলা গ'ড়ে উঠেছে ধর্ম্মেরই অবলম্বনে। স্মরণাতীত কাল থেকে আমাদের ভাষা, আমাদের সাহিত্য, আমাদের চিন্তাধারা, আমাদের ভাব-সংস্কার, আমাদের বিচার প্রণালী যে ভাবে ধর্ম্মের সাথে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ রেখে ক্রমবিকশিত হ'য়ে এসেছে, তাতে ধর্ম্মকে বাদ দিয়ে, ধর্ম্মকে উপেক্ষা ক'রে, ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে আমরা কোনও মহৎ উদ্দেশ্য সংসাধনে যে সমর্থ হ'তে পার্ব্ব, এরূপ চিন্তা অভিজ্ঞ মস্তিষ্কের পরিচায়ক নয়।

ভারতের দায়িত্ব

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যেই ধর্ম্মকে অবলম্বন ক'রে আমাদের জাতীয় বিশিষ্টতার প্রকাশ, সেই ধর্ম্মকে অবলম্বন ক'রেই পুনরায় আমাদের অভ্যুদয় লাভ কত্তে হবে। নিজের এবং সমগ্র জগতের প্রতি ভারতবর্ষের পবিত্র দায়িত্ব ও সুমহৎ কর্ত্তব্য আছে। সে দায়িত্ব দেশজয় ক'রে চির-পরাধীনের উপর

অনন্তকাল অভিভাবকত্ব করায় দায়িত্ব নয়, সেই কর্ত্তব্য ধর্ম্মপ্রচারের নাম ক'রে পিছনে পিছনে বাণিজ্য বহর আর তার পিছনে কামান, বন্দুক, বেয়োনেটের শ্রেণী প্রেরণ করা নয়। সে দায়িত্ব এক জাতিকে অপর জাতির চেয়ে নিকৃষ্ট জ্ঞান ক'রে তাদের মধ্যে সভ্যতা বিস্তারের নাম ক'রে দুনিয়ার যত অসভ্য এবং বর্ব্বর ব্যবস্থার পরিচালনে নয়। সে কর্ত্তব্য শিক্ষা-বিস্তারের নাম ক'রে চির-ক্রীতদাসের দল সৃষ্টি করায় নয়, উপকারের নাম ক'রে অপকারে নয়, উন্নত সভ্যতার আমদানীর দোহাই দিয়ে কর্ম্মক্ষমকে পঙ্গু, সবলকে দুর্ব্বল, অন্নদাতাকে অন্নহীন, বস্ত্রদাতাকে বস্ত্রহীন, জগতের জ্ঞানদাতাকে চিরতরে অজ্ঞান করায় নয়। সেটী হচ্ছে, ইহমুখতার অসহ্য জ্বালার মুখে ভগবদ্বিশ্বাসের গভীর শান্তি-প্রলেপ দিয়ে সংস্কার যাতনার লাঘব করা। ভারতবর্ষ শান্তির দেশ, শান্তিদাতার দেশ, গভীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধি-সমূহ লাভের দেশ এবং নিজের উপলব্ধ পরমা শান্তি জগতের হিততরে অকারণে বিতরণ করার দেশ। এই পবিত্র দেশে জন্মগ্রহণ ক'রে আমাদের প্রত্যেকের নিজেকে গৌরবান্বিত ব'লে অনুভব করা উচিত।

পল্লীতে পল্লীতে ধর্ম্মের পুনর্জ্জাগরণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু নিজের দেশের মহত্ত্বের বিষয় চিন্তা ক'রে শুধু গৌরব বোধ কর্লেই চলবে না,—এই ভারতের প্রত্যেকটী নর-নারীর অন্তরে জ্বলন্ত ধর্ম্মবোধকে পুনর্জ্জাগরিত ক'রে তুলতে হবে, প্রত্যেকটী পল্লীতে প্রত্যক্ষ উপলব্ধ ধর্ম্মের

সর্ব্বজনহিতকারী অক্ষয় বিজয়-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা কত্তে হবে। ধর্ম্মহীন ব্যক্তি আর পত্রহীন বৃক্ষ সমান। সত্যই আজ পত্রহীন বৃক্ষের ন্যায় ধর্ম্মহীন ব্যক্তিদের দ্বারা সমগ্র দেশ সমাচ্ছন্ন। ফলে একটী গ্রামেও ছায়া নেই, শোকের মুখে সান্ত্বনার স্থান নেই, বেদনার গভীর ক্ষতে শান্তি-প্রলেপ দিবার মত আপনার-জন একটীও নেই, সবাই তোমরা পরস্পরের শত্রু, সবাই তোমরা একে অন্যের হিংসক, বেদনাবর্দ্ধক, যাতনা-বর্দ্ধক, ক্লেশবর্দ্ধক, অহিতবর্দ্ধক। এই দুরবস্থার দিনে পল্লীতে পল্লীতে ধার্ম্মিক নরনারীর আবির্ভাবকে সম্ভব ক'রে তোলার জন্য তোমাদের উপর যুগ-দেবতার আকুল আহ্বান এসেছে।

পল্লীর মর্ম্মে ব্যভিচার

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমাদের প্রায় প্রত্যেকেরই নিজ নিজ নিবাস-পল্লীর মর্ম্মদেশে ধর্ম্মের নামে ব্যভিচার প্রবেশ ক'রে লোকচক্ষুর অজ্ঞাতসারে দারুণ সর্ব্বনাশ সাধন কচ্ছে। বাঁশের মাঝে ঘুণ যেমন গোপনে লুকিয়ে থাকে এবং অতি দৃঢ় বংশখণ্ডকেও কিছুদিন পরে লণ্ডভণ্ড ক'রে দেয়, তোমাদেরও তেম্‌নি সমাজের স্তরে স্তরে অতীব সঙ্গোপনে ব্যভিচার ঢুকে জাতির মেরুদণ্ডকে ভেঙ্গে দেবার উপক্রম ক'রেছে। চোর যখন নামাবলী গায়ে দিয়ে গৃহস্থের ঘরে ঢোকে, তখন তাকে চেনা সত্যই কঠিন। এই অবস্থায় সাবধান থাকাও কম কঠিন নয়। ঠিক তেম্‌নি ব্যভিচার যখন মিছামিছি ভাগবত আর চৈতন্য-চরিতামৃতের দোহাই দিয়ে ঘরে ঘরে প্রবেশ করে, তখন তাকে

চেনাও কঠিন, ঠেকানও কঠিন। প্রচ্ছন্ন লম্পটের দল লম্বশাটপটাবৃত হয়ে নিজেদের কুৎসিত লালসার কদর্য্য মূর্ত্তি সুললিত সংস্কৃত শ্লোকের আবরণে ঢেকে যখন পরিবারে পরিবারে প্রবেশ করে এবং পরকীয় রসের নাম ক'রে কুলবধূদের ও কুলকন্যাদের নিয়ে উৎকট প্রেত-তাণ্ডব ও উদ্ভট ধর্ম্মের অনুশীলন করে, তখন কেবা জান্‌তে পারে কি হচ্ছে, আর, কেবা বুঝ্‌তে যায়, এর ফল কি?

সহরের বুকে ব্যভিচার

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শুধু কি পল্লীতে পল্লীতে ব্যভিচার এভাবে গোপন পদ-সঞ্চারে নিজের আয়তন বিস্তার কচ্ছে? সহরে সহরেও সে নিজের প্রভাব প্রসারিত কচ্ছে। তবে, সেখানে ধর্ম্মের নামে নয়, কারণ সহরের লোক ধর্ম্মের ধার কম ধারে। ধর্ম্ম সেখানে একটা বাইরের ফ্যাসান, একটা লোকাচার। দুর্গোৎসব সেখানে হৃৎপিণ্ড নিংড়ান অর্চ্চনার অঞ্জলি নয়, একটা আমোদের হল্লা, একটা আমোদের উপলক্ষ্য, একঘেয়ে কর্ম্মজীবনের একটা রংচঙ্গে অবসর। তাদের প্রাণ উজাড় করে হয় স্বদেশ-প্রেম, নয় শিল্পানুরাগ, নয় সাহিত্যানুরক্তি। সুতরাং সহরের ব্যভিচার এই তিন বস্তুর ছদ্মবেশ প'রে নিজের কদর্য্য নারকীয় মূর্ত্তি গোপন করার চেষ্টা করে। নিরন্নকে অন্ন দেবার জন্য নাচের মজলিস্, ভূকম্প-পীড়িতকে সাহায্য দেবার জন্য সঙ্গীত-রজনী, বন্যা বা দুর্ভিক্ষের চাঁদা তোলার জন্য অভিনয়ের ব্যবস্থা, দুঃস্থ সাহিত্যিককে দুর্দ্দিনে সাহায্য করার জন্য বিচিত্র-বিলাস, এ সবই সহরের প্রধান আকর্ষণ। তাই, লম্পটের লাম্পট্য এসব আবরণের নীচে

নিজেকে লুকিয়ে রেখে লোকচক্ষুর অগোচরে নিজের অভিসন্ধি উদ্ধার করে। সুতরাং এখানেও তোমাদের করণীয় আছে। শুধুই একথা বল্‌লে চল্‌বে না,—"চল ফিরে গ্রামে।" "চল ভাই সহরে,"—এ কথাও বল্‌তে হবে। নৈতিক শক্তিকে দৃঢ় ক'রে তোলার জন্য, আধ্যাত্মিক আবেষ্টন সৃষ্টি ক'রে তার মধ্যে অপরের অন্তরের বিকাশকে অপঙ্কিল ও সহজ ক'রে তোলার জন্য, কৃত্রিমতার আতিশয্যে অন্তরাত্মা যখন নিজেকে নিজে চিন্‌তে পাচ্ছে না, তখন তার প্রজ্ঞার দৃষ্টি উন্মেষিত করার জন্য তোমাদের সত্যের বৈজয়ন্তী ধারণ ক'রে গ্রামেও যেতে হবে, সহরেও যেতে হবে, জনতায়ও যেতে হবে, জনবিরল পর্ব্বতে, কান্তারে, মরু-প্রান্তরেও যেতে হবে। স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে, প্রকাশ্যেই হোক্ আর গোপনেই হোক্, যেখানে ঘোরতর উচ্ছৃঙ্খলতা প্রসারিত হয়েছে, সেখানে জাতিকে এবং দেশকে যে কোন্ গুরুতর প্রায়শ্চিত্তের জন্য প্রস্তুত হ'তে হচ্ছে, কোন্ নিদারুণ পরিণতির দিকে এগিয়ে যেতে হচ্ছে, তা' তোমাদের ভাব্‌তে হবে, বুঝ্‌তে হবে, সকলকে তা' ভাবাতে হবে, বুঝাতে হবে। এজন্য তোমাদের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল স্থানে এক একটী সংঘ গঠন ক'রে ধারাবাহিক প্রযত্নে কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

অখণ্ড-মণ্ডলী স্থাপন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অনাচার, কদাচার ও ব্যভিচারের বিরুদ্ধে সক্রিয় বিদ্রোহ সৃষ্টির জন্য তোমাদের ঐক্যবদ্ধ হ'তে হবে। তোমাদের সমগ্র মন প্রাণ দিয়ে ঐক্যের মহাশক্তিকে

নূতন ক'রে জগতের সাম্‌নে প্রমাণিত করার মহাব্রত নিতে হবে। পল্লী থেকে তোমরা ব্যভিচার দূর কর্ব্বে, সহরের আবহাওয়া তোমরা পবিত্র, সুন্দর ও নৈতিক স্বাস্থ্যের পরিপোষক কর্ব্বে এবং ঐক্যকে প্রতিষ্ঠিত কর্ব্বার জন্য আবশ্যক হ'লে প্রাণদান কর্ব্বে,—এই সঙ্কল্প তোমরা কর। সর্ব্বত্র এক একটী ক'রে "অখণ্ড-মণ্ডলী" তোমরা স্থাপন কর এবং খণ্ড-বিখণ্ড সমাজকে অখণ্ড-প্রেমের অমর বন্ধনে এক কত্তে চেষ্টা কর, সংযত ও সংহত কত্তে প্রয়াস পাও। "অখণ্ড-মণ্ডলী" আন্দোলন অবিশ্বাসীর চিত্তে বিশ্বাস, হতাশের চিত্তে আশা, অলসের শরীরে অনালস্য, দুর্ব্বলের মনে বল এবং ব্যভিচারী, অনাচারী, কদাচারী ব্যক্তির মনে পাপ-ভীতি ও অন্যায়ে অরুচি সঞ্চারিত করুক। যে কারণে যুবকেরা বিপথে চলে, যুবতীরা পাপপথে পদার্পণে প্ররোচনা অনুভব করে, শান্তিময় গৃহস্থের দরিদ্র সংসারে সকলের দৃষ্টির অলক্ষ্যে মহা অশান্তি ও অপ্রীতি প্রবেশ করে, অখণ্ড-মণ্ডলীর আন্দোলন সেই সকল কারণকে সমূলে উৎখাত করুক। "স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতি-গোচরা" প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক শাস্ত্রবাক্যকে প্রামাণ্য বলে স্বীকার না ক'রে হিন্দুর আদি শাস্ত্র বেদগ্রন্থে পরিকীর্ত্তিত "সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী, সমানং মনঃ সহচিত্তমেষাম্" এই অব্যর্থ ঋষি-বাক্যকে অখণ্ড-মণ্ডলীর আন্দোলন সত্য ক'রে, সার্থক ক'রে তুল্‌তে চেষ্টিত হোক্।

আচণ্ডাল ব্রাহ্মণেরে ওঙ্কারের মহামন্ত্র গানে
জাগাও জাগাও আজি ; ব্রহ্ম-গায়ত্রীর মহাতানে।

অতীতের অন্ধকার আত্ম-অবিশ্বাস কর দূর,
নীচতা, হীনতা-বোধ শত খণ্ডে কর আজি চূর,
বীর্য্যবান্ ব্রাহ্মণের তপস্যার কুণ্ঠাহীন বল
ছোট বড় সকলের মর্ম্মদেশ করুক নির্ম্মল।
ঋষি-মহর্ষির সুত ঋষিতুল্য তপঃপুঞ্জ হোক্,
স্বর্গের নন্দন-শোভা লভুক কদর্য্য মর্ত্তলোক।
শোক-তাপ-জর্জ্জরিত প্রত্যেকের হৃদয়-কন্দরে
মৃত্যুহীন পারিজাত ফুটুক আজিকে থরে থরে।

এই হোক্ তোমাদের লক্ষ্য, এই হোক্ তোমাদের যত্ন। ''অখণ্ড-মণ্ডলী'' আন্দোলন পল্লীতে পল্লীতে প্রণবযুক্ত হরিনাম-কীর্ত্তনকে প্রচলিত কত্তে চেষ্টা করুক, নীচ বা অন্ত্যজ ব'লে কাউকে ঘৃণা না ক'রে সবাইকে সমবেত উপাসনার যোগ দেবার অধিকার প্রদান করুক, ভারতের ধর্ম্ম-সাধনার মন্ত্র-রাজির গঙ্গোত্রী-গুহা-রূপে ব্রহ্মগায়ত্রী মন্ত্রকে সর্ব্বসাধারণের শরণ্য ও উপজীব্য কত্তে চেষ্টা করুক, ওঙ্কারের গভীর স্পন্দনে মিথ্যা, অনাচার ও আত্মাভিমানের স্পর্দ্ধিত দর্প বিনষ্ট করুক। ''অখণ্ড-মণ্ডলী''-আন্দোলন ভেদ-বিচ্ছেদ-পরায়ণ, ভ্রাতৃ-বিদ্বেষে কলঙ্কিত, আত্ম-কলহ-রত জাতির প্রাণে ঐক্যের স্পৃহা, ঐক্যের প্রেরণা, ঐক্যের আগ্রহ জাগাতে থাকুক। পল্লীতে সহরে সর্ব্বত্র অখণ্ড-মণ্ডলী স্থাপন ক'রে ''হরি ওঁ'' কীর্ত্তন ক'রে গ্রাম প্রদক্ষিণ কর, ওঙ্কার-মন্ত্র কর্ণে প্রবেশ কর্ল্লে যাদের কাণে গলন্ত সীসা ঢেলে দেওয়া হ'ত, তাদের কণ্ঠে ভক্তি-বিগলিত স্বরে ''হরি-ওম্, হরি-ওম্'' সুমধুর কীর্ত্তনের গভীর আরাব উত্থিত হোক, গ্রামের ও সহরের

বালক ও যুবকদের মধ্যে সংযম ও ব্রহ্মচর্য্যের ভাব প্রচার কর এবং জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকে যেন পবিত্র গায়ত্রী-মন্ত্র জপ ক'রে পাপ-বর্জ্জিত হয়, এজন্য উৎসাহ প্রদান কর ; তাস-খেলা, পাশা-খেলা, পরনিন্দা, কুসঙ্গ, ধূমপান, দিবানিদ্রা ও বৃথা রাত্রিজাগরণ নিবারণ কর। "অখণ্ড-মণ্ডলী" স্থাপন ক'রে সমবেত উপাসনার মধ্য দিয়ে দেশে দেশে প্রাণের যোগ স্থাপন কর, এবং উপাসনাকেই ঐক্যের মূলমন্ত্র স্বরূপে গ্রহণ ক'রে সর্ব্বপ্রকার ভেদ-বিচ্ছেদ বিদূরিত কর।

পরধর্ম্ম-গ্লানি বর্জ্জন কর

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু একটা অদ্ভুত ব্যাপার তোমরা লক্ষ্য করলেই দেখ্তে পাবে যে, যখনি যে-কোনও নূতন আন্দোলন দেশে বা সমাজে উপস্থিত হয়, তখনি অত্যুৎসাহী একদল ধর্ম্মান্ধ ব্যক্তি নিজেদের নিষ্ঠার উগ্রতা বশতঃ একদিকে করে পরধর্ম্মের গ্লানি, অপর দিকে দেয় সাম্প্রদায়িকতার ইন্ধন। এর ফলে আন্দোলন নিজেকেই নিজে খণ্ডিত করে, বৃথা কলহের সৃষ্টি করে, লক্ষ্য ভুলে উপলক্ষ্যকে বড় করে এবং মুখ্য উদ্দেশ্য থেকে স্খলিত হ'য়ে অনেক সময়ে অকারণ অধর্ম্মেরই সৃষ্টি করে। সুতরাং তোমাদের এ বিষয়ে সাবধান হ'তে হবে। সমাজের ভিতরে একতা, দৃঢ়তা, সংহতি ও নৈকট্য-বোধ তোমরা বৃদ্ধি কর্‌বে কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার ইন্ধন দিবে না। হিন্দু হোক্, মুসলমান হোক্, খ্রীষ্টান হোক্ আর বৌদ্ধ হোক্ অখণ্ড-মণ্ডলীর সভ্য ও সেবকেরা সকলকেই এক পরমেশ্বরের সন্তান ব'লে

জ্ঞান কর্ব্বে। একই পিতার দুইটী পুত্র যদি দুই মুখে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যা করে বা নমাজ পড়ে, তাতে বিরোধের হেতু কি আছে? এক পিতার দুইটী পুত্র যদি ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ভগবানের বন্দনা করে, তাতেই বা কলহ কর্‌বার কারণ কি হ'তে পারে ? সুতরাং এই সঙ্কল্প দৃঢ় ভাবেই কর যে, কোনও ক্রমেই তোমরা পরধর্ম্মের গ্লানি কর্ব্বে না, তোমরা কোনও ক্রমেই সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিদ্বেষ-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হ'তে দিতে পার না। চতুর্দ্দিকে যে ধূমায়িত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দেখা যাচ্ছে, তা যতই দুঃসহ ও বিপজ্জনক হোক্, তাকে ক্ষণিকের দুঃস্বপ্ন জেনে তোমরা তার প্রভাব থেকে আত্মরক্ষা ক'রে প্রেমের পথে পাদচারণা কর্ব্বে। প্রেমের অমৃত নিজেরা পান কর, প্রেমের অমৃত দেশবাসী সর্ব্বজাতিকে সর্ব্ববর্ণকে পান করাও, তার ফলে নিজেরাও আত্মপ্রসাদ লাভ কর, অপরকেও শান্তি এবং পরিতৃপ্তি প্রদান কর। ''অখণ্ড-মণ্ডলী'' আন্দোলনের একমাত্র উদ্দেশ্যই যেন এই হয়।

নগরপাড়, কুমিল্লা
১৫ই পৌষ, ১৩৪০

প্রকৃত সেবা

গুঞ্জর, ত্রিশ ও মালিসাইর গ্রামের কয়েকজন যুবক আসিয়াছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সেবাই তোমাদের জীবন-ব্রত। কিন্তু দেশের সেবাই কর, সমাজের সেবাই কর, রোগীর সেবাই কর আর দরিদ্রের সেবাই কর, সর্ত্ত থাক্‌বে দুটী। প্রথমতঃ সেবা

যারই কর, উদ্দেশ্য তোমার হবে ভগবৎ-প্রীতি, ভগবৎ-সেবা, নিত্যচৈতন্যস্বরূপের তর্পণ, জড়-তোষণ নয়। দ্বিতীয়তঃ চিত্ত তোমার হবে নিরহঙ্কার, নিরভিমান, দর্পহীন ও বিনীত।

তুই যে রে ভাই করিস সেবা,
কে দিল সেই অধিকার ?
সেব্য যেই জন, সেই ত' আসল!
তোর আর কিসের অহঙ্কার ?
আর্ত্ত হ'য়ে কাঁদছে যে কেউ,
সুযোগ পেলি তার সেবার!
সেবা ক'রেই ধন্য যে তুই,
রাখবি মনে বারংবার।
নারায়ণের মূর্ত্তি ওরা,
ধ্যানেতে কর আবিষ্কার ;
জীবন-প্রভুর দেখা পাবি
ওদের মাঝেই পরিষ্কার।
ওদের সেবায় আত্মনিয়োগ
পরম-দাতার পুরস্কার,
সেবাতে হও অনুদ্ধত,
স্বার্থবিহীন, নির্ব্বিকার।

নগরপাড়
১৬ই পৌষ, ১৩৪০

সঙ্গের শক্তি

শ্রীযুক্ত রজনী কান্ত রায়, তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্র চন্দ্র

রায়, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র চন্দ্র মুন্সী এবং ত্রিশের শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র চন্দ্র দেব প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপদেশ-প্রার্থী হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —মহতের সঙ্গই মহৎ হবার পন্থা। নীচ, নিকৃষ্ট, নরাধমের সঙ্গ দ্বারা নীচতা বাড়ে, তাতে ভালো-মানুষও নিতান্ত পাপিষ্ঠ হ'য়ে যায়। একদিনে হয় না, আস্তে আস্তে হয়। চ'খে তা' ধরা পড়ে না কিন্তু বহুদিন পরে একদিন অতীতের জীবনের সঙ্গে তুলনা কত্তে গিয়ে হঠাৎ দেখা যায় যে, কি পাষণ্ডের জীবনই যাপন করা হচ্ছে। মহতের সঙ্গেও আবার তেমনি নীচ, নিকৃষ্ট, অধম ব্যক্তি ক্রমশঃ উচ্চ, উন্নত, ও উৎকর্ষ-বিশিষ্ট হয়। সে উন্নতিও প্রথমে তেমন ধরা পড়ে না, কিন্তু দীর্ঘকাল পরে লক্ষ্য করা যায় যে, জীবন কত উন্নত হয়েছে। তবে পতনের পথে নেমে মানুষ যেমন সহজে বুঝতে পারে না যে, কতটা নামা হচ্ছে, উন্নতির পথে উঠে তেমন নয়। একজন তার পতন হয়ত একমাস অসৎ-সঙ্গ ক'রে তবে ধরতে পারে, কিন্তু সে তার উত্থান এক সপ্তাহ সৎসঙ্গ ক'রেই বুঝতে পারে।

মহৎ চেনার উপায়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু মহৎ চিন্‌বে কি ক'রে ? সাহিত্যিক কবি বা বাগ্মীকে কি মহৎ ব'লে মনে কর্ব্বে ? মনোহারী বচনবিন্যাসকে কেউ হয়ত জীবিকা-রূপে গ্রহণ করেছেন। সুন্দর শব্দচয়ন, মধুর অলঙ্কার প্রয়োগ, সুশ্রাব্য ছন্দ দ্বারা একজন হয়ত লক্ষ লোকের মনোহরণ করেন, কিন্তু তাই ব'লেই কি তিনি মহৎ ? মহতের এসব গুণ থাক্‌তেও পারে।

কিন্তু না থাকলেও কিছু যায় আসে না। সাহিত্যিকের সঙ্গ ক'রে মানুষ সাহিত্যিক রুচি লাভ করে, কবির সঙ্গ ক'রে কবির স্বভাব না হোক্, অন্ততঃ একটা ঢংও পায়, বক্তার সঙ্গের ফলে মানুষ বক্তা হয়, কিন্তু মহতের সঙ্গে মানুষ মহৎ হয়। যাঁর সঙ্গ ক'রে মানুষ মহৎ হয়, তিনি কবি না হ'লেও, বক্তা না হ'লেও মহৎ। আর, যাঁর সঙ্গে ক'রে মানুষ কতকগুলি সাহিত্যিক বুলি মাত্র কপচাতে শিক্ষা করে, অথচ অন্তরে স্বার্থপর পশুটা ঠিক্ আগের মতই স্বার্থপর থেকে যায়, তিনি পৃথিবী-পূজ্য হলেও মহৎ নন।

প্রকৃষ্টতম সৎসঙ্গ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—একজন একজন ক'রে খ্যাতিমান্ লোকের সঙ্গ ক'রে দুচার মাস কাল কাটাবে, আর তার পরে হিসাব ক'রে দেখ্‌বে যে, তোমার ভিতরে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ এল কি না, এ ভাবে কত্তে গেলে খোঁজাখুঁজিতেই জীবন মাটি হ'য়ে যাবে। কেননা, অনন্ত পরমায়ু নিয়ে ত' কেউ ভূমিষ্ঠ হও নি। সুতরাং সহজ বুদ্ধিতে যাঁকে মহৎ ব'লে মনে হবে না, এবং যাঁর সঙ্গ করার সাথে সাথে অন্তরে দিব্য প্রেরণা বা আধ্যাত্মিক ভাবাবেশ উপলব্ধি কর্ব্বে না, তাঁর সঙ্গ করার জন্য চেষ্টা-চরিত্র না ক'রে, মহতেরও যিনি মহৎ, সেই পরমমহৎ ভগবানের মঙ্গলময় নামের সঙ্গ কর্‌বে। নামের সঙ্গই প্রকৃষ্টতম সৎসঙ্গ।

প্রকৃত মহৎ কে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কেউ মহৎ হবার জন্য বৈরাগ্যের

বেশ পরিধান ক'রে সাধনে রত হন, কেউ বা দান-ব্রত গ্রহণ ক'রে দীন-দুঃখী আতুরের জন্য অকাতরে অন্ন, বস্ত্র, অর্থ ও তৈজসাদি দানে নিরত হন, কেউ বা ভগবন্নাম কীর্ত্তন, ভগবদ্‌মহিমা-বর্দ্ধন ও ভগবৎ-কথা শ্রবণ দ্বারা সময়ের সদ্ব্যবহারে প্রযত্নপর হন। এরা সকলেই মহত্ত্ব-পথের ধন্য পথিক কিন্তু যতক্ষণ না চ'খের ঠুলি খ'সে যায়, অজ্ঞানান্ধকার দূর হয়, সকল আসক্তি বিনাশ পায়, ততক্ষণ প্রকৃত মহৎ কেউ হ'তে পারেন না। যিনি নিরস্ত-কুহক, যিনি নিত্য-সত্য-পরায়ণ, যিনি একান্তই ভগবৎ-পাদপদ্মে সম্যক্ আত্মসমর্পিত, তিনিই মহৎ। এরূপ মহৎ তোমরা প্রত্যেকেই হ'তে পার।

নগরপাড়,
১৭ই পৌষ, ১৩৪০

সাধনে গোপনতা

কতিপয় সাধনানুরাগী ব্যক্তি সমবেত হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সাধন কর প্রাণপণে, সাধন কর স্থির-মনে, সাধন কর দৃঢ়াসনে। সাধনের ফলে তোমার চরিত্রে যে মাধুর্য্য-গুণের উন্মেষ হবে, তার প্রভাব জগতের সকল নরনারীর উপরে প্রীতিকর হয়ে পতিত হোক্, কিন্তু নিজের সাধনের কথা লোকের কাছে প্রকাশ ক'রো না। সাধনে যত নীরব থাক্‌বে, সাধনের কথা যত গোপন রাখ্‌বে, ততই সাধন গভীর হবে, প্রখর হবে, ততই সাধনে দানা বাঁধবে।

কিরূপ গোপনতা বর্জ্জনীয়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সাধনে গোপনতা রক্ষা কর্ব্বে ব'লেই যে অনৈতিক ব্যাপার তার ভিতরে আমদানী হ'তে দেবে, তা' নয়। ''আপন ভজন কথা, না কহিও যথাতথা''—এই যুক্তির দোহাই দিয়ে অনেক স্থানে অনেক রকম অবাঞ্ছনীয় গোপনতার আমদানী করা হয়েছে, যার প্রত্যক্ষ ফল সাধকের নিরয়-নিবাস এবং পরোক্ষ ফল সমগ্র সমাজের দারুণ অধোগতি। তোমার সঙ্গে ভগবানের যে যোগাযোগ, তা' হবে অবিচ্ছিন্ন অবিরাম, কিন্তু তার মাঝখানে অন্য সাক্ষী যত কম থাকে, ততই ভাল। কিন্তু পাঁচজনে মিলে যখন সাধন কর্ব্বে, তখন আবার তার মধ্যে এমন গোপনতার আমদানী ক'রে বসো না, যার ফল আত্মনাশ ও জাতিধ্বংস।

নগরপাড়,

১৮ই পৌষ, ১৩৪০

ঈশ্বর-সাধক ব্যক্তির জীবসেবা

একজন প্রশ্ন করিলেন,—ঈশ্বর-সাধন-পরায়ণ ব্যক্তির জীব-সেবাদি কার্য্যে আত্মদান উচিত কিনা।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ঈশ্বর-ভজনের বিবিধ অবস্থা। এক অবস্থা আছে যাতে এক ঈশ্বর-চিন্তন, ঈশ্বর-সেবন, ঈশ্বর-স্মরণ ও ঈশ্বর-মনন ব্যতীত অন্য যে-কোনও চিন্তনে, সেবনে, স্মরণে বা মননে নিষ্ঠাহানি ঘটে। সাধনের এই অবস্থায় সাধক জীবসেবা, দেশসেবা, সমাজসেবা পরোপকার প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার

বহির্ম্মুখ সৎকর্ম্ম থেকেও সম্পূর্ণ প্রতিনিবৃত্ত থাকবেন। অসৎ কর্ম্মের ত' কথাই নেই। ঈশ্বর-ভজনের আবার এমন অবস্থা আছে, যাতে বহির্ম্মুখ সৎকর্ম্মাদির অনুষ্ঠান কর্লেও ঈশ্বরীয় স্মৃতি লুপ্ত হয় না এবং দীন, দরিদ্র, রুগ্ন, আতুর, অন্ধ, খঞ্জ, অধম, পতিত, অনাথ, নিরুপায় প্রভৃতি পার্থিব দুঃখে-দুঃখিত সকল জীবের দুঃখ-বিদূরণের ভিতরে ভগবানেরই অভিপ্রায়কে সুস্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। এস্থলে ঈশ্বর-সাধক জীবসেবার ভিতর দিয়েই ভগবৎ সেবার পূর্ণতা সাধন কর্ব্বেন। স্নান, আহার, বিশ্রাম প্রভৃতি নিতান্তই পার্থিব কার্য্য, কিন্তু ঈশ্বরার্থে জীবন-ধারণকারী ব্যক্তি সযত্ন-স্নানের দ্বারা, পুষ্টিকর আহারের দ্বারা, নিশ্চিন্ত বিশ্রামের দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে ঈশ্বর-ভজনই করেন, কেননা, দেহের পূর্ণ স্বাস্থ্য ও সবলতা বজায় না থাক্‌লে ঈশ্বর-ভজন অসম্ভব নয়। ঠিক্ তেমনি, ঈশ্বরার্থে জীবন ধারণকারী ব্যক্তি ঈশ্বরের সৃষ্ট জীবকুলের ঐহিক দুঃখের লাঘব-চেষ্টা দ্বারাও ঈশ্বর-ভজনই করেন। দৃষ্টি-ভঙ্গীর পার্থক্যে একই কার্য্যের দুই স্থানে দুই ফল হয়। ''আমি জীবের দুঃখ দূর কচ্ছি,''—এই বোধ নিয়ে যাঁরা জীবের সেবা করেন, তাঁদের কাজ একান্তই বহির্ম্মুখ। বহির্ম্মুখ কাজে চিত্তের চাঞ্চল্য বাড়ে এবং ঈশ্বরানুরাগ ও নামে রুচি হ্রাস পায়। বহির্ম্মুখ কর্ম্মে বন্ধন বর্দ্ধিত হয়, সংস্কারের নিগড় কঠোর থেকে কঠোরতর হয়, নানা জটিল কুটিল পঙ্কিল দুরবস্থা ও সাধন-সঙ্কটের সৃষ্টি হয়। কিন্তু ''ভগবৎ-প্রদত্ত কারুণ্য-গুণের প্রকৃষ্ট সদ্ব্যবহার ক'রে আমি ভগবানের সৃষ্ট জীবকে ভগবদভিমুখী করার জন্যই জীবসেবা কচ্ছি এবং

এই সকল জীব ভগবদনুরক্ত হ'লে আমারই সৎসঙ্গ লাভের সুযোগ বৃদ্ধি হবে,''—এই বোধ নিয়ে জীবসেবা কর্লে হাজার বহির্ম্মুখ কর্ম্মেও বন্ধন বাড়ে না বা কর্ম্মবিপাকে পড়তে হয় না।

বহির্ম্মুখ কাজের অন্তর্ম্মুখ উদ্দেশ্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দুর্ভিক্ষের সময়ে অন্নসত্র খুলে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ রক্ষার চেষ্টা অবশ্যই বহির্ম্মুখ কাজ। কিন্তু ''পৃথিবীতে যদি মানুষ না থাকে, সব যদি নির্ব্বংশ হ'য়ে যায়, তাহলে ঈশ্বর-ভজন কর্‌বে কে''—এই বোধ নিয়ে মুমূর্ষুর প্রাণ রক্ষার চেষ্টা কর্লে সেই চেষ্টা অন্তর্ম্মুখ কাজের রূপ ধরে। বন্যায় যারা ভেসে যাচ্ছে, তাদের কুড়িয়ে এনে রক্ষাও নিশ্চয়ই বহির্ম্মুখ কাজ। কিন্তু ''এবার যারা রক্ষা পাবে, ভগবানের সংহার-মূর্ত্তির পরেই জন-সেবকের সেবার ভিতর দিয়ে তারা ভগবানের কারুণ্য-ঘন কোমলমূর্ত্তি নিরীক্ষণ ক'রে ভগবৎ-পাদপদ্মেই আকৃষ্ট হবে,'' —এই আশা নিয়ে জন-রক্ষার চেষ্টা ক্রমশঃ অন্তর্ম্মুখ রূপ ধরে। অন্তর্ম্মুখ কাজ সাধন-ভজনের বিশেষ সহায়ক। বহির্ম্মুখ কাজ সাধন-ভজনে একনিষ্ঠা, একাগ্রতা ও মনঃসন্নিবেশনের বিঘ্ননাশক এজন্য সকল বহির্ম্মুখ কাজের ভিতরেই একটা অন্তর্ম্মুখ উদ্দেশ্য থাকা উচিত। তাহলেই বন্ধন-ভয় ক'মে যায়। অবিবেচক শাসকের অত্যাচার শিখদের অন্তর্ম্মুখ ধর্ম্ম-সাধনায়ও বিঘ্ন উৎপাদন কচ্ছিল। তাই, তারা শেষ পর্য্যন্ত অস্ত্র ধারণ ক'রে রণক্ষেত্রে প্রবল সংগ্রাম দিলেন। উদ্দেশ্যের দিকে তাকাতে হ'লে তাঁদের এই বহির্ম্মুখ কাজও তাঁদের অন্তর্ম্মুখ হবারই সহায়ক হয়েছিল।

বহির্ম্মুখ কর্ম্ম ও অন্তর্ম্মুখ কর্ম্মের কর্ম্মে সামঞ্জস্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বহির্ম্মুখ কর্ম্ম ছাড়া জগৎ চলে না, অন্তর্ম্মুখ কর্ম্ম ছাড়া শান্তি মিলে না। দুই দিক থেকে দেখ্‌তে গেলে দ্বিবিধ কর্ম্ম অপরিহার্য্য। সুতরাং ধর্ম্ম-প্রচারকদেরও উচিত নয় অন্তর্ম্মুখ কর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপনের জন্য বহির্ম্মুখ কর্ম্মের নাম শুন্‌লেই নাসিকা কুঞ্চন করা, সমাজ-সেবক কর্ম্মীদেরও উচিত নয় বহির্ম্মুখ কর্ম্মের কৌলীন্য প্রতিষ্ঠার জন্য অন্তর্ম্মুখ কর্ম্ম-মাত্রেরই প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা। এ উভয়ে প্রীতিপূর্ণ সামঞ্জস্য সম্ভব। তবে, সে সামঞ্জস্য শুধু ধীরবুদ্ধি, স্থির-মস্তিষ্ক, সুস্থচেতনার পক্ষেই করা সহজতর। যাঁদের বুদ্ধি একগুঁয়ে, মন সংস্কারান্ধ, স্বাধীন বিচারের শক্তি নিতান্ত সীমাবদ্ধ, এ সামঞ্জস্য তাঁদের পক্ষে কঠিন। অনেকে খুবই বড় স্বদেশ-সেবক, কিন্তু অন্তর্ম্মুখ মনের যে কি বিমল শান্তি, তা জানেন না ব'লে কালাপাহাড়ী মনোবৃত্তি পোষণ করেন। অনেকে আবার খুবই বড় তপস্বী পুরুষ, কিন্তু বহির্ম্মুখ সেবার ভিতর দিয়েও যে অন্তর্ম্মুখ সেবার উদ্বোধন হ'তে পারে, এই বিষয় বুঝতে একান্ত নারাজ। এসব একদেশদর্শী লোকের পক্ষে এই সামঞ্জস্য-বিধান একান্তই কঠিন। তর্কের মুখে হার স্বীকার কর্ল্লেও তাঁরা নিজ নিজ সংস্কারের প্রভাব অতিক্রম কত্তে পারেন না।

অন্তর্ম্মুখ কর্ম্মীর অকৃতজ্ঞতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বহির্ম্মুখ সমাজ-সেবকেরা যদি অন্তর্ম্মুখ কর্ম্মের গুরুত্ব না বোঝেন, তবে তাঁদের খুব বেশী দোষ

দিতে পারি না। কারণ, বহির্ম্মুখ ব্যক্তি স্বভাবতই কিছু দৃষ্টি-হীন হবেন। কিন্তু অন্তর্ম্মুখ ব্যক্তি যখন বহির্ম্মুখ কর্ম্মীদিগকে নিন্দা করেন, তখন তার যুক্তি পাই না। গোয়ালা গো-পালন না কর্ল্লে তাঁর যজ্ঞের হবিঃ মিলবে না। চাষা ইক্ষুচাষ না কর্ল্লে তাঁর বিগ্রহের জন্য চিনির মণ্ডা ভোগে চড়্‌বে না। গৃহস্থ ধান চাষ না কর্ল্লে তাঁর তপঃকৃশ তনুর নিত্যাবশ্যকীয় হবিষ্যান্ন মিলবে না। তাঁর ডোর-কৌপীন তাঁতি, জোলা প্রভৃতি বহির্ম্মুখ জীবেরা বুন্‌বেন, তবে তাঁর ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত রক্ষা হবে। তাঁর জপের রুদ্রাক্ষ-মালা নেপালের পাহাড় থেকে ঘাড়ে ক'রে বহির্ম্মুখ ব্যবসায়ী নিয়ে আসবেন, নইলে তাঁর নাম-সেবা বন্ধ থাক্‌বে। তিনি অন্তর্ম্মুখ সাধন করার জন্য তীর্থ-ভ্রমণ কর্ব্বেন, আর বহির্ম্মুখ সংসারী ড্রাইভার গাড়ীর ইঞ্জিন চালাবে। এত প্রকারে বহির্ম্মুখ-কর্ম্মকারীদের উপরে নির্ভরশীল হ'য়েও তাদের নরকের কীট, কৃপার পাত্র, ঘৃণ্যজীব ব'লে মুহুর্মুহু ললাটাস্ফালন ও নাসিকা-কুঞ্চন নিতান্তই অমার্জ্জনীয় অবিচার। শুধু অবিচার বল্‌ব কেন, অকৃজ্ঞতাও বলতে হবে।

প্রত্যেকের লক্ষ্য হউক অন্তর্ম্মুখ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জগতের সব লোকও যদি গৃহ-সংসার পরিত্যাগ ক'রে ডোর-কৌপীন-সম্বল নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব-বাবাজী হ'য়ে যান, তবু জগতে বহির্ম্মুখ কর্ম্ম থাক্‌বে। মঠ-নির্ম্মাণ, মঠবাসীদের আবশ্যকীয় সংস্থান, পরস্পরের ভিতরে শৃঙ্খলারক্ষা—এসব কাজেও বহির্ম্মুখ চেষ্টা ছাড়া উপায় নেই।

সুতরাং বহির্ম্মুখ কর্ম্ম মাত্রেরই প্রতি খড়্গহস্ত না হ'য়ে জগতের প্রত্যেক বহির্ম্মুখ-কর্ম্মকারী যাতে একটা সুমহান্ অন্তর্ম্মুখ উদ্দেশ্যকে সম্মুখে নিয়ে চলে, বলে, কাজ করে, সেই চেষ্টাই করা উচিত।

নগরপাড়,

১৯শে পৌষ, ১৩৪০

নিকটবর্ত্তী কোনও পল্লীর একটী চরিত্রবান্ যুবকের উপরে শ্রীশ্রীবাবামণি ভার রাখিয়াছেন যেন তিনি স্বগ্রামস্থ এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসী সুকুমার কিশোর এবং যুবকদিগকে সর্ব্বদাই আত্মোৎকর্ষ ও আত্মোন্নতি বিষয়ে উৎসাহ প্রদান পূর্ব্বক জাগৃতি সম্পাদন করেন।

বারংবার বল

উক্ত কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মী যুবক শ্রীশ্রীবাবামণির চরণে উপদেশার্থ আসিয়াছেন। তিনি প্রশ্ন করিলেন,—ছেলেদের একই কথা রোজ বলতে হচ্ছে। এতে বড়ই একঘেয়ে বোধ হয়।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সৎকথা ত' বার-বারই বল্‌তে হয়। একবার যে কথা বলেছ, সেই কথাই তোমাকে শতবার বল্‌তে হবে। শ্রোতা যে কথা একবার শুনেছে, সেই কথাই তাকে শত শতবার শুনাতে হয়। না হ'লে দৃঢ় হ'য়ে মনের ফলকে সেই সব কথা সম্বদ্ধ হবে কেন ? বৈজ্ঞানিকের পক্ষে এক কথার পুনরুক্তি দোষের। কিন্তু প্রচারকের পক্ষে এক কথার পুনরুক্তি না করাই দোষের। যে কথা শুনাতে চাও, বার বার বল। মৃদু কণ্ঠে বল,

বজ্র কণ্ঠে বল, স্নিগ্ধ স্বরে বল, রুদ্রস্বরে বল, প্রেমভরে বল, যুক্তি দিয়ে বল, সরল ভাষায় বল, কাব্যের ছন্দে বল, সহজ ক'রে বল, কঠিন ক'রে বল। বলবার যত প্রকার ভঙ্গিমা হ'তে পারে তত প্রকার ভঙ্গিমায় বল। তোমার প্রতিভা, কল্পনা-শক্তি, অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি, এবং নিষ্ঠা সব একযোগে যুক্ত ক'রে একই কথা শতবার বল, সহস্রবার বল, লক্ষবার বল, কোটিবার বল।

বাক্যের শক্তি বর্দ্ধনের উপায়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তবে বলার সত্যিকার শক্তিকে সঞ্চারিত করার জন্য নিজে হও সর্ব্বাগ্রে উদগ্র সাধক এবং জীবনের কর্ম্মকে রাখ সর্ব্ব প্রযত্নে পাপমুক্ত, অপরাধমুক্ত, দোষমুক্ত। বাক্যের শক্তিকে অপরাজেয় করার জন্য প্রথমে হও সত্যবাক্, পরে হও পরনিন্দাবর্জ্জী।

জীবন কতক্ষণ সার্থক

অপর একটী প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যতক্ষণ সাধন-ভজনে কাটাও, জীবন তোমার ততক্ষণই সার্থক। বাকী সময়টুকুকে বৃথা দেহভার-বহন বলে জ্ঞান কর্ব্বে। যতক্ষণ শ্বাসে প্রশ্বাসে নামজপ কচ্ছ, জীবন-ধারণ ততক্ষণই সত্য, অপর সময় তুমি শ্বাসগ্রহণকারী শবদেহ মাত্র; তোমার ফুসফুস কামারের ভস্ত্রা ছাড়া আর আর কিছুই নয়।

প্রচার-কার্য্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু চব্বিশটী ঘণ্টাই সাধনে ম'জে

থাকা সহজ কথা নয়, সকলের পক্ষে সম্ভবও নয়। এজন্য সাধন-জীবনের সময়টুকু বাদ দিয়ে বাকী সময়টুকু ভক্তিবর্দ্ধক অনুশীলনে যুক্ত রাখা প্রয়োজন। প্রচার-কার্য্যকে এরূপ একটী অনুশীলন বলে জ্ঞান কর্ব্বে। তুমি একটী জ্ঞানী পুরুষ, তাই অজ্ঞানদের জ্ঞান দিয়ে কৃতার্থ করার জন্য বেরিয়েছ,—এই জাতীয় তমসাশ্রিত হীনবুদ্ধিকে মনের ভিতরে স্থান দেবে না। সমগ্র জগৎকে ভগবদ্‌ভক্তে পরিপূর্ণ ক'রে জীবনে মরণে ভক্তজনসঙ্গে গলাগলি কোলাকুলি ক'রে প্রেমানন্দে হরিগুণগান কর্ব্বে,—তোমার প্রচার-কার্য্যের একমাত্র উদ্দেশ্য এই হওয়া উচিত। পাহাড়ে যাবে, পর্ব্বতে যাবে, নূতন নূতন উপনিবেশ স্থাপন কর্ব্বে, কত কৃষির, কত শিল্পের প্রবর্ত্তন করবে, এই যে এক পরিকল্পনা তোমরা আমার কাছ থেকে বহু বছর ধ'রে শুনে আসছ, তার উদ্দেশ্য এ নয় যে, পাহাড়ী জাতির ভিতরে ঢুকে তাদের সরলচিত্ততা ও অনভিজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তা'দিগকে একটা অর্থনৈতিক দাসত্বের নিগড়ে বাঁধ। পরন্তু তোমার ভজন-সাধনের জন্য নির্দ্দিষ্ট সময়টুকু বাদে অপর সময়টুকুতে এমন লোকহিত সাধনে ব্রতী থাক, যাতে ঐহিক সুখ-শান্তি বৃদ্ধির ফলেই মানুষ ভগবদ্-ভজনে অনুরক্ত হয়, পৃথিবী প্রেমপূর্ণ শান্তিপূর্ণ স্নেহপূর্ণ আনন্দপূর্ণ কোমলপ্রাণ মানব-মানবীতে পরিপূর্ণ হ'তে পারে। প্রেতচরিত্র মানব-সমাজ ঐহিকের সাথে আধ্যাত্মিক কুশলকে সমযূথ ক'রে নিতে যেন সমর্থ হয় এবং দেবচরিত্র মানব-সমাজে যেন পরিণত হয়। ক্ষুদ্র সুখে আসক্ত মানব, ক্ষীণদৃষ্টি অদূরদর্শী মানব যেন ভূমার সুখ আস্বাদন ক'রে কৃতকৃত্য

হয়, অনন্ত ভবিষ্যতের কুশলকে করায়ত্ত করার বিদ্যা যেন আয়ত্ত কত্তে পারে।

প্রকৃতির শিশু পার্ব্বত্য জাতি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পর্ব্বতবাসী, অরণ্যাচারী, তোমাদের চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে নামকরা সভ্যতা-সমূহের অনধিকারী, আদিম জাতির নরনারী এক বিষয়ে তথাকথিত সভ্য-সমাজের নরনারীর চেয়ে শতগুণে সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। সেইটী হচ্ছে এই যে, এদের মধ্যে কৃত্রিমতা অতি কম, উপর-চালাকি নামে কোনো বস্তু এদের চরিত্রে প্রায় নেই, পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে খাওয়ার স্বভাব এদের নেই, ফাঁকতালে লাভের লোভ এদের নেই। প্রকৃতির শিশু কোল, ভীল, সাঁওতাল, প্রকৃতির শিশু ওঁরাও, মাঝি, মুণ্ডা, প্রকৃতির শিশু জমাতিয়া, নোয়াতিয়া, রিয়াং, প্রকৃতির শিশু মলসুং, কাইফেং, চাকমা, প্রকৃতির শিশু আবর, মিকির, নাগা এই জন্যই আমার এত প্রিয়। যদি তুমি সৎ থেকে, সাধু থেকে, পরস্বাপহরণ না ক'রে, মিথ্যা না ব'লে নিজের জীবন চালাতে চাও, তবে এদের সঙ্গে থেকেই তা' সম্ভব। শিক্ষিত, বিদ্বান, পাণ্ডিত্যাভিমাণী, সভ্যতাদর্পী, বিজ্ঞানোজ্জ্বল ভদ্রলোকদের সঙ্গে বাস ক'রে সৎ, সাধু ও সত্যময় জীবন-যাপন এক নিদারুণ সমস্যা। সভ্য-সমাজের লোক ভদ্রতার খাতিরে মিথ্যা কথা বলে, সরল সত্যই যে শ্রেষ্ঠ ভদ্রতা, তা, বুঝতে চায় না। সভ্য সমাজের লোক বিবেককে লুকিয়ে রেখে কর্ম্ম পরিচালন করে, কর্ম্মের পুরোভাগে বিবেককে উন্মুক্ত ক'রে ধ'রে চলতে পারে

না। দৈনন্দিন প্রতি কাজে এত ছল, চাতুরী, এত কপটতার তারা আশ্রয় নেয় যে, তাদের সঙ্গ ক'রে সরল, অকপট কেউ থাক্‌তে পারে না। তাই তাদের সঙ্গই আধ্যাত্মিক উন্নতির অভিলাষী ব্যক্তিদের একান্ত কাম্য, যারা প্রকৃতির শিশু, কৃত্রিমতায় অনভ্যস্ত।

কুমিল্লা
২৬শে পৌষ, ১৩৪০

কল্য অপরাহ্নে শ্রীশ্রীবাবামণি কুমিল্লা আসিয়াছেন।

তরুণের দীক্ষার ভাল ও মন্দ

অদ্য প্রাতে শ্রীশ্রীবাবামণি দিগম্বরীতলা জনৈক ভক্ত-গৃহে আসিলেন। একটী হাস্যময়ী কুমারী শ্রীশ্রীবাবামণির নিকটে সাধন-দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি দীক্ষিত, অদীক্ষিত, পুরুষ ও নারী সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—দীক্ষা গ্রহণ ছোট থাক্‌তেই উত্তম, কেননা, তাতে সাধনের অভ্যাস অতি সহজেই মজ্জাগত হ'য়ে যায়। কিন্তু দীক্ষা-গ্রহণকারী যদি দীক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝতে অসমর্থ হয়, তাহ'লে দীক্ষার পূর্ণ-সুফল হ'তে দেরী লাগে। এই জন্যই প্রত্যেক পরিবারের পরিবেশ এমন থাকা দরকার, যেন ছোট কালেই বালক ও বালিকারা দীক্ষার প্রয়োজন, দীক্ষার অর্থ ও দীক্ষার উদ্দেশ্য উপলব্ধি কত্তে পারে।

আসক্তির খেলা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পরিণাম চিন্তা কত্তে গেলে এই মানব-জীবনটা একটা নিতান্তই খেলো জিনিষ, একটা অন্তঃসারশূন্য

ক্ষণিকের কুহেলিকা। এই আছে, এই নাই। এই মুহূর্ত্তে সুস্থ, এই মুহূর্ত্তেই অতি ঘৃণ্য ও ন্যক্কারজনক নানা ব্যাধিতে আক্রান্ত। এই সুখের দোলায় দুল্‌ছ, আবার এই এখনি আচম্বিতে দুঃখের সমুদ্রে ডুবে মর্‌ছ। এমন অচিরস্থায়ী, ক্ষণপরিণামী জীবনের ভবিষ্যৎ ভাব্‌লে এ জগতের যে-কোনও সুখ-সম্ভোগ-সৌভাগ্যের উপরেই অনাস্থা আসা উচিত। তবু দেখ, জগৎ জুড়ে কত জন কত কাজই না ক'রে বেড়াচ্ছে। কেউ কুস্তি-কসরৎ কচ্ছে, কেউ বা সার্কাস দেখাচ্ছে, কেউ ঘুড়ি উড়াচ্ছে, কেউ সূদের কড়ি গুণছে, কেউ শাল-দোশালা গায়ে দিচ্ছে, কেউ বা ঘোড়-দৌড়ের মাঝে জুয়ার টিকিট কিন্‌ছে। এই সবই হচ্ছে স্রেফ আসক্তির খেলা। আসক্তির ঝোঁকে মানুষ দিগ্বিদিগ্‌ জ্ঞানশুন্য হ'য়ে লক্ষ্যহীন মন আর ছন্দোহীন প্রাণ নিয়ে অবিরাম চর্‌কি-বাজীর মত ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ভগবানে মজা বনাম দীক্ষা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু এত ব্যর্থতা, এত নিস্ফলতা, এত ঘোরাঘুরি এবং এত অস্থিরতার ভিতরেও মানুষের জীবন তখনি সার্থক যখন তার মন সকল চঞ্চলতার উর্দ্ধে স্থিত শ্রীভগবানে মজে। ভগবানে মজে যাওয়ার জন্যই দীক্ষা। বাহিরের সহস্র দুঃখ-সংঘাতের ব্যথা-যন্ত্রণা থেকে নিজেকে সম্যক্‌ উদাসীন, অনাসক্ত, অস্পৃষ্ট রেখে সবল মেরুদণ্ডে পথ চলার জন্যই দীক্ষা। এই জন্যই দীক্ষা-লাভ জীবনের এক মহৎ সৌভাগ্য।

আমারে বাঁধিয়া লহ হরি

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবামণি স্বরচিত এই গানটী মৃদুস্বরে গাহিলেন।

আমারে বাঁধিয়া লহ হরি
তব পদ-পঙ্কজ-সাথে,
তোমারে ছাড়িয়া দূরে দূরে
রহিতে না পারি আমি যা'তে।।
বিষয়ে বিষম জ্বালা জানি,
তবু সে-ই করে টানাটানি,—
যত করি মাখামাখি, সে যে
দগ্ধিয়া মারে তত তাতে ;*
নখরে ছিঁড়িয়া নেয় মাংস,
অস্থি চিবায় দংষ্ট্রাতে।।
চাহি না বিষয়ী হ'তে, তবু
বিষয় হইতে চাহে প্রভু,
জোর করি' নত করিবারে
ধরে গ্রীবা সুকোমল হাতে,
তারপর হ'য়ে সুকঠোর
লগুড়-প্রহার করে মাথে।।
উপায় না দেখি' কোন ভিতে
তোমার কথাটী জাগে চিতে,
তুমি টেনে লহ যদি মোরে

---

*তাত = উত্তাপ

তব ঐ প্রেমের সভাতে,
জনম সফল করি তবে
গাহি' নাম হৃদয়-বীণাতে।।
জীবন-তরুর কিশলয়
লভি' তব মারুত মলয়,
নাচিবে কি বিপুল আবেগে
তব করুণার প্রতিঘাতে,
হেলিবে দুলিবে প্রেমাবেশে
নিত্যরসের প্রতিভাতে।।
সহসা বদল করি' কায়া
হব তব চরণের ছায়া ;
যেথা যাও, যেথা থাক তুমি,
চলি, রহি তব পদ-পাতে,
দিবসে কি গোধূলি-লগনে,
নিশীথে কি রজনী-প্রভাতে।।

চাঁদপুর, কুমিল্লা
২৮শে পৌষ, ১৩৪০

কাল রাত্রি নয় ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবামণি চাঁদপুর আসিয়াছেন। চাঁদপুরস্থ তিনটি হাইস্কুলের বহু ছাত্র উপদেশ-প্রার্থী হইয়া আসিয়াছেন।

এক একজনকে শ্রীশ্রীবাবামণি এক এক রূপ উপদেশ দিতেছেন।

চরিত্রোন্নতি ও ভগবানে আত্মসমর্পণ

একজনকে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভগবানের চরণাশ্রয় ক'রে সেই দিব্য অবস্থায় উপনীত হওয়াই তোমার জীবনের লক্ষ্য হোক্, যে অবস্থায় পৌছুলে চ'খ বুজে চল্‌লেও পদস্খলন হয় না, বিচার-বুদ্ধির ধার না ধ'রেও যে কাজ কর্ব্বে, তাই হবে নির্দ্দোষ, নিষ্পাপ, নিষ্কলুষ। প্রতিদিন কৃতকার্য্যের ভালমন্দ বিচার ক'রে, কর্ত্তব্যের জমা-খরচ ও হিসাব-পত্র রেখে নিজেকে শুদ্ধ ও খাঁটি করার চেষ্টা প্রশংসনীয়। কিন্তু নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ভগবচ্চরণে ছেড়ে দিয়ে নিজের হিসাব নিজে না রেখেও তাঁরই পবিত্র ইচ্ছায় স্বভাবতঃ পবিত্র থাকা আরো নিরাপদ, আরো সুন্দর। চরিত্রকে উন্নত করার চেষ্টা ক'রে অনেকে সফল হয়, আবার অনেকে বিফলও হয়। কিন্তু নিজেকে ভগবানের চরণে নিঃশেষে সমর্পণ ক'রে দিলে সাধ্য অসাধ্য সকল ক্ষেত্রেই চরিত্র আপনা থেকে বিনা চেষ্টায় সুন্দর হয়।

ভগবানকে ভালবাসা ও ভগবদ্ভক্তকে ভালবাসা

অপর একজনকে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভগবানে যাঁর অনুরক্তি এসে যায়, তিনি ভগবদ্ভক্তগণকে নিজের প্রাণসম জ্ঞান করেন। মাতার প্রতি যার গভীর প্রেম, তিনি যেমন ভ্রাতা ও ভগিনীগণের প্রতি অসীম প্রেমসম্পন্ন হন। আবার ভ্রাতা-ভগিনীর প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা থাক্‌লে মায়ের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা যেমন সহজে আসে। তেমনি, ভগবদ্ভক্তগণের প্রতি প্রাণের প্রেম থাক্‌লে সহজেই ভগবানে প্রেম আসে।

ভগবদ্ভক্তকে বিদ্বেষ ক'রে ভগবানকে ভালবাসা এক প্রহসন, ভ্রাতা-ভগিনীর প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ হ'য়ে মাকে ভালবাসা যেমন এক প্রহসন, দেশবাসীর প্রতি নিষ্ঠুর প্রাণহীন হ'য়ে দেশকে ভালবাসা তেমন এক প্রহসন।

অশ্রু-কম্প-পুলকাদি ও ভক্তি

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —ভগবানে ভক্তি সঞ্চারিত হ'লে প্রাথমিক অবস্থায় অশ্রু, কম্প, পুলক, স্বেদাদি সাত্ত্বিক লক্ষণ সমূহের বিকাশ হয়। এ সব লক্ষণের দ্বারা অনুরাগের প্রবলতা অনুভব করা যায়। কিন্তু এই সব সাত্ত্বিক লক্ষণকেই সব-কিছু জ্ঞান ক'রো না। অন্তরে ভক্তি-ভাবের প্রকৃত আবেশ ছাড়াও ভাল অভিনেতারা অভ্যাসের বলে এসব লক্ষণ নিজ নিজ অবয়বে ফুটিয়ে তুলতে পারেন। আর যাঁদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে এসব সাত্ত্বিক লক্ষণ প্রাণের অকপট ভক্তির ফলেই প্রকাশ পায়, তাঁদেরও ক্রমশঃ অগ্রসর হ'তে হ'তে শেষে সব সাত্ত্বিক বিকারের ঊর্দ্ধদেশে অবস্থিত বিকারশূন্য প্রেম-ঘন ভাব সমুদিত হয়। অশ্রু-স্বেদ-পুলক-কম্পাদি প্রেম-মধুর স্রোতের পরিচায়ক। কিন্তু প্রেম যখন জমাট বেঁধে একেবারে ক্ষীরে পরিণত হয়, তখন তাতে আর স্রোত থাকে না।

কলিকাতা

৭ই মাঘ, ১৩৪০

শ্রীশ্রীবাবামণি মোহন লাল ষ্ট্রীটে জনৈক সজ্জনের ভবনে অবস্থান করিতেছেন। কতিপয় সংগঠন-কামী ভক্ত যুবক

প্রাতঃকালে শ্রীশ্রীবাবামণির পাদপদ্ম দর্শন করিলেন।

সংখ্যার অকৌলীন্য

অখণ্ডদের সঙ্ঘ সম্বন্ধে একজন কিছু প্রশ্ন করিলে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— তোমরা কখনো ভুলে যেও না, সঙ্ঘ গড়ার উদ্দেশ্য কি? এক দল লোককে বাইরে থেকে এনে তোমাদের সঙ্ঘের সংখ্যা শক্তি-বর্দ্ধনই সঙ্ঘ-গঠনের বা সঙ্ঘ-পরিচালনের উদ্দেশ্য হ'তে পারে না। সুস্থ, সবল, পরমত-সহিষ্ণু পরদুঃখে বিগলিত-হৃদয়, নিত্য কুশল-লাভে যত্নবান্, সর্ব্বজীবহিতে রত সাধকের দল সৃষ্টিই তোমাদের প্রধানতম উদ্দেশ্য। কিন্তু সংখ্যা-বলে কৌলীন্য রাজনৈতিক জগতে যতই থাকুক, ধর্ম্মজগতে যে এক কাণা কড়িও নেই, একথা মনে রাখ্‌বে।

সংখ্যার অবশ্যম্ভাবী দুর্ব্বলতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তবে Quality (উৎকর্ষ) থাক্‌লেই Quantity (পরিমাণ) আপনা আপনি বাড়ে। Culture (সংস্কৃতি) থাকলে Number (সংখ্যা) ও সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ে। তখন Number (সংখ্যা) টাও একটা সমস্যা হ'য়ে দাঁড়ায়। তোমরা চাচ্ছ গভীর উপলব্ধি-সম্পন্ন, মহাযোগী, অপার্থিব প্রতিভার অধিকারী মহামানবদের আবির্ভাব, কিন্তু এই বড় চাওয়াটার প্রভাবেই অনেক স্বল্পশক্তি সামান্য মানব মুগ্ধ নেত্রে তোমাদের আদর্শের পানে তাকাবে এবং তোমাদের সঙ্ঘে সপরিবারে প্রবেশ ক'রে সংখ্যার পুষ্টি-বিধান কর্ব্বে। এর ফলে অনেক সময়ে নানা অবাঞ্ছিত দুর্ব্বলতাও তোমাদের সঙ্ঘে প্রবেশ কর্ব্বে।

সংখ্যার কুফল নিবারণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সঙ্ঘে যখন সঙ্ঘীর সংখ্যা বাড়ে, তখন সবগুলি লোক একই পূর্ব্ব-সংস্কার, একই প্রকারের শোণিত-শুদ্ধি বা একই প্রকারের মানসিক প্রবণতা নিয়ে আসে না। অথচ সবাই আসে আদর্শের ডাকে, ভাব-বন্যার এক বেহিসাবী আকর্ষণে। ফলে, কিছুদিন যেতে না যেতেই নানাদিকে সংখ্যারবৃদ্ধিজনিত নানা দৌরাত্ম্য আত্মপ্রকাশ করে। সুতরাং সংখ্যা-বৃদ্ধি নানা দৈহিক, মানসিক, নৈতিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীক কুফল নিবারণের জন্য প্রতি পাঁচ দশ বৎসর অন্তর অন্তর সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটী নরনারীর একটা সাল-তামামি হওয়া দরকার। এই আদম-সুমারীর ফলাফল লক্ষ্য ক'রে সংখ্যা-বৃদ্ধির কুফল সমূহ কিভাবে সঙ্ঘের মধ্যে প্রবেশ ক'রেছে, অপক্ষপাত দৃষ্টিতে গভীর মনীষা নিয়ে তার বিচার হওয়া প্রয়োজন। তার পরে সেই কুফলগুলিকে দূর করার জন্য ব্যাপকতম এবং গভীরতম প্রয়াসে হাত দিতে হবে।

সঙ্ঘ গড়ার দায়িত্ব

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—একখানা মৃদঙ্গ ও একজোড়া করতাল নিয়ে গ্রামে গ্রামে রাস্তায় রাস্তায় দুয়ারে দুয়ারে হরিনাম কীর্ত্তন ক'রে টহল দিয়ে বেড়ালাম আর, কীর্তনাকৃষ্ট নরনারীদের গলায় একটা ক'রে কণ্ঠি পরিয়ে দিয়ে মনে ভাব্‌লাম যে, ভগবানের জগৎ সৃষ্টি হচ্ছে, এত সহজে সঙ্ঘ-গড়ার দায়িত্ব এড়ান যায় না। যাদের কাণে একটীবার মধুর হরিনাম প্রবেশ ক'রেছে,

তারা জীবন ভ'রেই যাতে এই হরিনামের মধুর ধ্বনি অনিবার শ্রবণ ক'রতে পায়, সে ব্যবস্থা চাই। যারা হরিনামের মধুর নিক্কণে আকৃষ্ট হ'য়ে তোমাদের সাধন-ধর্ম্ম গ্রহণ ক'রেছে, আমৃত্যু তারা যাতে সেই সাধনে একনিষ্ঠ প্রযত্নে প্রাণ-মন-ধন বিনিময়েও লেগে থাকতে পারে তার জন্য অনুকূল প্রতিবেশ এবং প্রভাব সৃষ্টি করা চাই। তোমাদের সাধন-ধর্ম্মে দীক্ষিত ব্যক্তির যাতে অন্ন কষ্ট বা অন্নের জন্য পরাধীনতা না থাকে, পেটের দায়ে যাতে তাদের মধ্যে একটী প্রাণীকেও ধর্ম্ম বিকাতে না হয়, তার ব্যবস্থা চাই। রোগ, শোক, দরিদ্রতা চিরকালই সাধন-ভজনের দারুণ বিঘ্ন। সুতরাং তোমাদের সাধন-ধর্ম্ম যারা গ্রহণ ক'রেছে, তাদের গৃহে যাতে অকাল-মৃত্যু কারো না হয়, নিবার্য্য ব্যাধি নিবারণে কোনো কারণেই চেষ্টার শিথিলতা না হয়, সহজে যেন কাউকে রোগে ধরতে না পারে, আর রোগ হ'লে চিকিৎসায় তার রোগ যাতে শীঘ্র নিরাময় হ'তে পারে, সেই ব্যবস্থা চাই। অর্থাৎ সঙ্ঘবর্ত্তী একটী অবধি ব্যক্তির জন্য তার সূতিকা-গৃহ থেকে শ্মশান-খোলা পর্য্যন্ত সকল স্থানের সকল কর্ত্তব্যের সুচারু উদযাপনের ব্যবস্থার জন্য সমগ্র সঙ্ঘ তার নিকটে দায়ী।

সামগ্রিক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা

অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র নাথ দত্ত শ্রীশ্রীবাবামণির পাদপদ্ম-দর্শনে আসিয়াছেন। হেমেন্দ্র বাবু প্রশ্ন করিলেন,—আমরা অনেকে দেশের সেবার জন্য নানা ভাবে নানা চেষ্টা কচ্ছি, কিন্তু কোনটাতেই যেন কাজ এগুচ্ছে না। এর কারণটা কি ?

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—কারণ আর কিছুই নয়। আমরা সামগ্রিক ভাবে দেশের যাবতীয় সমস্যাকে একত্র ক'রে নিয়ে কোন্ সমস্যা কোন্ সমস্যার স্বাভাবিক পরিণতি, তার হিসাব ক'রে নেই না। রোগের উৎপত্তির কারণ, রোগের প্রস্ফুট লক্ষণ-সমূহ, রোগের অস্ফুট লক্ষণ সমূহ সবগুলিকে সম্যক্ দর্শন ক'রে বিচারে এনে তাদের মধ্যে তারতম্য হিসাব ক'রে একটা ব্যাপক পরিকল্পনার অধীন ক'রে যদি কাজে ব্রতী হ'তে পারি, তবে অবশ্যই আমাদের যে-কোনও চেষ্টা দেশের অন্যান্য স্থানে অনুষ্ঠিত চেষ্টার অনুপূরক হবে এবং তাতে সামগ্রিক ভাবে দেশের হিত ক্রমশঃ বিবর্দ্ধমান হ'তে থাক্‌বে।

হেমেন্দ্র বাবু পরিতৃপ্তি সহকারে এই উপদেশের যৌক্তিকতা স্বীকার করিলেন।

ধান্যকুড়িয়া, ২৪ পরগণা

১০ই মাঘ, ১৩৪০

গতকল্য শ্রীশ্রীবাবামণি ধান্যকুড়িয়ার বিশিষ্ট জমিদার শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার সাও মহাশয়ের ভবনে আসিয়াছেন।

প্রকৃত শান্তির পথ

জনৈক সজ্জন একটী প্রশ্ন করিলেন, তদুত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভগবান্ কেন দুঃখ দিলেন, ভগবান কেন শত অসুখ অশান্তি প্রদান কর্লেন, একথা তুলে ভগবানের সাথে লড়াই না ক'রে, সকল অপ্রীতিকর অবাঞ্ছনীয় দুরবস্থার ভিতরেও অবিরাম আত্মশোধনের প্রার্থনা ক'রে যাওয়াই হচ্ছে মহাশান্তির পথ।

কেউ ব্যাখ্যা করবেন,—এটা হচ্ছে defeatist এর (পরাজয়-বাদীর) মনোভাব। কেউ ব্যাখ্যা করবেন,—এটা মনকে কলা দেখানো মাত্র। কিন্তু ব্যাখ্যা চিরকালই ব্যাখ্যা, ব্যাখ্যা কখনো মূল হ'তে পারে না। এই আত্মশোধনের প্রার্থনার মূল হচ্ছে শান্তির জন্য ব্যাকুলতা এবং এই মূল প্রকৃত শান্তি পর্য্যন্ত বিস্তারিত রয়েছে।

দেবতা হও

অদ্য এবং তৎপরদিন শ্রীশ্রীবাবামণি ধান্যকুড়িয়া হাইস্কুলে ধারাবাহিক দুইটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু বক্তৃতার বিস্তারিত বিবরণ কোথাও লিপিবদ্ধ না থাকায় নিম্নে অতি সংক্ষিপ্ত সার টুকু মাত্র দেওয়া হইল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তপস্যার অভাবে মানুষ পশু হয়, আবার তপস্যার প্রভাবে মানুষ দেবতা হয়। দেবত্বই তোমাদের লক্ষ্য হউক। মানুষের দেহ নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়েছ, কিন্তু সৎসঙ্গের অভাবে অসৎসঙ্গের প্রভাবে কুসংস্কারের পর কুসংস্কার অর্জ্জন ক'রে যেন পশুত্বের অতল তলে ডুবে যেয়ো না। মুখে চ'খে দেখতে যারা মানুষ, এমন লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি জন জগতীতলে বিচরণ ক'রে বেড়াচ্ছে, কিন্তু অন্তরের পশুত্ব না ঘুচলে শুধু হাত পা, মুখ-চ'খ দিয়ে কারো মনুষ্যত্ব নির্ণীত হয় না। প্রাণপণে সাধন কর, অসৎসঙ্গ বর্জ্জন কর, নিয়ম-নিষ্ঠ হও, একলক্ষ্য হও, সৎসঙ্কল্পের অনুশীলন কর, সর্ব্বপ্রকার পশুত্বের সম্ভাবনাকে ভিতর থেকে নির্ম্মমভাবে নির্ব্বাসিত কর, দেবত্বকে বিকশিত

ক'রে তোল, তোমাদের সাধনায় ভারতভূমি পুনরায় ঋষির ভারতে, দেবতার ভারতে, পরিণত হোক্।

সিরাজগঞ্জ, পাবনা
২০শে মাঘ, ১৩৪০

শ্রীশ্রীবাবামণি সিরাজগঞ্জ আসিয়াছেন। আমলাপাড়াতে জনৈক ভক্তগৃহে উঠিয়াছেন।

স্ত্রীজাতির পবিত্রতা

একটী সধবা মহিলা কিছু উপদেশ চাহিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—* এতকাল পুরুষেরা তোমাদের রাক্ষসী জ্ঞানে, সর্পিণী জ্ঞানে, ব্যাঘ্রিনী জ্ঞানে দূরে পরিহার কত্তে চেয়েছে। তার কারণ, এতকাল তোমরা পুরুষ-জাতির রক্তশোষণে, পুরুষের সংযমের বিনাশ-সাধনে, পুরুষের দুর্ব্বলতা-বৃদ্ধির ব্যাপারে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কেবল সহায়তা ক'রেছ। আজ হ'তে তা' থেকে বিরত হও। আজ হ'তে তোমরা নিজেদের সংসর্গের দ্বারা স্বামীদের ভিতরে পবিত্রতা জাগাতে, সংযম জাগাতে প্রয়াসিনী হও। এই আমার একান্ত উপদেশ। পবিত্রতার হবে যখন আকর, তখনি তোমরা তোমাদের প্রকৃত মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হবে।

ভজন-বাদী দেহ ও মন

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,

* সধবার সংযম ১৯ সংখ্যক পত্র দ্রষ্টব্য।

দেহ আর মন এই দুইটীই হচ্ছে সব চেয়ে বড় ভজন-বাদী। ভগবানে মনঃ-সন্নিবেশ কত্তে চাও, দেহ রুগ্ন হ'য়ে বাধা দেবে, ক্ষুধার্ত্ত হ'য়ে বাধা দেবে, তৃষ্ণার্ত্ত হ'য়ে বাধা দেবে অথবা অবসাদগ্রস্ত হ'য়ে বাধা দেবে। তখন মনে হবে দেহই প্রধান, তারই তোয়াজ আগে কর, ভগবানের কথা পরে ভাবা যাবে। মনের ব্যাপারও প্রায় তাই। ভগবানের কাজ কত্তে বস ত' দুনিয়ার যত জঞ্জালের চিন্তা পর্ব্বত-প্রমাণ আয়তন ধ'রে সম্মুখে এসে হাজির হবে। এই কারণেই দীর্ঘপ্রযত্নে ধারাবাহিক চেষ্টায় দৈনিক কিছু কিছু ক'রে অভ্যাসের দ্বারা আস্তে আস্তে মনকে আর দেহকে নত ক'রে ভজন-সহায়ক করা দরকার। সেই চেষ্টারই নাম সাধন এবং সাধনেই জানবে সিদ্ধি।

ভজনানন্দীর ব্যুত্থান

অপর একজন জিজ্ঞাসুর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভজনানন্দী পুরুষের চিত্ত উপলব্ধির উচ্চতম স্তরে যখন বিচরণ কত্তে থাকে, তখন দেহ-স্মৃতি থাকে না, একথা সত্য। কিন্তু তাই ব'লে তাস-পাশা খেলে বা পান-তামাক খেয়ে তবে নিজেকে অন্তর্দ্দশা থেকে বাহ্য দশায় ফিরিয়ে আন্‌তে হবে, এসব কথার কোনো অর্থ নেই। বাহ্য দশায় জীব ও জগতের প্রতি যাঁর কিছু করণীয় আছে, তিনি স্বভাবতই সমাধিস্থ অন্তর্দ্দশা থেকে ব্যুত্থান লাভ কর্ব্বেন। এজন্য পান, তামাক, চা-চুরুটের প্রয়োজন করে না। তবে কোথাও যদি দেখে থাক যে, ভাবস্থ সাধক মহাপুরুষ ব্যুত্থানের কালে এসব নিকৃষ্ট জিনিষের সংসর্গ

স্বীকার কচ্ছেন, তব চুপ ক'রে থেকো, কোনো সমালোচনা ক'রো না।

সিরাজগঞ্জ পাবনা
২১শে মাঘ, ১৩৪০

সিরাজগঞ্জের ভাষণাবলি

সিরাজগঞ্জে শ্রীশ্রীবাবামণি চারিদিন ধরিয়া স্থানীয় কালীবাড়ীতে ভাষণ দিয়াছেন। এত বড় জনতা ইতিপূর্ব্বে সিরাজগঞ্জের কোনও অরাজনৈতিক সভায় কেহ দেখেন নাই। রাজনৈতিক উদ্দীপনাময়ী সভাগুলিতেও হয়ত খুব কমই দেখিয়াছেন। কোর্ট হইতে উকিল, মোক্তার, মুহুরী, আমলা, পেস্কার, নাজির, শেরেস্তাদারেরা, বিদ্যালয়গুলি হইতে ছাত্র ও শিক্ষকেরা, ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রীরা, বাজারগুলি হইতে দোকানদারের দল এবং রেলষ্টেশান ও ষ্টীমার-ষ্টেশান হইতে চাকুরে বাবুর দল ভাষণ আরম্ভ হইবার এক ঘণ্টা আগ হইতে আসিয়া সপরিবারে কালীবাড়ী-প্রাঙ্গণ দখল করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন এবং শেষ পর্য্যন্ত বসিয়া শ্রীশ্রীবাবামণির শ্রীমুখনিঃসৃত শেষ বাক্যটী শ্রবণ না করিয়া স্থান ত্যাগ করেন নাই। কালীবাড়ীর প্রাঙ্গণে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ব্যতীত অপরের প্রবেশাধিকার না থাকায় ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী শত শত ব্যক্তি বাহিরের রাস্তায় দাঁড়াইয়া বা নিকটবর্ত্তী ষ্টল ও দোকানে বসিয়া ভাষণ শুনিয়াছেন। আস্তিক ও নাস্তিক, অধ্যাত্মবাদী ও দেহাত্মবাদী প্রভৃতি সর্ব্বমতের ও সর্ব্বপথের লোকের প্রতিটি জনের চিত্তবৃপ্তিকর এই অপূর্ব্ব ভাষণাবলি যে

অনুলিখিত হয় নাই, ইহা আমাদের পরম দুর্ভাগ্য। কিন্তু সিরাজগঞ্জের জীবনে এই দিন সত্যই বান ডাকিয়াছিল। নিকটেই একস্থানে জনপ্রিয় ও প্রসিদ্ধ নট্ট কোম্পানীর যাত্রাগান সন্ধ্যার আগেই আরম্ভ হইতেছিল। আকর্ষণের এত বড় কারণ থাকা সত্ত্বেও যে সভাস্থলে জনতা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, ইহা যে সত্যই বাগ্মিতাশক্তির এক অত্যাশ্চর্য্য নিদর্শন, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। স্থানীয় উকিলবারের অতি প্রতিপত্তিশালী এক জন এই জন্য প্রকাশ্যেই বলিয়াছেন,—“যাঁহার ভাষণ শুনিয়া ঘরে ঘরে সদালোচনার স্রোত প্রবাহিত হয়, কে এই শক্তিমান্ মহাপুরুষ ? জাতির জাগরণের গঙ্গোত্রী-ধারা যাঁহারা বহিয়া আনিয়া বাঙ্গালীকে মানুষ করিলেন, ভারতবাসীকে জাগাইলেন, সেই রামমোহন, সেই বিবেকানন্দ আজ সমক্ষে থাকিলে আমাদিগকে বলিতে পারিতেন যে, কে এই মহাশক্তিশালী শব্দের যাদুকর, যাঁহার ভাষণ-প্রবাহের সমক্ষে চিরকাল-সঞ্চিত পুঞ্জীকৃত গোঁড়ামী তার ঐরাবত-তুল্য বিশাল বপুসত্ত্বেও উড়িয়া, ভাসিয়া, গুড়াইয়া, তলাইয়া যায় ?” এই সমালোচক-প্রবরের আমরা নামোল্লেখ করিলাম না। কিন্তু ইনি স্বাধীন-চিন্তার প্রতি অত্যধিক অনুরাগ বশতঃ হিন্দুধর্ম্মের প্রচারক-মাত্রকেই ভণ্ড, শঠ ও বিকৃতবুদ্ধি বলিয়া প্রকাশ্যে মন্তব্য করিয়া প্রায় প্রতিদিনই স্থানীয় বারের হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ও সনাতন সাধনার প্রতি অনুরাগী উকিল মহোদয়ের সহিত তর্ক, বিতর্ক এবং বিতণ্ডা সৃষ্টি করিতেন। শ্রীশ্রীবাবামণির বক্তৃতাবলি শ্রবণের পরে তিনি যে, শ্রীমদ্ বিবেকানন্দের নামটীকে পরম শ্রদ্ধার সহিত উচ্চারণ করিলেন,

ইহাই সিরাজগঞ্জের উকিল-বারের ইতিহাসে দীর্ঘকালের জন্য একটী পরমস্মরণীয় ঘটনা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। কিন্তু শব্দ-শক্তির এই যে মহতী ঝঞ্ঝা শ্রীশ্রীবাবামণি সৃষ্টি করিয়া উল্কার গতিতে ছুটিয়া বেড়াইতেছেন, তাহা একটী কর্ম্মক্ষম, সবল ও সুস্থ দেহ লইয়া নহে।

প্লুরিসির প্রলেপ

বৎসরাধিক পূর্ব্বে শ্রীশ্রীবাবামণি কঠিন প্লুরিসি রোগে আক্রান্ত হন। উপযুক্ত চিকিৎসায় জ্বর উপশমিত হইয়া গেলেও বুকব্যথা আর কমিল না। এই শরীর নিয়া শারীরিক কঠিন শ্রমের কোনও কাজই আর সম্ভব রহিল না। তথাপি জনসমাজে সন্নীতি, সংযম ও ধর্ম্মের শক্তিমান্ আদর্শ প্রচারের কাজ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় নাই। সেই অসুস্থ শরীর নিয়াই বৎসরাধিক কাল যাবৎ শ্রীশ্রীবাবামণি স্থানের পর স্থান ভ্রমণ করিতেছেন। প্রত্যহ বুকে এবং পিঠে একটা উষ্ণতা-বিধায়ক প্রলেপ দিয়া আকন্দ পাতা ও তুলা ব্যান্ডেজ বাঁধিয়া শরীরকে অপটুতা হইতে রক্ষা করিতেছেন। প্রাতে উঠিয়াই গরম জলে স্নান করিয়া বুকে পিঠে প্রলেপ সহ ব্যান্ডেজ বাঁধেন, বেলা চারিটায় ব্যান্ডেজ খুলিয়া গরম জলে ধুইয়া-মুছিয়া বক্তৃতাস্থলে আগমন করেন, বক্তৃতান্তে রাত্রি আটটায় গিয়া পুনঃ প্রলেপসহ ব্যান্ডেজ বাঁধেন এবং শেষ রাত্রে শয্যাত্যাগ করিয়া ব্যান্ডেজ খোলেন। দিন তাঁর যায় অফুরন্ত কর্ম্মে, রাত্রি তাঁর যায় অসহনীয় বুকের ব্যাথায়।

একদা শ্রীশ্রীবাবামণির আদর্শে অনুপ্রাণিত লক্ষ লক্ষ কর্ম্মী

ও কর্ম্মিণী জ্ঞানের, বিজ্ঞানের, ধর্ম্মের ও কর্ম্মের বাণী দিগ্‌বিদিকে ছড়াইবার ব্রত লইয়া আত্মাহুতির যজ্ঞে আরূঢ় হইবেন। তাঁহারা যেন ভুলিয়া না যান, শ্রীশ্রীবাবামণি কত ক্লেশ সহ্য করিয়া জীবনে জন-সমাজকে কত সেবা দিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবামণির এই প্লুরিসির প্রলেপ তাঁহাদের যেন স্মৃতিপথে সজাগ্ থাকে।

জাতি-সৃষ্টির কলকাঠি

বক্তৃতা সারিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি নিজ বিশ্রাম-ভবনে আসিয়াছেন, এই সময়ে একদল পরিচয়ার্থী দেখা করিতে আসিলেন। নানা প্রকারে বলিয়াও তাঁহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করা গেল না। প্লুরিসির প্রদাহে অপটু শরীর লইয়া দেশভ্রমণ করিতেছেন, একথাও বলিয়াও কাহাকেও বুঝ মানান গেল না। অগত্যা বক্তৃতাকালে কথিত নানা বিষয়ে আলোচনা সুরু হইল।

একজনের জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— শিক্ষা আপনি যতই অনুকূল করুন, আপনার ছেলেটি বা মেয়েটি যে উচ্চ হবে, মহৎ হবে, সচ্চরিত্র হবে, জগৎকল্যাণকারী হবে, তার অনেকটা নির্ভর করবে তার সেই সকল শক্তির উপরে, যেই শক্তি সে আপনার ঔরস থেকে এবং আপনার স্ত্রীর গর্ভ থেকে পেয়ে এসেছে। একটা দুর্ম্মেধা মস্তিষ্কের কাছে এনে বৃহত্তম-জ্ঞান-গ্রন্থগুলি সুলভ ক'রে দিলেই সে জ্ঞানী হয় না। সুমেধা মস্তিষ্ক নিয়ে আবির্ভূত হবার সৌভাগ্য যার হ'য়েছে, সে হয়ত বিরুদ্ধ প্রতিবেশের প্রভাব ক্ষুণ্ণ ক'রেও নিখিল জগতের হিতে আত্মপ্রকাশ কত্তে পারে। দৃষ্টিশক্তি নিয়ে যে ভূমিষ্ঠ

হয়নি, তার জন্য মস্ত মস্ত প্রদর্শনী-গৃহ তৈরী ক'রে দুনিয়ার চিত্র-সম্ভার সংগ্রহ ক'রে রাখলেই একটা মস্ত কাজ হ'য়ে যাবে, একথা ভাবা চলে না। এই জন্যই জাতি-সৃষ্টির গোড়ার কলকাঠি যে পিতা আর মাতার শুক্রে ও রজে, একথা ভাল ক'রে মনে রাখতেই হবে এবং সেজন্য ভবিষ্যৎ পিতা ও মাতাদের নিজ নিজ দেহ, মন, চরিত্র ও শোণিত নিয়ত শুদ্ধতর করার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। শক্তিশালী জাতি যদি সৃষ্টি কত্তে হয়, তবে কাজ সুরু কত্তে হবে সৃষ্টি-কার্য্যের গোড়ায়। প্রসবের পর সন্তানের যত্ন ক'রে তাকে আশ্চর্য্য গুণে মণ্ডিত করার কল্পনা না ক'রে, ভ্রূণ যাতে মাতৃগর্ভে প্রবেশের পূর্ব্বেই পিতার দেহে মাতার দেহে সর্ব্বপ্রকার দোষ মুক্তি ঘটে এবং সর্ব্বপ্রকার গুণ সংক্রমণ-ক্ষমতা জন্মে, তার ব্যবস্থা কত্তে হবে।

সার্থক বিবাহ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আর, যেরূপ যুবক বা যুবতীর বৈবাহিক মিলনে ভাবী সন্তানের কুশলার্থে গুণ-সংক্রমণ সহজতর হবে, মাত্র সেরূপ বিবাহকেই প্রশংসা করা উচিত, যে-কোনও একটি যুবক যে-কোনও একটী যুবতীর হাতে ধরে কলাতলায় সপ্তপদী ভ্রমণ ক'রে মন্ত্রপাঠ ক'রে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হ'লেই তাকে সার্থক বিবাহ ব'লে মনে করা অন্যায়, এমন কি ওটা যদি অসবর্ণ বিবাহ নাও হয়, কিম্বা সমাজ প্রচলিত গণ্ডী অতিক্রম নাও করে। যে বংশের ভিতরে দৈহিক বা মানসিক অবনতি লক্ষ্য করা গিয়েছে, সেই বংশের ছেলে বা মেয়ের সঙ্গে কেউ

বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হবে না, এই নিয়মই প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। বরের এই প্রশ্ন করার অধিকার থাকা চাই,—"তুমি যে তোমার গর্ভে আমার সন্তানকে ধারণ কর্ব্বে, তার ফলে সে ত' নিত্য রোগী, বিকৃত-বুদ্ধি, নীচমনা হবে না ?" কন্যার এই প্রশ্ন করার অধিকার থাকা চাই,—"তুমি যে আমার গর্ভে তোমার সন্তানকে আহিত কর্ব্বে, কোনও পুরুষানুক্রমিক দুর্ব্বলতা ত' সেই সঙ্গে তোমার সঙ্গে তোমার সন্তানের দেহে আস্‌বে না ? তোমার অতীত জীবন ত' নিষ্কলুষ, যার ফলে তোমার শুক্র তোমার সন্তানের জন্য অনপনেয় ব্যাধি বা দুরপনেয় দুর্ব্বলতা সৃষ্টি কর্ব্বে না ?" সুস্থ সবল পিতার সহিত সুস্থ সবল মাতার মিলনের ধারাবাহিক ব্যবস্থার দ্বারা ইতর প্রাণীর জগতে আশ্চর্য্য সুফল দেখা গিয়েছে। মনুষ্যজাতি ইতর নয় বলেই কি সেই সুফলকে নিজেদের ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা কর্ব্বে না ?

শুক্রের বিশ্ববিজয়নী শক্তি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দুর্ব্বলেন্দ্রিয়, দুর্ম্মেধা, অনৈসর্গিক ব্যাধির আকর, কুপ্রবৃত্তির চর্চ্চাকারী, মদ্যপানে আসক্ত, কুকার্য্যে লজ্জাহীন, পরানিষ্টপ্রবৃত্তির ক্রীড়নক, চঞ্চলচেতা পুরুষ বা নারীগুলি অবিরাম সংখ্যাবৃদ্ধি ক'রে যাবে,—এটা কি কখনো সমাজের পক্ষে হিতজনক হ'তে পারে ? কখ্‌খনো না। সুতরাং কিভাবে এই অযোগ্যের অবাধ সংখ্যাবৃদ্ধি কমে যেতে পারে, তার চেষ্টা আপনাদের কত্তে হবে। যে-কোনো প্রকারে যৌন-প্রবৃত্তির ক্ষুধা মেটানই বিবাহের উদ্দেশ্য নয়, আহিত শুক্রের

পরবর্ত্তী পরিণতি জাতি ও জীবের হিতে কতটুকু সফল হবে, সেই চিন্তার সফলতাই যে বিবাহের ব্যাপকতর উদ্দেশ্য, এ কথার শিক্ষা সারা বিশ্বে আপনাদের ছড়াতে হবে। পরাশরের শুক্রে সেই মহাবীর্য্য ছিল, যাতে ব্যাসের আবির্ভাব সম্ভব। ব্যাসদেবের শুক্রের সেই মহাবীর্য্য ছিল, যাতে শুকদেবের আবির্ভাব সম্ভব। শুক্রে তাঁদের এত তেজ ছিল যাতে শুক্রাধানের পাত্রীর জাতি, কুল, শিক্ষা বা সামাজিক প্রতিষ্ঠার বিচার তাঁরা নিষ্প্রয়োজন জ্ঞান ক'রেছিলেন। শুক্রের এই যে বিশ্ববিজয়িনী শক্তি, তাকে উন্মেষিত করাই হচ্ছে, জাতি সৃষ্টির মর্ম্মরহস্য।

সন্তান-সৃষ্টিতে মাতা বনাম পিতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সন্তানের সৃষ্টির ব্যাপারে পিতাই প্রধান, মাতা গৌণ। পিতা থেকেই অধিকাংশ গুণাবলি সন্তান পায়, মাতা থেকে পায় কিছু কিছু। পিতার গঠন ও চরিত্রের সাথে মাতার গঠন ও চরিত্রের সামঞ্জস্য থাকলে সামঞ্জস্য-সম্পন্ন গুণাবলি সন্তানের ভিতরে অতীব সুস্পষ্ট হয়ে অনায়াসে প্রকাশ পায়। মাতার দেহে ও মস্তিষ্কে যদি কোনও গুরুতর দোষ না থাকে, তা'হলে পিতার অধিকাংশ সদ্‌গুণই সন্তানে সংক্রামিত হ'তে পারে। মাতা দৈহিক, মানসিক, নৈতিক ও উৎকর্ষগত সর্ব্বপ্রকার সুষমায় মণ্ডিতা হ'য়েও যদি কুদেহী, কুমনা, দুর্নীত ও অপকর্ষপ্রাপ্ত পিতার শুক্র নিজ গর্ভে ধারণ করেন, তবে সেই সন্তানের ভিতরে মাত্র অধিকাংশ সদ্‌গুণ প্রকাশের অবসর পায় না। প্রবল শক্তিসম্পন্ন পিতা অনেকস্থলে

দুর্ব্বলা জননীর গর্ভেও শক্তিমান্ সন্তানের প্রত্যাশা কর্ল্লে কত্তে পারেন। কিন্তু দুর্ব্বল পিতা প্রবলা মাতার গর্ভ থেকে সবল সন্তান কদাচিৎই প্রত্যাশা কত্তে পারেন। সন্তানের ভবিষ্যৎ গুণ-প্রকাশ সম্পর্কে মাতা ও পিতার মধ্যে একটি পার্থক্য সাধারণভাবে র'য়ে গিয়েছে। এই জন্যই বিবাহের কালে কন্যা নিয়ে বিচার আপনারা যা কর্ব্বেন, তার শতগুণ কত্তে হবে বর নিয়ে। নারীর রজোডিম্ব প্রধানতঃ ধৈর্য্যের প্রতীক, স্থিতির আধার, পিতৃগুণাবলীকে ধ'রে রাখবার যন্ত্র। পুরুষের শুক্র প্রধানতঃ শক্তির প্রতীক, বলের সংক্রামক, শৌর্য্যের প্রকাশক। সুতরাং জাতিসৃষ্টির মহাযজ্ঞে যদি নামতে চান, তবে আগে যুবকদের নিয়ে নামুন।

অযোগ্যের সন্তানোৎপাদন বন্ধ কর

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু আজকাল আপনারা কচ্ছেন কি ? একটা বিবাহ স্থির করার আগে তিনবার ক'রে পাত্রী দেখেন, দশবার ক'রে তার সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন। অথচ আপনার ছেলেটীর আবলুষ কাঠের মত গায়ের রংকে উত্তমবর্ণ আখ্যা দেওয়া হয়, ছেলেটা যে মদ খেয়ে ফুর্ত্তি ক'রে বাপের টাকা ডাক্তারী পড়ার নাম ক'রে উড়াচ্ছে, তাকে বলা হয় খোশ-মেজাজী! যে ছেলেটা গণিকাসক্তির দরুণ তিন তিন বার কদর্য্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হ'য়েছে. বলা হয় বিয়ে করলেই এসব দোষ সেরে যাবে। এভাবে পুরুষগুলির দোষ তিন তুড়িতে উড়িয়ে দিয়ে ঘরে ঘরে বেছে বেছে ভাল ভাল মেয়েগুলিকে বধূ

ক'রে নিয়ে আসা হচ্ছে। ব্যাপারটা হচ্ছে যেন হরিহর-ছত্রের মেলা থেকে আঠারো সের দুধওয়ালী গাভীকে অনেক দেখাশুনা দরদস্তুর ক'রে কিনে এনে শেষে মা-তাড়ানো বাপ-খেদানো খোদাই-ষাঁড়ের কাছে গর্ভাধানের জন্য বেঁধে রাখার মত। এই সব খোদাই-ষাঁড়ের দল গর্ভাধানের জন্য কন্যা না পায়, সেই ব্যবস্থা আপনারা দ্রুত করুন। নতুবা আপনারা দেশের উন্নতির বৃথা আশা অন্তরে পোষন ক'রে কেবলি ব্যর্থতা চয়ন কর্ব্বেন। অবশ্য সৃষ্টির কাজে মেয়েদের গুরুত্ব আমি অস্বীকার কচ্ছি না। তাই একদিকে আমাদের সর্ব্বপ্রযত্নে যেমন জগতের নারী-শক্তিকে দেবজাতির জনয়িত্রী হবার জন্য তৈরী কত্তে হবে, অপর দিকে তেমন অযোগ্য, অক্ষম, অনাদর্শ, ক্ষুণ্ণপরাক্রম, দুর্ব্বলমনা পুরুষগুলিকে অবাধ জননের অধিকার-রিক্ত ক'রে ধরিত্রীকে কতকগুলি পঙ্গু, খঞ্জ, অন্ধ, আতুর, বাতুল ও দুশ্চরিত্রের ভার বহনের ক্লেশ থেকে মুক্তি দিতে হবে।

সিরাজগঞ্জ

২২শে মাঘ, ১৩৪০

আত্মীয়-প্রীতি ও মায়া

অপরাহ্নে বনোয়ারী-লাল হাইস্কুল এবং ভিক্টোরিয়া হাইস্কুলের কয়েকটী ছাত্র শ্রীশ্রীবাবামণির চরণ দর্শনের জন্য আসিয়াছেন।

জিজ্ঞাসার উত্তরে উপদেশ-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —পরের দুঃখে যে তুমি দুঃখ অনুভব কর এবং নিজের দুঃখের কথা তোমার ভুল হ'য়ে যায়, এটী হচ্ছে তোমার চিত্তশুদ্ধির

অন্যতম স্তরে আরোহণের লক্ষণ। একেবারে অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি নিজের দুঃখ ছাড়া অপরের দুঃখের কথা আদৌ ভাবে না। যারা নিজের দুঃখ ছাড়া নিজের স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতির দুঃখের কথা একটু একটু ভাবে, তারাও যে শুদ্ধচিত্ত, একথা বলা চলে না। কারণ, এদের সঙ্গে নিজের স্বার্থের সম্পর্ক ত' রয়েছে। কিন্তু চিত্ত যতই শুদ্ধতার দিকে অগ্রসর হ'তে থাকে, ততই নিঃসম্পর্কিত ব্যক্তিদের দুঃখে সহানুভূতি ও তাদের বেদনায় সহানুভূতি আস্‌তে থাকে। তোমার চিত্ত যখন শুদ্ধতার ঊর্দ্ধতর স্তরে উঠেছে, তখন দেখবে যে, তোমার সহানুভূতি দেশ, কাল, পাত্রের গণ্ডী অতিক্রম ক'রে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানের সকল আগত-অনাগত জীবের প্রতিই ধাবিত হচ্ছে। এই অবস্থাতে তোমার চিত্ত তোমার সম্পর্কিত ব্যক্তিদের সম্পর্কে সহানুভূতিশীল হ'লে বুঝতে হবে যে, তোমার এই আত্মীয়-প্রীতির উপরে মায়ার প্রবেশাধিকার নেই।

চিত্তশুদ্ধি ও ত্যাগ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু শুদ্ধচিত্তের প্রকৃত পরিচয় হচ্ছে ত্যাগে। পরের দুঃখে বিগলিত-হৃদয় হ'য়ে গালভরা সব কোমল শব্দের সমাবেশ ক'রে আমি হয়ত ভাল ভাল কবিতা লিখেছি, কিন্তু বিপন্ন বা নিরন্ন কেউ দুমুঠা সাহায্যের জন্য এলে সামর্থ্য সত্ত্বেও নিজে একটি কাণাকড়িও না দিয়ে সুপারিশ-পত্র লিখে দানবীর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কাছে পাঠিয়ে দিলুম। এতে চিত্তশুদ্ধির কোনও পরিচয় হ'ল না। পরের দুঃখে ব্যাকুল হ'য়ে

ভাল ভাল কথা বলা অনেক সময়ে শুধু অভ্যাসের ফলমাত্র, কিন্তু পরের দুঃখে ব্যাকুল হ'য়ে সত্যি সত্যি ত্যাগ, কৃচ্ছ্র ও ব্যক্তিগত অনিষ্ট স্বীকার করা চিত্তশুদ্ধিরই ফল। তোমাদের পরদুঃখে ব্যাকুলতা যাতে চিত্তশুদ্ধিরই ফল হয়, কল্পনা করার ফল না হয়, কিম্বা ভাষা নিয়ে কসরৎ করার অভ্যাসের ফল না হয়, সেই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখো।

পরদুঃখ-বিদূরণের অনিত্যত্ব বনাম নিত্যসেবা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু তুমি যে পরদুঃখ বিমোচনে চেষ্টিত হচ্ছ, তাতে দুঃখীর দুঃখ লঘু হচ্ছে কি না, তার বিচারও ক'রো। হয়ত তুমি আপাততঃ তার এক দুঃখকে প্রশমিত কচ্ছ, কিন্তু নূতন নূতন শতদুঃখ তার সৃষ্টি হচ্ছে। হয়ত যার দুঃখ-বিদূরণে এত চেষ্টা কচ্ছ, সে তার সময়িক দুঃখ দূর হওয়া মাত্র সহস্র গুণ দুঃখের বর্দ্ধক অনাচারে লিপ্ত হচ্ছে। অন্ন দিয়ে যার ক্ষুধা দূর কচ্ছ, সে হয়ত শরীরে বলাধান হওয়া মাত্র আরো দশজনের অন্নাভাব সৃষ্টি কচ্ছে। বস্ত্র দিয়ে যার শীতকষ্ট তুমি নিবারণ কচ্ছ, তার অত্যাচারে দুদিন পরেই বহুজনের বস্ত্র-সঙ্কট সৃষ্টি হচ্ছে, যাকে তুমি বিদ্যা দিচ্ছ, সে হয়ত বিদ্যাকে অবিদ্যার সেবায় নিয়োজিত ক'রে ত্রিভুবন জুড়ে দুঃখ-বৃদ্ধি ঘটাচ্ছে। ফলে তোমার জীব-দুঃখ-নিবারণের চেষ্টা অরণ্যে-রোদনেই পরিণত হ'ল, ভস্মে ঘৃতাহুতি মাত্র হ'ল, সুফল কিছুই এল না। তাই নিজের চিত্তশুদ্ধির জন্য যতই যা' কর, জীবকে তার স্বরূপে স্থাপন করার চেষ্টাটী ছেড় না। যতক্ষণ জীব নিজ স্বরূপে গিয়ে

অবস্থিতি না কর্ব্বে, ততক্ষণ বারংবার তুমি অন্ন দেবে, আবার বারংবার তার অন্নাভাব ঘট্‌বে। ততক্ষণ বারংবার তুমি বস্ত্র দেবে, বারংবার তার বস্ত্রাভাব ঘট্‌বে। ততক্ষণ বারংবার তুমি ধন দেবে, বারংবার তার ধনাভাব ঘট্‌বে। ততক্ষণ যতই তুমি বিদ্যা বিতরণ কর্ব্বে, ততই সে অবিদ্যার সেবা ক'রে নিজের এবং জগতের দুঃখ-পরিমাণ বাড়াবে। ঝিনুকে যেমন সমুদ্র-সিঞ্চন চলে না, জীবের দুঃখ তেমন শুধুই অন্ন, বস্ত্র, শুশ্রূষা বা বিদ্যা দান ক'রে দূর করা চলে না। আত্মধর্ম্ম থেকে স্খলনই জীবের সকল দুঃখের কারণ। সেই কারণকে দূর করাই তার সকল দুঃখ দূর করার প্রকৃত উপায়। আর সেই কারণকে দূর না ক'রে অন্ন-বস্ত্র-শুশ্রূষা প্রভৃতি দিয়েও তাকে কিছুই দেওয়া হ'ল না। কারণ, এ সব দানে তার খাই খাই, চাই-চাই রব ত' আর বন্ধ হবে না। বাসনার দাস জীব নিজেকে কর্ত্তা, ভোক্তা, প্রভু জ্ঞান ক'রে বিষয়-বিষে প্রমত্ত হ'য়ে দুঃখের পর দুঃখ আহরণ কচ্ছে তোমার অন্ন-বস্ত্রাদি দানে তার ভোগ-পিপাসার পরিতৃপ্তি কোথায় ? যত তুমি তাকে দেবে, ততই তার প্রয়োজন হবে, এমন কি সঞ্চয়ের পর সঞ্চয় ক'রেও তার পাবার আকাঙ্ক্ষার পরিনির্ব্বাণ হবে না। সুতরাং নিজ চিত্তশুদ্ধির জন্য দান কর, ত্যাগ স্বীকার কর, রোগীর চিকিৎসা করাও, তার শুশ্রূষা কর, কিন্তু সে যাতে সঙ্গে সঙ্গে নিজ স্বরূপে গিয়ে অবস্থিতি কত্তে পারে, তারও চেষ্টা কর। তার বিষয়-বাসনার দাসত্ব ঘুচিয়ে তাকে স্বরূপে স্থাপন করাই তার প্রতি তোমার

নিত্য সেবা, অন্ন-দান, বস্ত্র-দান, এ সব তার প্রতি তোমার অনিত্য সেবা।

অনিত্য সেবার নিত্যত্ব

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যে অনিত্য সেবা নিত্য সেবার সৌকর্য্য বিধানের জন্য, তার অনিত্যত্বের অপবাদ থাকে না। জীবের চিরক্ষুধা নিবারণের মঙ্গল উদ্দেশ্য নিয়ে যে অন্নদান-ব্রত, তাকে নিত্য-ব্রত ব'লেই জান্‌বে। জীবের চিরতৃষ্ণা বিদূরণের সুদূর উদ্দেশ্য নিয়ে যে জলদান ব্রত, তাকেও নিত্য-ব্রত ব'লে জান্‌বে। জগতের সকল জীবের নিত্য শান্তি হোক্, এই আকাঙ্ক্ষার মূলে অনিত্য রোগ-প্রশমনের জন্য যদি হাসপাতাল খোল, তবে তাতেও নিত্যব্রতই উদ্‌যাপন করা হবে।

নিরভিলাষ চিত্তে জীব-কল্যাণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —দেখ, পরদুঃখ বিদূরণের আকাঙ্ক্ষা চিত্তশুদ্ধির এক স্তর বটে, কিন্তু চিত্তশুদ্ধির অন্যতম স্তর হচ্ছে, একেবারে অভিলাষ-শূন্য হ'য়ে অবস্থান এবং কর্ত্তব্যবোধে হস্তপদাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে প্রকৃষ্টতম ব্যবহারে নিয়োজিত রাখা। যতক্ষণ দেহ আছে, ততক্ষণ দেহের কর্ম্ম-নিয়োজনও অত্যাবশ্যক। কাজ ছাড়া সে থাকবে না, থাকতে পারে না। তাকে ব্যক্তিগত নিকৃষ্ট সুখের লোভে নিকৃষ্ট কাজে লাগানোর চাইতে পরদুঃখ-বিদূরণের উদ্দেশ্যে উৎকৃষ্টতর কাজে লাগান শ্রেয়ঃ। আবার জীবের অনিত্য দুঃখ নিবারণের উদ্দেশ্য নিয়ে দেহকে না খাটিয়ে জীবের নিত্য-দুঃখের নিরসন-কল্পে খাটানো

আরো ভালো। পরন্তু জীবের নিত্য বা অনিত্য কোনো দুঃখ নিবারণেরই কোনো অভিলাষ অন্তরে পোষণ না ক'রে, মনকে একেবারে সকল আকাঙ্ক্ষার তরঙ্গ থেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে নিরভিলাষ-চিত্তে দেহকে সর্ব্বদা প্রকৃষ্টতম কর্ম্মে নিয়োজিত ক'রে রাখা আরো শ্রেয়ঃ। অর্থাৎ একমাত্র ভগবৎ-প্রীতি সম্পাদন ছাড়া তোমার আর কোনো দ্বিতীয় অভিলাষ থাকবে না, একমাত্র ভগবানে অভিনিবেশ ছাড়া তোমার আর কোনো অভিনিবেশ থাকবে না। তোমার সকল অভিলাষ ও সকল অভিনিবেশ একমাত্র ভগবৎ-প্রীত্যর্থে অর্পণ ক'রে দেহকে প্রকৃষ্টতম ব্যবহারে নিয়োজিত রাখ। তাতেই আপনা থেকে জগতের কল্যাণ সাধিত হ'তে থাকবে।

নিরভিলাষ হওয়া ও কর্ম্মযোগ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভগবানে অভিলাষ অর্পণ করা আর নিরভিলাষ হওয়া একই কথা। তাঁর চরণে সকল অভিলাষ নিজের সমাধি খুঁজে নিলে তারপর তোমার যে দেহ-যাত্রা-নির্ব্বাহ বা দেহ-কর্ম্ম উদ্যম, সবই হবে সম্পূর্ণ নিষ্কাম। এই নিষ্কাম কর্ম্মাভ্যাসই যোগীর কর্ম্মযোগ। এই কর্ম্মযোগে আরূঢ় হলেই জীবন্মুক্তি।

ইহকাল ও পরকালের সামঞ্জস্য

শ্রীশ্রীবাবামণির বলিলেন,—ইহকালকে উপেক্ষা ক'রে পরকালের চিন্তা করার যে বিপজ্জনক শিক্ষা তোমরা বহু শতাব্দী ধ'রে পেয়ে এসেছ, তার পরিবর্ত্তন আবশ্যক। আবার পরকালকে

উপেক্ষা ক'রে যে বস্তুতন্ত্র জড়বাদের শিক্ষা আজকাল পেয়ে আস্‌ছ, তারও অমঙ্গল-প্রভাব থেকে তোমাদের আত্মরক্ষার প্রয়োজন। সেই আত্মরক্ষার উপায় হ'ল জীবন্মুক্তির আদর্শ গ্রহণ। ম'রে গিয়ে তারপরে মুক্ত হবে, তা' নয়। এই মরদেহ দিয়েই অমরত্ব পেতে হবে। পরকালকে ইহকালে টেনে আন, ইহকালকে পরকাল পর্য্যন্ত প্রসারিত কর।

এই সময়ে বক্তৃতার নির্দ্ধারিত সময় হইয়া যাওয়াতে শ্রীশ্রীবাবামণি কালীবাড়ী-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন। এই দিবস জনতা এত বেশী হইয়াছিল যে, বক্তৃতাস্থানে শ্রীশ্রীবাবামণিকে বিশেষ ক্লেশের সহিত প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সিরাজগঞ্জের চারিটী বক্তৃতার একটীরও মর্ম্ম লিপিবদ্ধ নাই। অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি নারী-নৃত্য-বিলাসের বিরুদ্ধে বক্তৃতা প্রদান করিলেন।

সিরাজগঞ্জ

২৩শে মাঘ, ১৩৪০

নারীনৃত্য তথা শরীরগঠন

গতরাত্রিতে শ্রীশ্রীবাবামণি যে নারী-নৃত্য-বিলাসের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহাতে স্থানীয় কোনও বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক খুব রুষ্ট হইয়াছেন। তিনি আজ প্রাতে শ্রীশ্রীবাবামণির নিকটে আসিয়া নিজ আপত্তির কথা ব্যক্ত করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আপনারা যে বলছেন, নারীদের নৃত্যাভ্যাসে তাদের শরীর-গঠনের সহায়তা হয়, একথা আংশিক

সত্য হ'তে পারে। কিন্তু নিয়মিত ব্যায়াম অভ্যাসে মেয়েদের সুযোগ প্রদান করার পবিত্র কর্ত্তব্য উপেক্ষা ক'রে নৃত্য-বিলাসের আমদানীর প্রকৃত অর্থ কি, তা' কি আপনাদের ভেবে দেখতে হবে না ? নারীদের নৃত্যশীলতা তাদের ভাল জননী হ'তে সাহায্য কর্ব্বে, এই নৃত্যশীলতার ফলে ভাবী সন্তান-সমাজ বলিষ্ঠ, তেজস্বী, বীর্য্যবান্ হবে, এই বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ আশা পোষণ করার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ পেয়েছেন কি ? ডাম্বেল করলে কি ফল হয়, বারবেল কর্ল্লে কি ফল হয়, বৈঠকী বা ডন করলে কি ফল হয়, যৌগিক আসন-মুদ্রার কোন্‌টীর অভ্যাস দ্বারা কি কুশল হয়, এসব ত' অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা নির্দ্ধারণ করেছেন। শরীর-তত্ত্ব-বিশারদ ব্যক্তিরা মেয়েদের নৃত্য-গীত-বিলাসের ফলে কি কি কুশল নিশ্চিত হয়, তার তালিকা পেশ করেছেন কি ? যদি না ক'রে থাকেন, তবে এই অনিশ্চিত অবস্থায় ভদ্রকন্যাদের স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টার পশ্চাতে উদ্যোক্তাদের আসল উদ্দেশ্য কি, তার কি বিচার প্রয়োজন হবে না ?

নারীনৃত্য ও সেবাকার্য্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আপনারা বল্‌ছেন,—দুচারটী ছোট মেয়েকে রঙ্গমঞ্চে নাচিয়ে যদি দ্বারভাঙ্গার ভূমিকম্প-রিলিফ কাজের অর্থ পাওয়া যায়, তবে সেটা নিতান্ত মন্দ কাজ কি ? কিন্তু নাচের তালিম দেওয়া থেকে সুরু ক'রে নাচের মজলিসের শেষ পর্য্যন্ত নানাভাবে যতগুলি অর্থ ব্যয়িত হয়, তা' বাদে টিকিট বিক্রী ক'রে যে টাকা বাঁচে, সেই টাকাটা এই কয়টী মেয়ে

কি ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বেরুলে সংগ্রহ কত্তে পাত্ত না ? যতগুলি লোকের যে পরিমাণ শ্রম মিলিত হ'য়ে টিকিটের কটি টাকা আসে, তা থেকে হিসেব ক'রে দেখা উচিত যে, লাভ কতখানি হ'ল, আর লোকসান কতখানি হ'ল। বৃহত্তর কর্ত্তব্য এবং মহত্তর ব্রত থেকে স্খলিত ক'রে এই যে কতকগুলি বুদ্ধিমতী ভদ্রকন্যাকে বিলাসের পঙ্কিল স্রোতে এনে ঢেলে দেওয়া হচ্ছে, তার ভিতর থেকে সমাজের মৃত্যুর হলাহল উৎপন্ন হবে। এদের অর্জ্জিত এই অর্থে কোনও মহতী কীর্ত্তি স্থাপিত হবে না, হ'তে পারে না। আজ যে অনুষ্ঠান আপনারা বন্যার সাহায্যের জন্য কচ্ছেন, কাল যে অনুষ্ঠান আপনারা বিদ্যালয় বা আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য কর্ব্বেন, পরশু সেই অনুষ্ঠান শুধু ইন্দ্রিয়াতুর নরনারীর ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধার ইন্ধন মাত্র যোগাবে। গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে সেবারতা, শুশ্রূষাদক্ষা, পরদুঃখে বিগলিতপ্রাণা কন্যাদের আবির্ভাবের চেষ্টা আপনারা ত' করেন নি! আজ হঠাৎ ভূকম্প-বিধ্বস্ত বিহারের দুঃখে মেয়েদের এভাবে ব্যবহার করার প্রকৃত কারণটী কি, তা' কি মনঃ-সমীক্ষা ক'রে দেখবেন ?

নারী-নৃত্য ও মনের পবিত্রতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আপনারা বলছেন যে, মন বেশ পবিত্র থাক্‌লে নারীর নৃত্য দর্শনে মনে পবিত্র ভাবেরই উদয় হয়। শুকদেব পরমহংসের পক্ষে যে একথা সত্য, তা' আমি মানি। একজন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের পক্ষেও একথা সত্য। কিন্তু আপনাদের কন্যাদের চারুনৃত্য যারা আগ্রহ ক'রে দেখছে,

আর ভিড়ের চোটে "হল্" ভেঙ্গে দেবার জোগাড় কচ্ছে, তাদের মধ্যে কয়জন শুকদেব আর কয়জন রামকৃষ্ণ, তা' কি গুণে দেখেছেন ? রাস্তায় বিড়ি ফুক্‌তে ফুক্‌তে যে সব ছেলেরা ফরাসী দেশের কদর্য্য যৌন ছবি ফেরিওয়ালার কাছ থেকে গোপনে কিনে বুক পকেটের মাঝে লুকিয়ে রাখে, তাদের মধ্যে ক'জন এই নারী-নৃত্যের মজলিশে প্রবেশের সুযোগ পরিহার করে, আপনারা তা' অনুসন্ধান ক'রে দেখেছেন কি ? যে নারীর নৃত্যে ঋষির ঋষিত্ব গিয়েছে, দেবতার দেবত্ব নাশ হয়েছে, রাজার রাজত্ব কর্পূরের মত উবে গিয়েছে, তাকে সঙ্গতিহীন পঙ্গু যুক্তি দিয়ে সমর্থন করার পশ্চাতে কোন্ রিপু বিরাজ কচ্ছে, একটু যত্ন ক'রে তার খোঁজ নিয়ে দেখ্‌বেন কি ? আপনারা বল্‌ছেন, —অপবিত্র যারা, তারাই নারীনৃত্যকে অপবিত্র ভাবে গ্রহণ করে, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি,—আপনারা শতকরা ক'জন লোক পবিত্র-চেতা, তার কি কোনও আদম-সুমারী তৈরী হয়েছে?

স্বাধীন বিচারের শক্তি চাই

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —বড় বড় নামজাদা লোকেরা আর্টের নামে আত্ম-প্রতারণা কচ্ছেন কিম্বা ভুল বুঝেছেন, তাই বলে সরল প্রাণ সাধারণ লোকেরা নিজেদের স্বাধীন বিচার-শক্তিকে বিসর্জ্জন দিয়ে যা' খুশী তাই কর্ব্বে, একটা সমাজের লোকের নৈতিক মেরুদণ্ড এবং চারিত্রিক শক্তি এত শিথিল হওয়া দুর্ভাগ্যেরই কথা। নিজের কুশল নিজে বিচার ক'রে বুঝে নেবার স্বাধীন চিন্তাশক্তি আপনাদের থাকা দরকার।

সিরাজগঞ্জ

২৪ শে মাঘ, ১৩৪০

অদ্য কালীবাড়ীতে শ্রীশ্রীবাবামণির চতুর্থ বক্তৃতা হইয়া গিয়াছে। আগামী দুইদিন যে শ্রীশ্রীবাবামণি মৌনী থাকিবেন, একথা তিনি বক্তৃতা কালে বলিয়াছেন। ফলে, অনেক ভদ্রলোক শ্রীশ্রীবাবামণির বিশ্রাম-স্থানে আলোচনার্থ সমবেত হইয়াছেন।

ভারতে সমবেত উপাসনার প্রাচীনত্ব

একজন জিজ্ঞাসুর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সমবেত ভাবে উপাসনা করার প্রথা চেষ্টা ক'রে কাউকে প্রতিষ্ঠিত কত্তে হবে না। ধর্ম্মের নিজের শক্তিতেই তা' আপনি প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে যাবে। সমবেত উপাসনা এদেশে নূতন নয়। বৈদিক যুগে আর্য্যগণ প্রতি অমাবস্যায় ও পূর্ণিমায় মিলিত হ'য়ে যৌথভাবে প্রার্থনায় যোগ দিতেন। এই জন্যই তার নাম ছিল দর্শ-পৌর্ণমাসী। দর্শ শব্দের মানে অমাবস্যা। ঋগ্বেদের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ ছিল,—"সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী। সমানং মনঃ সহচিত্তমেষাম্॥"—অর্থাৎ এক মনে এক চিত্তে একই সমিতিতে মিলিত হ'য়ে—একই মন্ত্রযোগে উপাসনা ক'রো। বৈদিক দর্শ-পৌর্ণমাসীকেই ভগবান্ বুদ্ধ প্রাতিমোক্ষ নাম দিয়ে বৌদ্ধদের ভিতরে সমাবৃত্ত সম্মেলনের ব্যবস্থা করেছিলেন। এ সবই হ'য়েছিল মুসলমান ধর্ম্মের আবির্ভাবের পূর্ব্বে। দিওয়ান-প্রথার প্রবর্ত্তন অবশ্য গুরু-গোবিন্দ ইস্‌লাম ধর্ম্মের ভারত-প্রবেশের পরে করেছিলেন, ব্রাহ্মগণ যে সঙ্ঘবদ্ধ উপাসনার প্রবর্ত্তন করেছেন, তাও প্রধানতঃ খ্রীষ্টানদের সঙ্ঘবদ্ধ উপাসনার

আংশিক প্রতিক্রিয়ায়। কিন্তু তারই জন্য একথা বলা চলেনা যে, ভারতে সমবেত উপাসনা ছিল না। ঋগ্বেদ যত প্রাচীন, ভারতে সমবেত উপাসনাও তত প্রাচীন।

সমবেত উপাসনার স্বতোবিস্তার

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু বেদ যেমন এক সময়ে লুপ্ত-প্রায় হ'য়ে গিয়েছিলেন, এই বৈদিক সমবেত উপাসনাও তেমনি লুপ্ত হ'য়ে গিয়েছিল। ধীরে ধীরে ভারতের ধর্ম্মজীবনে বেদের পুনরুদ্ধার পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ ভাবে আপনিই ধীরে ধীরে বৈদিক মূলতত্ত্বের পবিত্র ছায়ায় সমবেত উপাসনা আপনা আপনি সমগ্র জাতির জীবনের উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে যাবে। প্রযত্নকারীরা উপলক্ষ্য মাত্র, উপাসনা নিজের দাবিতে নিজে প্রতিষ্ঠিত হবে। এজন্য আমাদের অত্যধিক উদ্বিগ্ন হবার প্রয়োজন নেই।

কিরূপ সমবেত উপাসনা বিশ্বতোবিস্তার পাইবে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নানাদিকে সমবেত উপাসনার জন্য যে দু'চারটী আয়োজন দেখা যাচ্ছে, সেগুলি বৈদিক তত্ত্বের তাগিদে নয়, পরন্তু হিন্দুসাধারণের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্ম্ম-সম্প্রদায় মুসলমানদের অত্যাশ্চর্য্য সামাজিক সংহতির প্রত্যক্ষ ফলের আতঙ্ক থেকে। তাই, এ সব যূথবদ্ধ উপাসনাকে চল্ কত্তে এত তেল-নূন-লঙ্কা খরচ কত্তে হচ্ছে। কিন্তু এসব কৃত্রিম চেষ্টা বিফল হবে, আতঙ্কের তাগিদে জাত এ সকল সমবেত

উপাসনা সমাজের মাটীতে শিকড় গাড়্‌তে পারবে না। কিন্তু তত্ত্বের তাগিদে, জগতের সর্ব্বজীবের সম্পর্কে অভয়ের তাগিদে, প্রাণভরা ভগবৎ-প্রেমের তাগিদে যে সমবেত উপাসনার সুরু বিনা চেষ্টায়, বিনা প্রচারে তা' আপনা আপনি সর্ব্বব্যাপিনী মূর্ত্তি ধারণ কর্ব্বে। এরূপ সমবেত উপাসনার বিশ্বতোবিস্তার অবশ্যম্ভাবী।

সিরাজগঞ্জ
২৭শে মাঘ, ১৩৪০

মহিলাদের মহিমা

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি সন্ধ্যার পরে স্থানীয় ধর্ম্মসভায় মহিলাদের জন্য একটী ভাষণ দিবার জন্য সভায় সমাগত হইলেন। বক্তৃতা প্রায় তিন ঘণ্টা ব্যাপিয়া হইল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলিলেন,—* তোমরা কি মায়েরা পিশাচীর মত নিকৃষ্ট বস্তুতে মজে থাক্‌তে চাও, না, দেবতার শ্রীমূর্ত্তি ধ'রে পূজার আস্পদ হ'তে চাও ? নিকৃষ্ট সুখের অনুরাগিণী হ'য়ে ইতর সুখের আস্বাদনে ডুবে তোমরা যদি নারকীয় ঘৃণিত জীবনই যাপন কত্তে চাও, চিরকাল পুরুষেরা তোমাদিগকে বিভীষিকার ন্যায় বর্জ্জন কর্‌বে, চিরকাল পুরুষের জাতি তোমাদিগকে নরকের দ্বার বলে কীর্ত্তন কর্‌বে, চিরকাল পুরুষের জাতি তোমাদিগকে দিনের মোহিনী রাতের বাঘিনী বলে নিন্দা কর্‌বে। আর তোমারা যদি সংসারীর সহস্র আবিলতার

---

* সধবার সংযম, ১৮শ পত্র

মধ্যে র'য়েও শ্রেষ্ঠ সুখকে পেতে চেষ্টাশীলা হও, শ্রেষ্ঠ সুখের পথে পুরুষকে পরিচালিত কত্তে যত্নবতী হও, জঘন্য ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি ব্যতীতও জীবনের কুম্ভে যে অপার মধু আছে, তার সন্ধান নিজেরা লও এবং স্বামীকে দাও, তাহ'লে চিরকাল পুরুষের জাতি তোমাদিগকে পরমেশ্বরের মহিমার আরতির বাতি ব'লে সাদরে গ্রহণ কর্‌বে।

সিরাজগঞ্জ

২৮ শে মাঘ ১৩৪০

এই কয়দিন শ্রীশ্রীবাবামণি আমলা-পাড়াতে শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেনের গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। অদ্য সিরাজগঞ্জ-বাজারের পোষ্টমাষ্টার শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেনের গৃহে সূর্য্যোদয়েই আসিয়াছেন। রমেশচন্দ্র এবং তাঁহার ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী শৈলবালা দেবী দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

অদ্ভুত ব্যাপার

শ্রীযুক্ত শৈলবালার ধারণা এই যে, বহু জন্মের পুণ্য-ফলে আজ সত্য-দীক্ষা জীবন লাভ করিতে পারিলেন, সহজ-পুণ্যে এই সৌভাগ্য লাভ হয় না, জন্ম-জীবন আজ সার্থক হইবে। চেষ্টা-যত্ন করিয়া যে গুরু তল্লাস করিতে হয় নাই, ইহা তাঁহাদের জীবনে অধিকতর সৌভাগ্যের সূচক।

সস্মিত হাস্যে শ্রীযুক্তা শৈলবালার কথাগুলি শুনিতে শুনিতে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মা, নিখিল ভুবনে অমৃতের মহাতরঙ্গ ছুটেছে। যার সুসময় হয়েছে, ভগবানের বিধানে সে মুখ খুলে

তার মধুর আস্বাদ গ্রহণ কচ্ছে, অপরেরা সেই তরঙ্গের তাড়নে অধীর হ'য়ে একবার ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে, একবার অতল নীচে ডুবে যাচ্ছে, তবু মুখ বুজে জিদ ক'রেই নিজেদিগকে অমৃতাস্বাদ থেকে বঞ্চিত রাখ্‌ছে। জগতের এই এক অদ্ভুত ব্যাপার!

দেবতাগণের পুনরাবির্ভাব

অপরাহ্ণে বড়-বাজারে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায়ের ভবনে এক সভার আয়োজন হইয়াছে। তিন ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট বক্তৃতার পরে শ্রীশ্রীবাবামণি যখন উপবেশন করিলেন, মনে হইল যেন সমগ্র জনতা মিলিয়া একটী ব্যক্তিতে পরিণত হইয়া গিয়াছে এবং সেই ব্যক্তিটী সর্ব্বেন্দ্রিয় দিয়া ভাষণ শুনিতেছে কিন্তু কি দুর্ভাগ্য, এমন বক্তৃতারও বিস্তৃত বিবরণ রক্ষিত হয় নাই। পাণ্ডুলিপি সমূহ খুঁজিয়া সামান্য কয়েকটী কথা মাত্র পাওয়া গেল। বক্তৃতার বিষয় ছিল, —''বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য''।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কেন তুমি অবিশ্বাস কর্ব্বে যে, নর-দেহে নারায়ণের আবির্ভাব সম্ভব ? কেন তুমি অবিশ্বাস কর্ব্বে যে, এই ভারতের পুণ্য-ভূমিতে মানবের ঔরসে মানবীর গর্ভে দলে দলে দেবতাদের পুনরাবির্ভাব সম্ভব ? এই ভারতের মানুষ কশ্যপ মানুষী অদিতির গর্ভেই না ইন্দ্র, চন্দ্র, যম, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাদের জন্ম দিয়েছিলেন ? এই ভারতে পুনরায় মানুষের ঔরসে মানুষীর গর্ভেই ইন্দ্র, চন্দ্র, যম, বিষ্ণু প্রভৃতির আবির্ভাব হবে। কিন্তু এই ইন্দ্র, এই চন্দ্র ইন্দ্রিয়চাপল্যের ক্রীড়নক

হবেন না, এই বিষ্ণু বলির সঙ্গে তুলনা কর্ব্বেন না। মানবের ঘরে তেমন দেবতার আবির্ভাব হবে, যে দেবতা সম্পূর্ণ নিষ্পাপ, সম্পূর্ণ নিষ্কলুষ, সর্ব্বপ্রকারের কলঙ্ক থেকে মুক্ত।

সিরাজগঞ্জ

২৯ শে মাঘ, ১৩৪০

লক্ষ্যমুখে অগ্রসর হও

দ্বিপ্রহরে শ্রীশ্রীবাবামণি বনোয়ারী-লাল হাইস্কুলের ছাত্রদের নিকটে বক্তৃতা প্রদান করিতে আসিয়াছেন। বক্তৃতা পৌনে দুই ঘণ্টা কাল হইল। বিষয়,—"ছাত্রজীবনে আত্মগঠন।"

সম্মুখে যমুনা নদী উদ্দাম বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। শ্রীশ্রীবাবামণি বক্তৃতা প্রসঙ্গে সেই নদীর দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—ঐ দেখ নদী, অবিরাম স্রোতে সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হ'য়ে যাচ্ছে, স্রোতের তার বিশ্রাম নেই, গতির তার অন্ত-অবধি নেই, যতক্ষণ সে তার প্রাণদয়িত মহাসমুদ্রের বুকে গিয়ে মিশ্‌তে পাচ্ছে, ততক্ষণ সে স্রোতস্বতী, চিরতরঙ্গ-মুখরা, অনন্যব্রতা। এর মত তোমরা হও। জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্যকে সম্মুখে রেখে অবিরাম অবিশ্রাম অনুদিন অনুক্ষণ শুধু অগ্রসরই হ'তে থাক। বিপথে যেয়ো না, বিমুখ হ'য়ো না।

ভুলিও না, কে তোমার চির-আপনার

শ্রীশ্রীবাবামণি সদ্য রচিত কবিতায় বলিয়া যাইতে লাগিলেন,—

ভুলিও না কে তোমার চির-আপনার,
অবিরাম ধেয়ে যাও শুধু লক্ষ্যে তার;

ক্ষুদ্র লাভ, ক্ষুদ্র সুখ
কেবলি দানিবে দুখ,
সবলে করিয়া জয় বাসনা অপার
অগ্রসর হও পুত্র, বেগে দুর্নিবার।

সবার লাগিয়া তব মনুষ্য-জনম,
সবার লাগিয়া তব ধরম-করম,
সবার সুখের তরে
আত্মদান অকাতরে
হইবে সাধনা তব কঠোর নির্ম্মম।
বিশ্বহিত-তরে তব ত্যাগ ও সংযম।

ছোট নহ, ক্ষুদ্র নহ, তুচ্ছ নহ তুমি,
তুচ্ছ নহে তব এই পুণ্য জন্মভূমি,
নিজেরে করিবে দান
বিশ্বের সাধিতে ত্রাণ,
কোনো বাধাবিঘ্নে কভু যাইও না দমি',
নির্ভয়ে চল পথ, বিশ্বনাথে নমি'।

পিতৃপুরুষেরা তব তপস্যা করিয়া
আপনার হাতে যাহা গিয়াছে গড়িয়া,
সেই সভ্যতার ধ্বজা
রাখিও গগনে সোজা,
মৃত্যুতেও মৃত্তিকায় না যায় পড়িয়া,
সেই বৈজয়ন্তী ধর তেমনি করিয়া।

বিশ্বের কুশল লাগি' জীবন যাহার
সে কি আত্মসুখ কভু ক'রে অঙ্গীকার ?
সে কি আপনারে ল'য়ে
থাকেরে বিব্রত হ'য়ে ?
তার দৃষ্টি বিস্তারিত নিখিল সংসার,
তার প্রাণ সকলের স্নেহের ভাণ্ডার।

অমৃতের পুত্র তোরা অমৃত হইয়া
পিপাসিত প্রাণে প্রাণে পরিতৃপ্তি দিয়া
অন্তরের অন্তস্তলে,
প্রবেশিবি অবহেলে,
সবারে গড়িয়া নিবি দেবতা করিয়া,
মৃত্যুভয় সকলের দিবি বিদূরিয়া!

তারি তরে মৃত্যুঞ্জয় সুধা নিয়া হাতে
বিলাইয়া যাইতেছি সকলের পাতে
কেহ ছোট বড় নাই,
তারে দেই যারে পাই,
সবারে অমর করি' নিব মোর সাথে,
তোদের এ' জীবনের প্রথম প্রভাতে।

সিরাজগঞ্জ

১লা ফাল্গুন, ১৩৪০

ভিক্টোরিয়া হাইস্কুলের কয়েকটী ছাত্র তাঁহাদের স্কুলের

সেক্রেটারীর অনুরোধ-পত্র লইয়া আসিয়াছেন, ভিক্টোরিয়া স্কুলে একটী বক্তৃতা দিতে হইবে।

বাধা বিঘ্ন জয়ের প্রবৃত্তি

অতিশ্রমে শ্রীশ্রীবাবামণির শরীর ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। সভাস্থলে দুই হইতে তিন ঘণ্টা উচ্চকণ্ঠে বক্তৃতা, সমস্ত দিবস জিজ্ঞাসুদের প্রশ্নোত্তর এবং অপর সময়ে পত্রলেখকদের নিকট পত্র লেখা, এই তিন কাজে অদ্য তিনি খুবই ক্লান্তি বোধ করিতেছেন। তবু ছাত্রেরা ছাড়িবেন না।

শ্রীশ্রীবাবামণি জিজ্ঞাসা করিলেন,—আচ্ছা, বক্তৃতা ত' আমি যেন দিলাম। তোমরা তারপরে কি কর্‌বে ?

একজন ছাত্র বলিলেন,—আমরা আপনার উপদেশগুলি নিজ নিজ জীবনের আচরণে প্রতিফলিত ক'রে তোল্‌বার চেষ্টা কর্‌ব।

শ্রীশ্রীবাবামণি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, —কিন্তু সেই মহৎ প্রযত্নে যদি চতুর্দ্দিক হ'তে বাধা আসে ?

ছাত্র উত্তর করিলেন,—সকল বাধা অবহেলে অগ্রাহ্য কর্‌ব।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—উত্তম, তবে আমি আজ বিকেলে চারটার সময়ে তোমাদের স্কুলে যাব। বাধা-বিঘ্ন জয়ে যাদের প্রবৃত্তি, আমি তাদেরই একান্ত সেবক।

ভিক্টোরিয়া স্কুলে দুই ঘণ্টা ব্যাপিয়া বক্তৃতা হইল। বিষয় -"আত্মজয়ের বাধা এবং তাহা অতিক্রমের উপায়।"

বীরের ভোগ্যা এ বসুন্ধরা

সর্ব্বত্র যেমন হয়, এখানেও তেমনই হইল। প্রতিটি বালক নিঃশব্দে গভীর মনোযোগ সহকারে ভাষণ শুনিল। বনোয়ারীলাল হাইস্কুলে শ্রীশ্রীবাবামণি যে যে কথা বলিয়াছেন, প্রায় তাই এখানে বলিলেন। ভাষণ পরিসমাপ্তি-কালে সদ্যরচিত কবিতায় বলিলেন,—

যত আছে মনে ভয়,
সব কিছু কর জয়,
জগতের যত মহৎ ভাগ্য
মহাসাহসীরই হয়,
বীরের ভোগ্যা এ বসুন্ধরা
ভীরুর ভোগ্যা নয়।

মনের দুর্ব্বলতা
কহিয়া মিথ্যাকথা
বিরত তোমারে রাখিছে কর্ম্মে,
শক্তির অপচয়
করিছ কেবল বসিয়া বসিয়া
ভাবিয়া, কি জানি হয়।

দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব যত
কর তব পদানত
কর পরাহত বীরবিক্রমে,
চিরতরে কর লয়

মনের বাতুল কল্পনা, যারা
ভাবে তব পরাজয়।

আত্ম-অবিশ্বাস
গলায় পরায় ফাঁস,
ছিন্ন তাহারে করহ এখনি,
আর বিলম্ব নয়।
কর মস্তক চির উন্নত
নির্ভয় অক্ষয়।
বীরের ভোগ্যা এ বসুন্ধরা
ভীরুর ভোগ্যা নয়।

সিরাজগঞ্জ
২রা ফাল্গুন, ১৩৪০

ভবিষ্যৎ মহাজাতি

স্থানীয় জ্ঞানদায়িনী বিদ্যালয়ের বক্তৃতা দানের পরে শ্রীশ্রীবাবামণি নিজ বিশ্রাম-স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। একজন জিজ্ঞাসা করিলেন,—এই যে আপনি দেশের পর দেশে যুবক ও বালক সমাজের ভিতরে প্রচার ক'রে যাচ্ছেন, তার পরিণতি কি ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বলিষ্ঠ, দ্রঢ়িষ্ঠ, স্বাবলম্বী, আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন, ধার্ম্মিক ও পরোপকারী এক মহাজাতি।

সত্য ইচ্ছার মৃত্যু নাই

প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনার এই উপদেশগুলি

যদি যুবকদের এক কাণ দিয়ে ঢুকে আর এক কাণ দিয়ে বেরিয়ে যায় ?

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—অনেক ক্ষেত্রে ত' তাই হবে! কিন্তু সত্য ইচ্ছার মৃত্যু নাই। আমার আকাঙ্ক্ষা একদিন পূরণ হবে। যারা আমার কণ্ঠের ভাষা শোনে নি, এমনই অনাগতেরা আমার প্রাণের ভাষা শুনে উৎসাহে মেতে উঠে নূতন ক'রে ভাঙ্গা-গড়ার উন্মত্ত খেলায় নামবে।

তিনশত বছরের পরে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমি আজকের জন্য কাজ কচ্ছি না। I am working for three centuries ahead—আমি তিনশত বছর পরের কাজ আজ ক'রে যাচ্ছি।

তিনশত বছরের পরে
মানুষের প্রতি ঘরে ঘরে
বাণী হয়ে করিব নিবাস,
এই মোর হৃদয়ের আশ॥
সকলেরে প্রদানিবে আশা
মোর এই অশরীরী ভাষা,
জীবনের কঠিন সমরে
সকলেরে বিলাবে আশ্বাস,
সকলের সকল বিপদে
বিনাশ করিবে যত ত্রাস॥
নবজাতকের যত দল

নিজেদেরে করিতে সবল
আমার ধ্বনির তালে তালে
চালাইবে সাধন-প্রয়াস।
সকলের ভাঙ্গা বুকে তারা
বিতরিবে অগাধ বিশ্বাস॥
কভু আমি কহি নাই কথা
প্রচারিতে নিজের বারতা,
ভাবী-কাল-জয়ী মানবের
পথের কাঁটার করি নাশ,
মোর মরমের কথা যত
নহে, নহে, লঘু পরিহাস!
আছে শত বাধা? থাক, তবু
নিজেরে জানিতে নিজ প্রভু
সকলেরে দিয়াছি প্রেরণা—
সে ত' নহে কাহারও দাস!
সবল প্রয়াসে চিরকাল
সে ছিঁড়িবে যত মোহ-পাশ॥
তিনশত বছরের পরে
আবার জাগিব ঘরে ঘরে
শত বাল-বালিকার রূপে,—
এ জীবন তারি অধিবাস।
এ জীবন নহে ক্ষণিকের,
এ জীবন চির-অবিনাশ॥

কিছুই যাবে না বৃথা, তাই
মনে মোর কোনো ভয় নাই,
ধ'রে রেখে দেবে মোর সব
অনন্ত উদার মহাকাশ,
জীবনের ছোট-বড় যত
প্রকাশ্য ও গোপন সুভাষ॥

কবিতাটী শ্রীশ্রীবাবামণি মুখে মুখে রচনা করিয়া আবৃত্তি করিতেছিলেন, আর স্থানীয় ভিক্টোরিয়া হাইস্কুলের একটী ছাত্র ইহা সদ্য-রচিত কবিতা বলিয়া অনুভব করিয়া সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়া যাইতেছিল। এমন সময়ে একটি অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিল।

কুমারী-পূজা

প্রায় পঁচিশটী সদ্যঃস্নাতা সুবেশধারিণী কুমারী মেয়ে,—প্রত্যেকের হাতে একটী করিয়া পুষ্পপাত্র ও পঞ্চপ্রদীপ, প্রত্যেকের সাথে একটী করিয়া মঙ্গলশঙ্খ,—পুষ্প, বিল্বপত্র, তুলসী, চন্দন প্রভৃতি সহ শ্রীশ্রীবাবামণিকে পূজা করিতে আসিয়াছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—একি মা ? এসব কেন ? ব্যাপার কি ?

কুমারীরা বলিলেন,—আপনাকে পূজা কত্তে এসেছি।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমাকে পূজা ? কেন ? তাতে কি লাভ ? আমি যে গাছতলার ফকির মা। আমি বিনা পূজাতেই ভাল থাকি! জানো না বুঝি মা, আমি যে মহাদেব, পূজা ছাড়াই খুশী থাকি ?

কুমারীরা কহিলেন,—আপনি মহাদেব বৈ কি! কাল রাত্রে আমাদের মায়েরা সকলে একযোগে স্বপ্ন দেখেছেন, আপনার পূজা করতে হবে।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—তাই নাকি ? বেশ! তবে পূজাটী সকালে হল না কেন ?

কুমারী মেয়েরা বলিলেন,—একসঙ্গে সবাই স্বপ্ন দেখেছেন, কিন্তু কেউ ত' জানেন না যে, তিনি নিজে ছাড়া অন্যেও এই স্বপ্ন দেখেছেন। তাই কেউ আর নিজ সঙ্কল্প স্থির কত্তে পারেন নি। দিন বাড়তে বিষয়টা জানাজানি হল, তাই আমরা সবাই বিকালে আপনাকে প্রণাম কত্তে পূজা কত্তে এসেছি।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু মা, তোমাদের পূজাও আমার করণীয়। আজ আমি তোমাদের পূজা গ্রহণ ক'রে তার মধ্য দিয়েই তোমাদের পূজা করব। শাস্ত্রে আছে কুমারী-পূজা মঙ্গলদায়িকা। কুমারীর ভিতরে নিখিল বিশ্বের পরম-প্রসবিনীকে দর্শন ক'রে তাঁর চরণদ্বয় মানস-চন্দনে চর্চ্চিত ক'রে অন্তরের ভক্তি-উপচারে তাঁকে পূজা কত্তে হয়।

চন্দনবাইসা (বগুড়া)

৬ই ফাল্গুন, ১৩৪০

শাহ-বংশীয় ফকীর আব্বাছ আলি সাহেবের আমন্ত্রণে শ্রীশ্রীবাবামণি গত কল্য চন্দনবাইসা আসিয়াছেন। [এখানে ধারাবাহিক তিনটী বক্তৃতা হইয়াছে, প্রত্যহ দ্বিসহস্রাধিক লোক বক্তৃতা শুনিতে আসিয়াছেন এবং দৈনিক দুই ঘণ্টা করিয়া

বক্তৃতা হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বক্তৃতার কোনও মর্ম্ম লিপিবদ্ধ হয় নাই।]

পল্লী-তীর্থ

স্থানীয় হাইস্কুলের হেড-পণ্ডিত শ্রীযুক্ত (?) মনোমোহন চক্রবর্ত্তীর গৃহে শ্রীশ্রীবাবামণির আহারের ব্যবস্থা হইয়াছে। সঙ্গীয় ব্রহ্মচারী রন্ধনাদি করিতেছেন।

পণ্ডিত-মহাশয়ের পত্নী ত্রিপুরা জেলার মেয়ে, পিত্রালয় চাঁদের চর। তিনি শ্রীশ্রীবাবামণিকে বলিলেন,—বাবা, আপনার চরণদর্শন মহাপুণ্যের ফল, বহুভাগ্যগুণে আপনার পাদপদ্ম স্পর্শ ক'রে ধন্য হয়েছি।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—না, মা, কথাটি ঠিক্ তার উল্‌টো। ভারতের প্রত্যেকটি পল্লী এক একটী তীর্থভূমি। লক্ষ লক্ষ পল্লীতে তীর্থ পর্য্যটন ক'রে বেড়ান একটী শরীরের পরমায়ুতে বেড় পাবে না বলে আমি মাঝে মাঝে বেছে বেছে দুটা একটা ক'রে তীর্থ ভ্রমণ কচ্ছি। ভক্তের বিনীত মন নিয়ে, মুমুক্ষুর রাগ-রিক্ত চিত্ত নিয়ে, প্রেমিকের ফলাভিসন্ধিহীন হৃদয় নিয়ে আমি পল্লী-তীর্থ দর্শন ক'রে যাচ্ছি। তার একমাত্র উদ্দেশ্য চিত্তশুদ্ধি, তার একমাত্র লক্ষ্য আত্মোন্নয়ন।

চন্দনবাইসা

১০ই ফাল্গুন, ১৩৪০

এখানে শ্রীশ্রীবাবামণি যে তিনটী বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহার মুল কথা মানবের সাথে মানবের মিলন,—প্রীতি, প্রেম,

ভালবাসার বন্ধনে সকল ভেদবুদ্ধির বিসর্জ্জন। শ্রীশ্রীবাবামণির তপঃপূত ভাষণ যে সকল সম্প্রদায়ের মর্ম্মভেদ করিয়াছে, তাহার একটী মস্ত প্রমাণ এই যে, দৈনিক শ্রোতাদের শতকরা সত্তর জনের অধিক ছিলেন মুসলমান।

হিন্দু-মুস্‌লিম মিলন

শাহবংশীয় নেতৃগণের আমন্ত্রণে শ্রীশ্রীবাবামণি আদ্‌বাড়িয়া গ্রামে সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের গৃহে গৃহে আজ আনন্দ বিতরণ করিতেছেন। কি যে সেই প্রীতির নিবিড় আদান-প্রদান, তাহা আমরা লেখনীর মুখে কি বর্ণনা করিব ? শ্রীশ্রীবাবামণির মধুময়ী বাণী পুরুষের মুখে প্রতিধ্বনিত হইয়া ঘরে ঘরে মুসলমান মহিলাদের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে, আর মহিলাদেরই প্রাণের গভীর ভক্তি-ভালবাসায় প্রেরিত হইয়া পুরুষেরা শ্রীশ্রীবাবামণিকে ঘরে ঘরে লইয়া গিয়া প্রাণের বিমল প্রেমের অর্ঘ্য প্রদান করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত শাহ আব্বাছ আলী সাহেবের জ্যেষ্ঠপুত্র শাহ আবদার্ রহমান সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—হিন্দু মুসলমানের যে বিরোধের চিত্র আজকাল হাটে, মাঠে, ঘাটে রঙ্গীন তুলিকায় অঙ্কিত হয়ে চতুর্দ্দিকে ছড়ান হচ্ছে, এটা ত' একটা ক্ষণিক দুঃস্বপ্ন। এই ভারতেই একদিন পরিপূর্ণ সম্প্রীতির, প্রাণভরা ভালবাসার অনবদ্য আদর্শ রচিত হবে। এ কথায় অবিশ্বাস করা ভ্রম, এ কথায় সন্দিগ্ধ হওয়া পাপ। সহস্র প্রকারের ঘূর্ণাবর্ত্তে প'ড়ে শত প্রকারে বিপন্ন-বিপর্য্যস্ত হ'য়ে

শেষ পর্য্যন্ত মানুষকে সাম্প্রদায়িকতার উত্তেজনা ও রক্ষণশীলতার মোহ একদিন ত্যাগ কত্তেই হবে। হ'তে পারে সেইদিন বহু দূর, তবু প্রতীক্ষায় আছি।

সরিষাবাড়ী, ময়মনসিংহ
১৮ই ফাল্গুন, ১৩৪০

দিন কয়েক হয় শ্রীশ্রীবাবামণি সরিষাবাড়ী আসিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অবনীমোহন লোধ শ্রীশ্রীবাবামণির আতিথ্য-সৎকারের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। সরিষাবাড়ীতে যাহাতে শ্রীশ্রীবাবামণির প্রচার-কার্য্য উত্তমভাবে চলে, তজ্জন্য চন্দনবাইসা হইতে শাহ আব্বাছ আলী সাহেবও স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া সরিষাবাড়ী আসিয়াছেন। রাণী দিনমণি হাইস্কুলে শ্রীশ্রীবাবামণির ধারাবাহিক বক্তৃতাত্রয় অতীব চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। তাই অদ্য সরিষাবাড়ী মাদ্রাসার কর্ত্তৃপক্ষ শ্রীশ্রাবাবামণিকে আমন্ত্রণ করিয়াছেন।

ছাত্র, অভিভাবক প্রভৃতি সকল শ্রোতৃবর্গই মুসলমান। তবে, স্থানীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দুই একজন করিয়া বিশিষ্ট হিন্দুও সভায় যোগ দিয়াছেন। একজন মুসলমান ফটোগ্রাফার সভাস্থলে একটী আলোকচিত্র গ্রহণ করিলেন।

সকল নারীই তোমার মায়ের ছবি

প্রায় তিন চারি হাজার লোকের সমক্ষে ত্যাগ, তপস্যা, সংযম ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সম্বন্ধে সাড়ে তিন ঘণ্টা কাল বক্তৃতা দানের পরে শ্রীশ্রীবাবামণি নারীধর্ষণ সম্পর্কে বলিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—হিন্দুর রমণীও ভগবানের সৃষ্ট, মুসলমানের রমনীও ভগবানের সৃষ্ট। হিন্দুর ঘরণী হোক্, আর মুসলমানের ঘরণী হোক্, নারী মাত্রেই সমাজের মূল ভিত্তি এবং নারীর সতীত্বই জগতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তুমি যে ধর্ম্মাবলম্বীই হও, নারী মাত্রেরই প্রতি পূর্ণ মাতৃ-দৃষ্টি তোমার ধর্ম্মের বিধান। স্বধর্ম্মী নারীকে অসম্মান কর্‌লে নরকে যাবে, আর পরধর্ম্মী নারীকে অসম্মান করলে স্বর্গে যাবে, এরূপ মারাত্মক শিক্ষা জগতের কোনো প্রকৃত ধর্ম্মোপদেষ্টা বোধ হয় প্রদান করেন নি। কোনো ধর্ম্মশাস্ত্রই বোধ হয় একথা বলেন নি যে, পরধর্ম্মী নারীর নিপীড়ন কর্লে কম পাপ হয়, আর নিজধর্ম্মী নারীকে নিপীড়ন কর্লে বেশী পাপ হয়। নারীমাত্রেই তোমার মাতৃস্থানীয়া, সে হিন্দু হোক্, সে ইহুদী হোক্, সে খ্রীষ্টান হোক্ আর সে মুসলমান হোক্। একমাত্র বিবাহ-লব্ধা নারী ব্যতীত অপর যে নারীকেই তুমি লঙ্ঘন কর, তোমার মাতৃ-লঙ্ঘনের অপরাধ হবে,—সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত থেকে তোমার নিষ্কৃতির কোনো পথ নেই। তপস্বিনী রাবেয়া তোমার পূজ্যা, আর পতিব্রতা সীতাদেবী তোমার অপূজ্যা, এ ধারণা ভ্রমেরই ফল, অজ্ঞানতারই ফল। শ্রোতৃগণ, তোমরা জ্ঞানী হও, পরের মুখের ঝাল না খেয়ে নিজের সদাজাগ্রত বিবেক-বুদ্ধির দ্বারা কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য নির্ণয়ে যত্নশীল হও, তখন দেখ্‌বে, তোমারই জননী বিশ্ব জুড়ে কোটি কোটি হিন্দু নারী, মুস্লিম নারী, বৌদ্ধ নারী, জৈন নারী, শিখ নারী, খ্রীষ্টান নারী, পার্শী নারী, কাফ্রী নারী, সাঁওতাল নারীতে পরিণত হয়েছেন। জগতের যত নারীমূর্ত্তি সব তোমার

নিজের মায়ের জাজ্জ্বল্যমান ছবি।

প্রশংসনীয় চেষ্টা

মাদ্রাসা হইতে ফিরিয়া আসিয়াই শ্রীশ্রীবাবামণি প্রথমতঃ সান্ধ্য ব্রহ্মকর্ম্ম সমাপন করিলেন। তৎপরে মুলতুবী পত্র-সমূহের জবাব দিতে বসিলেন।

ফরিদপুর-নগরকান্দা-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"চরিত্রকে নানা সদ্‌গুণে অলঙ্কৃত করিবার চেষ্টা অতীব প্রশংসনীয়। এই চেষ্টা যার থাকে না এবং আপনা আপনি জীবন গঠিত হইয়া যাইবে বলিয়া কল্পনা-বিলাসে মজিয়া যে সময় এবং সুযোগ অতিক্রান্ত করে, ক্রমশঃ তাহার চরিত্রে এমন সকল নিকৃষ্ট দোষের সমাবেশ ঘটিতে থাকে যে, পরিশেষে প্রচণ্ড ও একনিষ্ঠ ধারাবাহিক চেষ্টা ব্যতীত প্রতীকারের কোনও পন্থা থাকে না। কিন্তু চরিত্রকে নানা সদ্‌গুণে অলঙ্কৃত করিবার চেষ্টা প্রশংসনীয় হইলেও তদপেক্ষা অধিকতর প্রশংসনীয় চেষ্টা আছে। তাহা হইতেছে, ভগবানে শুদ্ধা ভক্তির অনুশীলন করা। শুদ্ধা ভক্তির উদয় হইলে অপরাপর শত সহস্র সদ্‌গুণ আপনা আপনি জীবন-মধ্যে বিকশিত হইয়া থাকে। মূলে জল ঢালিলে যেমন সমগ্র বৃক্ষটীর শাখা-পত্র-কিশলয়-কুসুম সমেত প্রত্যেকটী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রস-প্রাচুর্য্যে উৎফুল্ল হইয়া ওঠে, ইহাও তদ্রূপ।"

সাম্বৎসরিক দাম্পত্য সংযম

ঢাকা বারইখালি-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে

শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে যে ফল, এক বৎসর দাম্পত্য সংযমে সেই ফল,—একথা আজ আমি প্রাতেই একটী মহিলাকে লিখিয়াছি। যাবজ্জীবন দাম্পত্য সংযমে দম্পতীর চরম লাভ, কিন্তু সেই লাভ বংশধারা বহিয়া চলে না। কিন্তু সম্বৎসর-ব্যাপী সংযমের ফলজাত সন্তান পিতামাতার সংযমের অনুশীলনকে নিজেদের স্বাভাবিক সম্পদ রূপে পাইয়া ভূমিষ্ঠ হয়। এই কারণেই আমৃত্যু দাম্পত্য-সম্পর্ক-বিরহিত দাম্পত্য জীবনের ব্যাপক যাপন এই যুগসন্ধিক্ষণে প্রয়োজন নহে, প্রয়োজন হইতেছে উপযুক্ত সন্তানের জন্মকে সম্ভব করিবার জন্য সাম্বৎসরিক বা ত্রৈবার্ষিক ব্রতপালন।"

অন্তর্ম্মুখ হও

শ্রীহট্ট-মোগলাবাজার-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—"জড়ের তোমরা উপাসক নহ, তোমরা চৈতন্যের উপাসক, উপলক্ষ্যের তোমরা পূজক নহ, তোমরা স্বরূপের পূজক,—এই একটী কথা স্মরণে রাখিয়া সাধন-পথে সিংহ-বিক্রমে চল। তাহা হইলেই দেখিবে, জগৎজোড়া বৃথা জঞ্জাল তোমাদের স্পর্শমাত্রও করিতে পারিবে না। অন্তর্দৃষ্টি হারাইয়া শুধু বাহ্যানুষ্ঠান লইয়া প্রমত্ত থাকিবারই ফল তোমাদের বর্ত্তমান দুরবস্থা, একথা ভুলিও না। উচ্চতম ব্রহ্মানুভূতির গালভরা তত্ত্ব মুখে আলোচনা করিয়া কার্য্যতঃ ভেদবুদ্ধির প্রশ্রয় দেওয়া ও আশ্রয় নেওয়া এই বহির্ম্মুখতারই ফল। অন্তরে ডোব, সাধন-বলে স্বরূপ-দর্শন কর।"

ভক্তিলতিকায় জীবন-পুষ্প

ত্রিপুরা সুলতানপুর-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ভগচ্চরণে প্রাণ-মন সমর্পণ না করিয়া যত তোমার দেহোন্নতি বিধানের প্রয়াস, সকলই জানিবে মৃতদেহে চন্দন-বিলেপনের ন্যায় অর্থশূন্য। অবশ্য, অগ্নি-সংযোগের পূর্ব্বে লোকে যজ্ঞ-বুদ্ধিতে মৃতের শরীরে যে ঘৃতকস্তূরী-কর্পূরাদি বিলেপন করেন, তাহা একেবারে অর্থহীন নহে। কিন্তু তুমি যে যজ্ঞবুদ্ধি পরিহার করিয়া শুধু ক্ষণিকের সুখকে করায়ত্ত করিবার জন্য প্রয়াসী হইয়াছ, তাহা নিরর্থক। বীর হও, কিন্তু ভক্ত হইয়া। কর্ম্মী হও, কিন্তু ভক্ত হইয়া। সেবক হও, কিন্তু ভক্ত হইয়া। ঐহিক উন্নতি সাধন কর, কিন্তু ভক্ত হইয়া। পরোপকার কর, কিন্তু ভক্ত হইয়া। ভগবদ্‌ভক্তিকেই তোমার অস্তিত্বের প্রধান সর্ত্ত কর এবং সেই ভক্তির লতিকায় তোমার ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, কর্ম্ম, সেবা, জ্ঞান, বুদ্ধি, সাম্য ও শৌর্য্যের ফলফুল বিকশিত হইয়া উঠুক।"

পরহিতকারী কর্ম্মী ও ভক্ত সাধক

রাজসাহী-বলিহার-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সত্য সত্য যিনি ভক্তির আনন্দে নিমজ্জিত হন, তাঁর পক্ষে নিজ দেহের ভালমন্দের চিন্তা পর্য্যন্ত থাকে না। তিনি অপরের দেহের বা মনের ভালমন্দের খবর রাখিবার অবসর পান না।

এই যে একটী অবস্থা, ইহা বড়ই শ্লাঘনীয়। কেননা, এই অবস্থাতে সাধক তথাকথিত পরহিতাদি কার্য্যে রত হইতে পারুন আর না পারুন, অপরের অহিত যে কখনই সম্পাদন করিবেন না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। পরহিত করা অপেক্ষাও অজাতশত্রু হওয়া অনেক শ্রেয়ঃ। পরহিতকারী অনেক সময়ে নিজের অজ্ঞাতসারে অপরের অহিতও করিয়া থাকেন, দূরদৃষ্টির অভাব বশতঃ সাম্য প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া অসাম্যের সৃষ্টি করেন, দান-পুণ্য করিতে গিয়া প্রার্থীর লোভ-প্রবৃত্তিকে সন্ধুক্ষিত করেন কিন্তু ভগবদ্-ভক্তিতে সমাহিতচিত্ত ব্যক্তি জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কোনও অবস্থাতেই মুখ্যতঃ বা গৌণ ভাবে জীবমাত্রের জন্য কোনও অহিত করেন না। এই কারণে জগতে কর্ম্মী অপেক্ষা ভক্ত শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যথার্থ ভক্তের যে স্বভাবলব্ধ লোকমান, তাহা দর্শনে ভক্তি-বিষয়ে অনধিকারী স্বল্পপ্রাণ ব্যক্তিরা সহজে লোক-প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনের মানসে অনেক সময়েই ভক্তির ভাণ করিয়া লোকহিত-কর্ম্মকে গর্হণ করিয়া থাকে এবং তাহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণে সমগ্র দেশ একদল পরান্নজীবী, পররক্তপুষ্ট জলৌকায় পূর্ণ হইয়া জাতির ঐহিক সামর্থ্যকে অপব্যয়িত করিয়া জগতের প্রতিযোগিতায় তাহাকে দুর্ব্বল করে এবং তাহারই অন্যতম ফলস্বরূপে চিরপরাধীনতার নাগপাশে জাতিকে দৃঢ়বদ্ধ করে। এই দৃষ্টিতে তোমাদের বহুপূজ্য ভক্তি-ধর্ম্মের স্তম্ভগণের চেয়ে কর্ম্মী পরোপকারীরা শ্রেষ্ঠ। বিচার করিয়া আমার কথাগুলি গ্রহণ করিও, অন্ধের মত মানিয়া লইতে বলি না।"

সত্য নামে সত্য নিষ্ঠা দাও

শ্রীহট্ট হবিগঞ্জ-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমাদের ধন নাই, তোমরা পণ্ডিত নহ, লোক-প্রতিষ্ঠার পার্থিব সৌভাগ্যের তোমরা অধিকারী নহ, দশে তোমাদের চিনে না, জানে না বা মানে না, এই সকল কথা তোমাদের ভবিষ্যৎ অভ্যুদয়কে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না। সর্ব্বমন্ত্রের সার, সর্ব্বমন্ত্রের প্রাণ, সর্ব্বমন্ত্রের সম্রাট তোমাদের আরাধ্য-ধন। ভেদবুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়া অখ্যাত অজ্ঞাত অপূজিত তোমরা নিষ্ঠার সহিত ইষ্টমন্ত্রকে আঁকড়াইয়া ধর। সহস্র বিঘ্ন ঝঞ্ঝার বিক্রমে তোমাদের মস্তকের উপর দিয়া বহিয়া যাউক, শাণিত কৃপাণ তোমাদের স্কন্ধোপরি উদ্যত হইয়া বিভীষিকা দেখাইবার চেষ্টা করুক, ভূকম্প-তাড়নে পদতল হইতে ধরিত্রী সরিয়া পড়িবার উদ্যম দেখুক, তোমরা পবিত্র ওঙ্কারের মধুর ঝঞ্ঝার কিছুতেই পরিহার করিও না। নবজাতি-সৃষ্টি, দেবজাতি-জন্ম ইহার ভিতর দিয়া আপনা আপনি হইবে। ওঙ্কার অভয়ের মন্ত্র, ওঙ্কারের তত্ত্ব অভয়, প্রভাব অভয়, নিনাদ অভয়ান্বিত। নামে নিষ্ঠাবান্ হও, কুশগুচ্ছ দিয়া বজ্রধরের বীর্য্য প্রকাশ ঘটিবে, ধূলি-মুষ্টি দিয়া সুবর্ণের খনি কিনিয়া আনিবে, বেণুধ্বনি দিয়া কামানের গর্জ্জন থামাইয়া দিবে। সত্য নামে সত্য নিষ্ঠা দাও, তোমাদের ধন-জন-বিদ্যার চূড়ান্ত অভাবও তোমাদের অভ্যুদয়ের বিঘ্ন হইবে না। অথবা, সত্যতর বলিতে হইলে, নামের নিষ্ঠা হইতেই তোমাদের ধনও আসিবে, জনও আসিবে, বিদ্যাও আসিবে।"

নবীনগর (কুমিল্লা)
২২ শে ফাল্গুন, ১৩৪০

গতকল্য শ্রীশ্রীবাবামণি নবীনগর আসিয়াছেন।

করার মত নাম কর

একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন,—বাবা, অনেক দিন ধ'রেই ত' নাম জপে যাচ্ছি, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের চপলতা ত' দূর হল না। এর উপায় কি ? এর কারণই বা কি ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নাম ক'রেছ, কিন্তু করার মত কর নি। এখন থেকে করার মত কর। লোক-দেখানো নাম-সাধন নয়, প্রাণ মজান নাম-সাধন, মন-ডুবান নাম-সাধন, যে সাধনে তুমি আর তোমার প্রাণের প্রভু ছাড়া আর তৃতীয় সাথী নেই, যে সাধন অবিরাম, অবিশ্রাম, নিরন্তর, যে সাধনে একমাত্র ভগবৎ-প্রীতি ব্যতীত দ্বিতীয় প্রার্থনা নেই, একমাত্র ইষ্টনিষ্ঠা ব্যতীত অন্যতর বস্তুতে অভিনিবেশ নেই, সেই সাধন কর বাবা, সেই সাধন কর। করার মত ক'রে নাম কর, দেখ্‌বে ঐহিক ও পারত্রিক সকল তাপ, সকল জ্বালা, সকল বিক্ষিপ্ততা, সকল বিকার বিনা চেষ্টায়, বিনা যত্নে, বিনা ইচ্ছায় আপনা আপনি দূরীভূত হয়ে যাবে।

একনিষ্ঠ হও

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রকৃত সাধকের কি পাঁচ দিকে দশ দিকে মন দেবার অবসর আছে ? একটী লক্ষ্য, একটী আদর্শ, একটী অবলম্বন নিয়েই সে ডুবে যায়। তোমরা একটী

নিয়ে ত' ডোব না, মনকে ছড়াও সহস্র দিকে, সহস্র জনকে প্রভু কর, হাজার মনিবের গোলামী নিয়ে শেষে কাকে আগে আর কাকে পরে অর্চ্চনা কর্‌বে, সেই হট্টগোলে ঠেকে যাও। এক একটা ঠাকুর-ঘর যেন এক একটা যাদুঘর, বৈদিক তান্ত্রিক, শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত, গাণপত্য প্রভৃতি যুগযুগান্তর-পূজিত শত শত পূজা-প্রতীকের একটা প্রদর্শনী যেন ধর্ম্ম-সাধনার ইতিহাসের প্রাগৈতাহাসিক যুগ থেকে সমসাময়িক কাল পর্য্যন্ত রক্ষিত একটা জাজ্জ্বল্যমান মেলা,—ওর মাঝে ব'সে তোমার সাধন হবে কেমন ক'রে ? শত শত বিগ্রহ হঠাও, একটীকে নিয়ে মজ, একটীকে নিয়ে ডোব, একটীর ভিতরে অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত কোটী বৈচিত্র্যের সমাবেশ লক্ষ্য কর, একটীকে দিয়ে বহির্বিশ্বের নিখিল বিশ্বের নিখিল বস্তুকে সমাবৃত কর, একটীকেই নিখিল বিশ্বের নিখিলপ্রাণে লক্ষ্য কর। নাম-সাধনে তবে ত' বাবা ফল দেখ্‌বে, তবে ত' বাবা সাধন ঠিক্ ঠিক্ করার মত হবে।

রাধাকৃষ্ণের লীলা বিষয়ক পালা-কীর্ত্তন

একজন গ্রাম্য বৈষ্ণব কোনও বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে তদুত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—রাধাকৃষ্ণের লীলা একটী অপার্থিব আধ্যাত্মিক রাস-লীলা। অত্যুন্নত বৈষ্ণবেরাও বার বার একথা ঘোষণা করেছেন যে, এই লীলা ইন্দ্রিয়পর সাধারণ মানবের বোধগম্য নয়, সুতরাং এই তত্ত্ব নিয়ে ভোগবুদ্ধিপরায়ণ ইতর মানবের সাথে আলোচনাই কর্ব্বে না। তাঁদের এই নির্দ্দেশ যদি প্রামাণ্য হয় তাহলে আপনাদের পক্ষে মানলীলা, বিরহ-

লীলা, নৌকা-বিলাস, বস্ত্রহরণ প্রভৃতি পালা-কীর্ত্তনগুলি হাটে, বাজারে সাধারণ লোকের সমক্ষে ক'রে না বেড়ানই উচিত। স্কুলের বালক, কুমারী-বালিকা, অশিক্ষিত জনসাধারণ অনেক সময়েই এর প্রকৃত তত্ত্ব বুঝবে না, মাঝখান থেকে কতকগুলি চপল কথা স্মৃতির পটে এঁকে নিয়ে ঘরে যাবে। যে যা শোনে, সে তা' করে। নৌকা-বিলাস শুনে অনেক গ্রাম্য যুবক সুযোগ পেলেই নৌকা-বিলাসের অনুকরণ কত্তে চেষ্টা কর্ব্বে। বস্ত্রহরণ পালা শোনার পরে দুচারটী বস্ত্রহরণের বাস্তব অভিনয় এদিকে সেদিকে নিশ্চিত হবে। লীলা-কীর্ত্তনের গায়ক সকল সময়েই পরম-ভাগবত শুদ্ধ বৈষ্ণব হবেন না, তাঁর প্রাকৃত-জনোচিত চপল মন তাঁর রচিত আখরের ভিতর দিয়ে অনেক সময়ে আত্মপ্রকাশ কর্ব্বে, এবং যদিও তিনি বা সাহিত্যিক-রুচি-সম্পন্ন শ্রোতারা আখরের অভিনবত্বের বাহার দেবেন, তবু সেই সব আখরের কবিত্বের ভিতর দিয়ে তাঁর চপল ইন্দ্রিয়পর মনই গিয়ে অপর সাধারণ ব্যক্তিদের মনের উপরে ক্রিয়া কর্ব্বে। তাতে সামাজিক জীবনে অনাচারের দৃষ্টান্ত বেড়ে যাবে। আপনাদের সে বিষয় ভাবা উচিত।

কেবলাদ্বৈত-বাদ, শুদ্ধাদ্বৈত-বাদ, অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বাদ, দ্বৈত-বাদ এবং অখণ্ড-বাদ

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —দার্শনিক মতবাদ সাধনের ফলে লব্ধ উপলব্ধিরই ফলমাত্র। উপলব্ধি যতই নিবিড়, দার্শনিক মতবাদ ততই গভীর। একজন

বলেছেন,—"মায়া অসত্য, নিখিল জগৎ মায়া, ব্রহ্মই একমাত্র বস্তু এবং সেই বস্তুই সত্য, তিনি নির্ব্বিশেষ, আর জীব ও ব্রহ্মের ভিতরে তিলমাত্র ভেদ নেই।" কেবলাদ্বৈতবাদীর এই দার্শনিক মতবাদ তাঁর উপলব্ধিরই ফল। আবার, আর একজন বলছেন, —"জীব ব্রহ্মেরই অংশস্বরূপ, তাঁরই শক্তি হচ্ছে মায়া, তাঁরই কার্য্য হচ্ছে জগৎ, এজন্য জীবই বল, মায়াই বল, আর জগৎই বল, সবই হচ্ছে ব্রহ্মপদবাচ্য।" শুদ্ধাদ্বৈতবাদীর এই দার্শনিক মতবাদও তাঁর উপলব্ধিরই ফল। আবার, আর একজন বল্ছেন, "জীব ব্রহ্ম-বস্তু থেকে কোনো পৃথক্ বস্তু নয়, আবার সে ব্রহ্মের সাথে অভেদ বস্তুও নয়, যুগপৎ সে ব্রহ্মের সাথে অভিন্ন—আবার তাঁর থেকে বিভিন্ন, জীবও সত্য ব্রহ্মও সত্য, কিন্তু সত্য বস্তু বহু নয়, সত্য বস্তু এক। জীব অসত্যও নয়, অদ্বয় বস্তু থেকে ভিন্নও নয়, অভিন্নও নয়, পরন্তু পরমতত্ত্ব দুই নয়, বহু নয়, এক এবং অদ্বিতীয়।" অচিন্ত্য-ভেদাভেদ বাদীর এই দার্শনিক মতবাদও তাঁর উপলব্ধিরই ফল। আর একজন বল্ছেন, —"জীব ও ব্রহ্ম কখনো এক হ'তে পারে না, এক হ'তে গেলে প্রেমরসের আস্বাদন কর্ব্বে কিরূপে, একজন সেবক, একজন সেব্য, এই দুইয়ের নিত্যত্ব দিয়েই ভক্তির চরমোৎকর্ষ, সুতরাং জীব ও ব্রহ্ম অভেদ নয়, হতেও পারে না।" দ্বৈতবাদীর এই দার্শনিক মতবাদও তার উপলব্ধির ফল। কিন্তু সকল বিচিত্র উপলব্ধিরই ঊর্দ্ধে এমন এক উপলব্ধি আছে, যা কখনো কোনো মতবাদের দ্বারা প্রকাশিত হ'তে পারে না। সেইটী হচ্ছে অখণ্ড-বাদ বা অখণ্ড-তত্ত্ব। অখণ্ড-তত্ত্বে সর্ব্বমতের স্বীকৃতি আছে,

কিন্তু তদূর্দ্ধে, প্রকাশশক্তির অতীতে যে চরম উপলব্ধি, তার মাঝে সর্ব্বমতের, সর্ব্ববিরোধিতার পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য এবং সঙ্গতিও রয়েছে।

অখণ্ড দর্শন কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—স্বতঃই অখণ্ড-বাদ বা অখণ্ড-দর্শন সর্ব্ব-মতবাদ বা সর্ব্ব-দর্শনের পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য। পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য বলেই গ্রন্থ বা প্রচারের মাধ্যমিকতায় তার প্রতিষ্ঠা হবে না। তার প্রতিষ্ঠা হবে একাগ্র সাধকের উদগ্র সাধন-নিষ্ঠার ভিতর দিয়ে। অখণ্ড-ধর্ম্ম-সমগ্রের ধর্ম্ম, অংশের নয় বা খণ্ডের নয়। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে সে আকর্ষণ করবে, জাতি লিঙ্গ-ভেদের সকল বিভিন্নতাকে অতিক্রম ক'রে সে তার অলঙ্ঘনীয় প্রভাবকে অনুভূত করাবে শুধু আত্ম-প্রতিষ্ঠা-বিলোপকারী সাধকের সাধন-বলের ভিতর দিয়ে। অখণ্ড-ধর্ম্ম স্বতঃ-প্রকাশশীল হবে, তাই প্রচারশীলতার প্রয়োজন হবে না। কিন্তু আত্ম-বিকাশের স্বাভাবিক ধর্ম্মে-সাধকেরা প্রচারক হবে।

শিবপুর (কুমিল্লা)
২৮ শে ফাল্গুন, ১৩৪০

পরের উদ্ধার ও আত্ম-কৃতার্থতা

শ্রীশ্রীবাবামণি শিবপুর শ্রীযুক্ত গৌরীভূষণ চৌধুরীর বাড়ী আসিয়াছেন। অপরাহ্নে বিদ্যাকূট অঞ্চল হইতে একটী যুবক কিছু উপদেশের জন্য আসিয়াছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দেখ, বৈষ্ণবদের একটী বড় চমৎকার

কথা আছে,—

“যারে দেখে তারে বলে, দন্তে তৃণ ধরি,—
আমাদের কিনিয়া লহ, ভজ গৌর-হরি।”—

এই কথাটীর ভিতরে যে অপূর্ব্ব উপদেশ আছে, তা' তোমাদের অকপট মনে গ্রহণ কত্তে হবে। সবাই বলেছেন,—“এস জীব, আমার কাছে ধর্ম্মের কথা শোন, নিজের উদ্ধারের পথ দেখ।” আর বৈষ্ণব ঠাকুর বল্‌ছেন,—“এস জীব, যে যেখানে আছ, অধিকারী-অনধিকারী প্রশ্ন নিয়ে বিচার-বিতর্কের আমার রুচি নেই, তুমি যে হও সে হও, একবার পরমপ্রভুর শরণ লও, আর আমাকে কিনে রাখ। তুমি যে তাঁকে ডাক্‌বে, এতে আমারই লাভ, তাই তোমার কাছে আমার এত বিনয়।” খুঁজে দেখ, এমন চমৎকার মনোভঙ্গী নিয়ে ভগবানের নামপ্রচারে কে কোথায় যত্নবান্ হয়েছেন ? সম্ভবতঃ এরূপ দৃষ্টান্ত জগৎ খুঁজে আর দ্বিতীয়টী পাবে না। “হে জীব, তোমার মুখে হরিনামের মধুর ধ্বনি উত্থিত হলে আমারই তাতে লাভ,”—এ কথা ভাবার মত বিনীত মন, ভাবুক মন জগতে ক'জন প্রচারকের থাকে ? তোমরা এই সব পরমপূজ্য বৈষ্ণব ঠাকুরদের মনোভাব গ্রহণ কর। গৃহে গৃহে যাও, নিদ্রিত পরাণে জাগরণের রশ্মি-সম্পাত কর। কিন্তু তাকে উদ্ধারের জন্য নয়, নিজেকে কৃতার্থ করারই জন্য।

নাম-প্রচারের ভাবী বন্যা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমরা যখন মধুর নাম-প্রচারের ব্রত নিয়ে দিগ্‌বিদিকে ভ্রমণ কর্‌বে, তখন কেউ এসে জিজ্ঞাসা

করবে না যে, তোমরা কে ব্রাহ্মণের ছেলে, আর কে চামারের ছেলে, কে শূদ্রাধমের দাসী-পুত্র, কে রাজর্ষির ঔরসজাত, কে ব্রহ্মদর্শীর সাক্ষাৎ সন্তান, কে মদ্যবিক্রেতার পথপ্রাপ্ত শিশু। তোমাদের প্রেমমধুর হরি-ওঙ্কার ধ্বনি সকলের প্রাণমন বিগলিত কর্ব্বে, সাধন-ধর্ম্মে দীক্ষিত হ'য়ে অখণ্ড-সত্যে সুস্থির হবার পথ পাবার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে নিজের নিজের প্রাণের টানে আবাল-বৃদ্ধ যাবতীয় নর-নারী ছুটে আস্‌বে। প্রত্যেকে তোমরা যথার্থ সাধক হও এবং নিখিল ভুবনে সাধনের তরঙ্গ সৃষ্টি কর, অজ্ঞানকে জ্ঞান দাও, অবিদ্যাচ্ছন্নকে ব্রহ্ম-বিদ্যা বিতরণ কর, মূর্খকে উপদেশ-ভাষণে পণ্ডিত কর, দুর্ব্বলের বুকে ব্রহ্মবলের আকর স্থাপন কর, অবিশ্বাসীর হৃদয়ে বিশ্বাসের বীজ বপন কর। আত্মপ্রচার নয়, নাম-প্রচারই তোমাদের লক্ষ্য হউক, আত্ম প্রতিষ্ঠা নয়, শান্তি প্রতিষ্ঠাই তোমাদের কাম্য হোক।

মানুষ-মাত্রেরই অধিকার

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমার ধর্ম্মে বর্জ্জন-নীতি নেই, হাঁড়ির বিচার নেই, ছুৎমার্গ নেই,—মানুষ মাত্রেরই এতে পূর্ণ অধিকার। মনুষ্যমাত্রস্য পরমাশ্রয়োঽয়ম্। কে কোথায় জন্মেছে, কে কিভাবে জন্মেছে, সে বিচার যে করে করুক, তুমি ক'রো না। ভাগবত জীবন যে যাপন কত্তে চায়, তাকেই তুমি প্রেমের আলিঙ্গন দিয়ে বুকে তুলে ধর্‌বে। তোমার ধর্ম্ম সর্ব্বেষামেব হ্যধিকারবস্তু। বিন্দু মাত্র কুণ্ঠা না রেখে, বিন্দুমাত্র দ্বেষ না ক'রে বিষ্ঠাকুণ্ড থেকে মানুষকে তুলে এনে সৎসংস্কারের পবিত্র সলিলে

আপাদমস্তক অবগাহিত ক'রে শুদ্ধ ক'রে তাকে বুকে তুলে নেবে। তাকে তার অতীত জীবন ভুলিয়ে দেবে, তার সকল দুর্লোপ্য কুসংস্কার দূর ক'রে দেবে, নবজন্মের অধিকারী ক'রে তাকে নূতন জীবন দান কর্‌বে।

শিবপুর (কুমিল্লা)
২৯ শে ফাল্গুন, ১৩৪০

ঐক্যের মূলসূত্র

অপরাহ্নে শ্রীশ্রীবাবামণি মাঠে বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন। কয়েকটী তরুণ কিশোর তাঁহার সঙ্গ নিয়াছে।

কথা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সেব্য তোমাদের একজন, তোমরা সকলে একমাত্র তাঁরই সেবক, এই একটী মাত্র সত্যে সুস্থির হলেই তোমাদের ঐক্য আপনি এসে যাবে। তোমাদের হাজার হাজার প্রভু, তাই না ঐক্য সুদূরপরাহত হয়েছে। রামের প্রভুর মান বেশী, না শ্যামের প্রভুর মান বেশী, এই কলহেই না তোমাদের জীবনের অর্দ্ধেকাংশ সময় অপব্যয়িত হয়ে গেল ? সকলের যিনি প্রভু, একমাত্র তিনিই তোমাদের প্রভু হউন, ঐক্যের এইটীই হবে মূলসূত্র।

অভিন্ন ইচ্ছার শক্তি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভগবানে এমন ভাবে আত্মসমর্পণ কর যেন তোমার ইচ্ছা বলে পৃথক্ একটা ইচ্ছার আর অস্তিত্বই না থাকে। তাঁর ইচ্ছার ভিতরে নিজের ইচ্ছাকে নিমজ্জিত ক'রে দাও, ফলে তোমার ইচ্ছা আর তাঁর ইচ্ছার মধ্যে পরিপূর্ণ

অভিন্নত্ব স্থাপিত হয়ে যাবে। দশজন লোক যখন সমপ্রযত্নে নিজের ইচ্ছাকে ভগবদিচ্ছায় বিলীন করে, তখন এই দশজনের আর দশটা পৃথক্ পৃথক্ ইচ্ছা থাকে না, সকলের বিভিন্নমুখী বিচিত্র ইচ্ছা একটীমাত্র একমুখী অভিন্ন ইচ্ছায় পরিণত হয়। সেই ইচ্ছা জগতে অসাধ্য সাধন কত্তে পারে।

প্রকৃত সেবক হও

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আত্মসুখের তাড়নায় প্রত্যেকে এক এক রকমের ইচ্ছা পোষণ কচ্ছ এবং অবিরাম ভগবানকে আদেশ কচ্ছ যেন তিনি তোমার ইচ্ছাটী পূরণ ক'রে দেন। অর্থাৎ নামেই তাঁকে প্রভু ক'রেছ, কার্য্যতঃ নিজের হাতে প্রভুত্বের বল্‌গা ধারণ ক'রেছ, ছ্যাকড়া গাড়ীর ঘোড়া মনে ক'রে ভগবানকে অবিরাম চাবুক মারছ আর তোমার ইচ্ছামত তাঁকে চল্‌তে বা থামতে বল্‌ছ। অর্থাৎ হঠাৎ তোমার প্রাণের প্রভু তোমার চাবুকের গোলামে এসে পরিণত হলেন, আর তুমি একান্ত সেবক হঠাৎ উচ্চাসনে এসে বস্‌লে। তোমরা এক এক জনে এক এক রকমের ইচ্ছার তাড়নে ভগবানকে এক এক দিকে চালাতে চাচ্ছ। জগতের সকল অনৈক্যের মূল ত' এইখানে। তাঁকে যদি প্রভুই বল্‌ছ, তবে সত্যি সত্যি দাস হও, সত্যি সত্যি সেবক হও, তোমার ইচ্ছা-পালনের জন্য তাঁর উপরে তাগিদ না দিয়ে তাঁর ইচ্ছা-পালনের জন্য নিজের উপরে তাগিদ দাও। এভাবে সবাই মিলে যদি সেই পরমপ্রভুর সত্যিকারের সেবক হও, তবে জগতে অনৈক্য থাক্‌বে কেমন ক'রে ? নিজের সুখের পক্ষে

বিঘ্নকর হ'লে যে সেবক সেব্যের সেবা ত্যাগ করে, তাকে কি সেবক আখ্যা দেওয়া যায়। যেখানে পতির স্বার্থ এক আর পত্নীর স্বার্থ অপর, সেখানে কি দম্পতীর ভিতরে কোনও প্রেমমধুর সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয় ?

শিবপুর (কুমিল্লা)
৩০ শে ফাল্গুন, ১৩৪৪

সত্য সুখ

প্রসিদ্ধ স্বরদী ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত নায়েব আলি খাঁ, শ্রীশ্রীবাবামণির চরণ-সন্দর্শনে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—গুরুদেব, সংসারের ভিতরে সত্য সুখ কি আছে ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পরমেশ্বরে মন প্রাণ সমর্পণ ক'রে যে আনন্দের উদয় হয়, তাতেই সত্য সুখ নিহিত। আর সেই আনন্দকে বক্ষে ধারণ ক'রে নিজের দেহ-চেষ্টাকে নিযুক্ত রাখার ভিতরে সে সুখের পরিপূর্ণতা ঘটে। আত্মসুখকে অনাদর ক'রে পরসুখে দৃষ্টিদান এবং পরসুখের ভিতর দিয়ে ভগবৎ-প্রেমের পরমসুখ আস্বাদন, এই হচ্ছে চরম সুখ।

শিবপুর (কুমিল্লা)
১লা চৈত্র, ১৩৪০

দান ও চিত্তশুদ্ধি

অপরাহ্ণে মাঠে ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীশ্রীবাবামণি বিটঘর গ্রামের উপকণ্ঠে আসিয়া পড়িয়াছেন। এই গ্রামে প্রসিদ্ধ দানবীর মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের জন্ম। কথা-প্রসঙ্গে মহেশবাবুর গুণ-

প্রশংসা হইতে লাগিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মানুষ চিরকাল বাঁচে না, তার ক্ষণভঙ্গুর দেহ একদিন শুষ্ক পত্রের মত ঝ'রে পড়ে যায়। কিন্তু যারা পরহিতে নিজ চিন্তা চেষ্টা দিয়ে যান, তাঁদের দেহ খ'সে পড়লেও তাঁরা অমর। দান চিত্তশুদ্ধির আকর ; যে যত দান করে, তার চিত্ত তত শুদ্ধ হয়।

যশের লোভে দান

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু যশের লোভে যে দান, তাতে চিত্ত শুদ্ধ না হ'য়ে চিত্ত অশুদ্ধ হয়। প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তির লোভ দানের সঙ্গে থাকলে অহঙ্কার ও দম্ভ এসে হৃদয়-মনে প্রভাব বিস্তার কত্তে থাকে। এরূপ দাতা বাহ্যতঃ লোকহিত সাধন করেন বটে, কিন্তু নিজের অন্তরের বিরাট দৈন্য দিনের পর দিন বিশালতরই হ'তে থাকে।

দানবীর মহেশ ভট্টাচার্য্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মহেশ বাবুর দান যশের জন্য দান নয়। এই জন্যই তিনি সকলের নমস্য। ত্রিপুরা, কুমিল্লা জুড়ে দুর্ভিক্ষ হ'ল, সবাই ভাব্‌ল, অতবড় দাতা মহেশ বাবু কি কিছু দেবেন না ? কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাঁকে দেখা গেল না। তিনি চুপ ক'রে গিয়ে ব'সে রইলেন কলকাতায় তাঁর ব্যবসায়-স্থলে। অনেকে মনঃক্ষুণ্ণও হ'ল, কেউ কেউ গালাগালিও দিল। এদিকে পরদুঃখে বিগলিত-প্রাণ শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশন এসে গ্রামে গ্রামে

অন্নদান কত্তে লাগলেন। সমর্থ পুরুষদের কাজে লাগিয়ে পারিশ্রমিক দিয়ে প্রতিপালনের জন্য বিলের মধ্য দিয়ে রাস্তা নির্ম্মাণের কাজ ব্যাপক ভাবে সুরু হ'ল। পঞ্চাশ হাজার টাকার উপরে খরচ হ'য়ে গেল। আজ বহুবৎসর পরে জানা যাচ্ছে যে, এ পঞ্চাশ হাজার টাকা আর কেউ দেন নি, দিয়েছেন দানবীর মহেশ ভট্টাচার্য্য। এই যে আত্মগোপন, একে সামান্য সাধনার ফল ব'লে মনে ক'রো না।

গুরুভক্ত নগেশ ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীবাবামণি মীরপুর গ্রামের উপর দিয়া ফিরিতেছেন। এই সময়ে আলোচনা অন্যদিকে ধাবিত হইল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দেখ, এই মীরপুর গ্রামটীও এক মহাপুরুষের জন্মস্থান ব'লে একদিন গর্ব্ব ক'রে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবে। এক বছর মৌনব্রত সাধন ক'রে যখন নগেশ ব্রহ্মচারী মহাশয় পুনরায় কবিরাজী ব্যবসায়ে মনোনিবেশ কর্ব্বেন ব'লে মনে কচ্ছেন, এমন সময়ে তাঁর গুরুদেব চট্টগ্রাম থেকে তাঁকে ডেকে পাঠালেন যে, সেখানে এসে গুরুর আশ্রমে সেবা-কার্য্যের ভার নিতে হবে। গুরুদেবের আশ্রম একটা জলা জায়গায় স্থাপিত, দিনে রাত্রে দুইবারের জোয়ারে দুইবার আশ্রম ডোবে, দুইবারের ভাটায় দুইবার আশ্রম ভাসে, চতুর্দ্দিক কাদায় স্যাঁতসেতে, জলে ভেসে আসে সাপ, ভেসে আসে মৃত শিশুর পরিত্যক্ত দেহ আর মরা-পোড়ার কাঠ,—প্রতিবেশী হচ্ছে ডোমপাড়ার ডোমেরা, তাদের পচা মাছের গন্ধ দিবারাত্রি বাতাসের সঙ্গে

ভেসে আসে,—আশ্রমের কোনো আয় নেই, গুরুভ্রাতাদের ভিতরে ঐক্য নেই, প্রতিষ্ঠান রক্ষণের আগ্রহ নেই, গুরুদেবের বাক্যের প্রতি শ্রদ্ধা নেই—অথচ নগেশ ব্রহ্মচারীজী গুরুদেবের একটী মাত্র ইঙ্গিতে স্ত্রীর অলঙ্কার আর নিজের ভূসম্পত্তি বিক্রী ক'রে নগদ টাকা হাতে ক'রে গিয়ে হাজির হ'লেন চট্টগ্রামে গুরুদেবের আদেশ পালন কত্তে। এমন যে আদেশ-পালনের শক্তি, তাকে তোমরা সামান্য সাধনার ফল ব'লে জ্ঞান ক'রো না।

শিষ্যরূপী জানোয়ার

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আজকাল শিষ্যেরা গুরুদেবের কাছ থেকে একটা মন্ত্র নিয়ে মনে করে যেন গুরুদেবকে কৃতার্থ ক'রে দিল। তার মত এক জন শিষ্য পেয়ে কি অমুক অঞ্চলে গুরুদেবের পসার বাড়ে নি ? তার মত একজন প্রতিষ্ঠাবান বা কৃতবিদ্য শিষ্য কি গুরুদেব সহজে পেতেন ? সে যদিও একটী কাণাকড়িও গুরুদক্ষিণা দেয় নি, কিম্বা দেবার অভিপ্রায়ও পোষণ করে না, তবু তার মত ব্যক্তি যে গুরুদেবের শিষ্য ব'লে নিজেকে পরিচিত করে এতেই কি গুরুদেবের মান-মর্য্যাদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় নি ? গুরুদেবেরই কি এজন্য তার কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত নয় ? কোনো কোনো শিষ্য আবার এরকমও মনে করে যে, গুরুদেব হিমালয়ে ব'সে বহু বৎসর তপস্যা করলে কি হয়, তিনি এতদিন বনে জঙ্গলে ব'সে যে সত্যকে উপলব্ধি করলেন, শিষ্য ত' এক বছর ঘরে ব'সে সাধন ক'রেই তা' উপলব্ধি করেছে, সুতরাং গুরুদেবের শ্রেষ্ঠতা কোথায় ? কোনো কোনো

শিষ্য এই রকমও মনে করে,—"গুরুদেব সাধক-পুরুষ হ'লেও আমার মত সাংখ্য, বেদান্ত, ন্যায়, বৈশেষিক প্রভৃতি পড়েন নি, কিম্বা আমার মত হেগেল, ক্যান্ট, স্পিনোজা, স্পেন্সর, মিল কোম্‌টের মতামত অবগত নন।" কোনো কোনো শিষ্য এই রকম অভিমানও পোষণ করে,—"লোকে গুরুদেবকে মহাপুরুষ বলে জ্ঞান কর্ল্লেও আমার মত প্রকৃত ত্যাগী তিনি এখনো হ'তে পারেন নি, তাঁর ত' দেখ্‌ছি কেবলি বিষয়-লিপ্‌সা, কেবলি বহির্ম্মুখ শত কাজে রুচি, কেবলি বাহ্য ব্যাপারে আসক্তি।" এই রকম ক'রে জগতে যে কত গুরুর কত রকমের শিষ্যরূপী সব পোষা জানোয়ার আছে, তার ইয়ত্তা নেই। কেউ মনে করে, "গুরুদেব আমার মন্ত্রদাতা হ'লেও শিবপূজা-রহস্য আর গীতার তত্ত্ব আমার মত বোঝেন না।" কেউ বা মনে করে,—"গুরুদেব ব্যাখ্যান খুব ভাল দিলেও আমার মত কীর্ত্তন কত্তে পারেন না, এই বিষয়ে তিনি আমার চেয়ে নিকৃষ্ট।" কেউ বা মনে করে, —"গুরুদেব অবশ্য আদর্শ-পরিবেশনের কাজে পটু, কিন্তু কর্ম্মপরিচালনা কি আর আমার মত ভাল রকম জানেন ?" কেউ বা মনে করে,—"গুরুদেব আমাদের হিতের জন্য যে সব উপদেশ বাণী বলেন, সেগুলি সম্পর্কে তাঁর প্রকৃত তত্ত্বোপলব্ধি কিছুই নেই, কিন্তু আমি যে সব কথা বলি, সবই সম্পূর্ণরূপে তত্ত্বোপলব্ধির সাক্ষাৎ ফল।" মহা মন্দভাগ্য বশে গুরুরা এই জাতীয় সব নিকৃষ্ট শিষ্যকে দীক্ষা দিয়ে থাকেন। কিন্তু এই সব অপাত্র-শিষ্যেরা একজনও গুরুবাক্য-পালনের জন্য জীবনে কোনও মহান ত্যাগ বা বিরাট স্বার্থহানি স্বীকার কত্তে সমর্থ হয়

না। নামেই তারা শিষ্য থাকে, কাজে শিষ্য কখনো হয় না।

গুরুদেবদের অসতর্কতা

কথা হইতে হইতে গুরুদেবদেরও কথা আসিয়া পড়িল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এতক্ষণ ত' শিষ্যদের উপরে খুব এক চোট নিলাম। কিন্তু এর পৃষ্ঠান্তে গুরুদেবদের সম্পর্কেও দুচারটী অপ্রিয় কথা না ব'লে উপায় নেই। একটী তরুণ যুবককে সরল-বিশ্বাস-পরায়ণ দেখে একজন তাকে একটী মন্ত্র দিয়ে হয়ত গুরু হলেন। কিছুদিন যাবার পরে সরল-বিশ্বাসী যুবক নিজের অন্তর্নিহিত আবেগ ও অগ্রগমনোন্মুখ সংস্কারকে তাঁর সঙ্গে বনিয়ে চলতে পারল না। তার মন্ত্র পরিবর্ত্তন করা দরকার হ'য়ে পড়্‌ল। নূতন মন্ত্র সে নিল, নূতন গুরুর আশ্রয় সে স্বীকার কর্ল্ল, অকুণ্ঠ নিষ্ঠায় সাধন চল্‌ল। ঐ তরুণ-বয়সের গুরুদেব নিজ শিষ্যদের দিয়ে চারিদিকে প্রচার করিয়ে যেতে থাকলেন,—"জান না বুঝি, তোমাদের অমুক আমারই ত' শিষ্য হে।" একজন একদা আমার শিষ্য হবার চেষ্টা কচ্ছিল, পরে সে দেখল, আমাকে নিয়ে তার পোষাবে না, সে আমার কাছ থেকে এক মন্ত্র পেয়েছিল, কিন্তু পরে সে এই মন্ত্র পরিত্যাগ ক'রে অন্য গুরুর কাছে অন্য মন্ত্র নিল। এরূপ ক্ষেত্রে তার প্রতি আমার ব্যবহার কেমন হওয়া উচিত? একজনের স্ত্রী স্বামীকে 'ডিভোর্স' ক'রে অন্য জনের সঙ্গে বিবাহিত হ'লে সেই স্ত্রীকে নিজের স্ত্রী ভাবা বা বলা যেমন পাপ, একজন অন্য গুরুর আশ্রয় নিয়ে সাধন পরিবর্ত্তন করার পরে তাকে নিজ-

শিষ্য ব'লে পরিচয় দিতে থাকা তেমন পাপ। যাঁকে তুমি ছেড়ে এসেছ, তাঁর সঙ্গে ভদ্র-ব্যবহার রক্ষা কচ্ছ ব'লেই তুমি তাঁর শিষ্যই রয়েছ, এটা একটা অতিভ্রান্ত যুক্তি।

শাশ্বত গুরু

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—গুরু অন্ধকার দূর করেন। দ্বিধা, কুণ্ঠা, সঙ্কোচ অন্ধকারেরই রূপান্তর। যাঁকে গুরু ব'লে ভাব্‌তে গিয়ে মন কুণ্ঠায় জড়িয়ে আসে, দ্বিধায় সঙ্কুচিত হয়, যাঁকে গুরু ব'লে ভাব্‌তে বসা মাত্র মন নিজের প্রতি নিজে বিদ্রোহী হয়, যাঁকে গুরু ব'লে স্বীকার কত্তে মন হয় তিক্ত, বিরক্ত, বিষণ্ণ, কোনও একদিন তাঁর কাছে ঋণ তোমাকে স্বীকার কত্তে হয়েছিল ব'লেই তাঁকে জনসমাজেও তোমার গুরু ব'লে চালিয়ে দিতে হ'লে, সেটা হয় ভণ্ডামি। ভণ্ডামি চিত্তে সন্তোষ না দিয়ে দেয় বিক্ষোভ। গুরুর সঙ্গে শিষ্যের যে সম্বন্ধ, তার যাথার্থ্য নির্ণয়ের দুটী মস্তবড় কষ্টিপাথর আছে। একটী হচ্ছে এই যে, তাঁর স্মরণে, তাঁর মননে, তাঁর দর্শনে, তাঁর স্পর্শনে বৈকুণ্ঠ লাভ হয়, অর্থাৎ সকল কুণ্ঠা, ভয়, দ্বিধা, সঙ্কোচ, দুর্ব্বলতা, সন্দিগ্ধতা, সংশয় নিমেষে দূর হ'য়ে যায়, নিমীলিত হৃদয়-পদ্ম আনন্দের উচ্ছ্বাসে, উল্লাসের প্রাচুর্য্যে শতদল বিকশিত ক'রে দেয়, অণ্ডমধ্যস্থ নিদ্রিত গরুড়-পক্ষীর পক্ষ-বিস্তার হয়, অনন্ত নভোমণ্ডলে ডানা খুলে সে নির্ভয়ে সূর্য্যাভিমুখে অভিযান করে। এইটী হ'ল প্রথম। দ্বিতীয়টী হচ্ছে এই যে, তাঁর সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কোনও হেতুবাদ বা যুক্তিকে আশ্রয় ক'রে নয়, তিনি তোমাকে কোনো

মন্ত্র দিয়েছেন বা কোনো উপদেশ করেছেন, তাঁরই জন্য নয়। তিনি কোনো মন্ত্র বা উপদেশ তোমাকে না দিয়েও যদি তোমার সর্ব্বসত্তার স্বরূপ হ'য়ে থাকেন, তবে তিনি তোমার গুরু। এইখানেই গুরুর যাথার্থ্য, এইখানেই গুরু শাশ্বত।

আমাকে মানিও না

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই জন্যেই আমি তোমাদের সর্ব্বদা বলি, যেদিন বা যে মুহূর্ত্তে দেখ্‌বে যে, আমার কথা স্মরণে তোমাদের মনে কুণ্ঠাহীনতা জাগে না, জাগে ভয়, সঙ্কোচ, জাগে সন্দেহ, সেই দিন সেই মুহূর্ত্তে তোমরা আমাকে একখানা ছেঁড়া নেকড়ার মত আনাদরে বর্জ্জন ক'রো। আমি যে তোমাদের গুরু, এই কথাটী যেন লোকাচার মানবার জন্যই না স্বীকার কর। আমি যে তোমাদের গুরু, সে কথা যেন তোমাদের মনের কথাই হয়। যখন আমি সত্যই তোমাদের গুরু, তখন আমি তোমার জীবনে দুর্জয়, তখন আমার ইচ্ছা তোমার জীবনে ঘটাবে অঘটন, তখন আমি অতি সাধারণ তোমাকে দিয়ে অতি অসাধারণ কাজ করাতে সমর্থ। আর তোমার মনে যেখানে আমার গুরুত্ব সম্পর্কে সংশয়, সেখানে আমাকে নিয়ে জীবনভরা ভণ্ডামির অনুষ্ঠান ক'রে লোকের কাছে তুমি হয়ত ভক্তভাই ব'লে পূজা পেতে পার, কিন্তু তোমার অন্তরের ভাণ্ডার হবে তাতে দিনের পর দিন কেবলই রিক্ত। নিজের জীবনের প্রত্যক্ষ দিয়ে এ সব আমি অনুভব করেছি, তাই তোমাদের গুরু সেজে আবার তোমাদের কারো পরম কুশলের ব্যাঘাত না ক'রে বসি,

তারই জন্য বারংবার তারস্বরে ঘোষণা কচ্ছি, যখনি আমাতে কণা মাত্র অবিশ্বাস আসবে, তখনই আমাকে বর্জ্জন ক'রো। তোমাদের জোর ক'রে ধরে রেখে আমার আনন্দ নেই, অন্তরে আর বাহিরে, অন্দরে আর বৈঠকখানায়, গৃহকোণে আর খোলা ময়দানে, নির্জনে আর জনকোলাহলে, যেখানেই আমাকে পাও, যেদিন দেখবে, প্রতিস্থানেই আমাকে স্বীকার করার মধ্যে তোমার অবারিত আনন্দ, সঙ্কোচ কণামাত্রও নেই, সেখানেই তুমি জানবে আমি তোমার গুরু, সেখানেই আমি বুঝব, তুমি আমার শিষ্য। শিষ্য তুমি হ'তে চাও না, অথচ তোমার ডর-ভয়-দুর্ব্বলতা প্রভৃতি মনোধর্ম্মের সুযোগ নিয়ে নিজেকে তোমার গুরু ব'লে জাহির ক'রে যাব, আর তোমার ঘাড় আমার পায়ের তলায় জোর ক'রে চেপে ধর্‌ব, একে আমি অমার্জ্জনীয় অপরাধ ব'লে মনে করি।

অবতারের দেশ

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—দেখ্‌রে এটা অবতারবাদের দেশ। অবতার-বাদ আর গুরু-বাদ পরস্পর পরস্পরের হাত-ধরা-ধরি ক'রে চলেছে। একটা মানলেই অপরটা প্রায় ক্ষেত্রেই এসে যায়। যদি অন্য অবতার তোমার মানতে ইচ্ছা নাও হয়, তবু তুমি তোমার গুরুদেবকে অবতার ব'লে অনায়াসে পূজা সুরু ক'রে দিতে পার। তাতে প্রথম কয়েকদিন লোকমতের বাধা দেখা গেলেও তোমার দল পুরু হবার সাথে সাথে সে বাধাও দূর হ'য়ে যায়। তখন তুমি তোমার গুরুদেবকে

অবতার ব'লে সকলের দ্বারা পরিপূজিত করাবারই জন্য আস্তে আস্তে অন্যান্য লোকপ্রচলিত অবতারদের কিছু কিছু প্রশংসা বা পূজা সুরু কর। এই ভাবে এই দেশে সকল মহাপুরুষেরই অবতার ব'লে পূজিত হবার চমৎকার সুযোগ রয়েছে, যা অন্য দেশে নেই। এ কথা বল্‌লে খুব ভুল হয় না যে, সারা পৃথিবী এক যীশু খ্রীষ্ট ছাড়া অন্য কাউকে অবতার ব'লে দাঁড় করাবার সুযোগই পেল না, কিন্তু এই ভারতে পুরাণে দশাবতারের কথা বর্ণিত হয়েছে, কোনো কোনো শাস্ত্রে আরও অনেক অবতারের কথা দেখা যায়, আর আধুনিক যুগে অনেকানেক মহাপুরুষ অবতার ব'লে পূজা পেয়েছেন ও পাচ্ছেন। অধিকাংশ অবতারই বিষ্ণুর অবতার, কেউ কেউ বা শিবের অবতার। এর পরে কেউ কেউ আবার শ্রীগৌরাঙ্গের অবতার বা শ্রীরামকৃষ্ণের অবতার রূপেও আত্মপ্রকাশ করেছেন বা কচ্ছেন। এর ভিতরে এই দেশ কোনো অসঙ্গতি বা অসামঞ্জস্য দেখতে পায় নি।

প্রতি জনে অবতার হও

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিয়া চলিলেন,—এই যে এ দেশের লোক এর ভিতরে কোনও অসঙ্গতি বা অসামঞ্জস্য দেখতে পেল না, তার আসল কারণটা ভেবে দেখেছ ? পাগলের মাথায় যেমন এক এক সময়ে এক একটা ঝোঁক চাপে, আমাদের দেশের জনসাধারণের এক একটা বিরাট বিরাট অংশে যে এক এক সময়ে তেমন এক জনকে অবতার বলে স্বীকার করার, প্রচার করার, পূজিত করানর ঝোঁক চাপে, তার পশ্চাতে আমাদের

দেশেরই এক বিরাট ঐতিহ্য রয়েছে, তা' হচ্ছে এই যে, এ দেশের মানুষই প্রথমে অনুভব করেছিলেন যে, প্রতি জীবই ব্রহ্মস্বরূপ, জীবে শিবে ভেদ নেই। স্রষ্টা ও সৃষ্টির অভেদজ্ঞানই এ ভাবে প্রকারান্তরে অবতারবাদকে এমনভাবে প্রশ্রয় দিয়েছে, এমন ভাবে বহুপল্লবিত ক'রে তুলেছে। তাই আমি বলি, তোমরা প্রতি জনে নিজ নিজ অবতারত্বকে প্রাণে প্রাণে অনুভব কত্তে সমর্থ হও। আমাকে গুরু মেনে তোমরা আমাকে আর কি তৃপ্তি দেবে, তোমরা প্রতি জনে এক এক জন বিশ্বগুরু হ'য়ে আমাকে তৃপ্ত কর।

দিব্য সঙ্ঘ

ইহার কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ শ্রীশ্রীবাবামণি একেবারে নিঃশব্দ হইলেন। তার পরে চলিতে চলিতে আবার বলা সুরু করিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যে কোনও মহাভাবকেই সকলের মধ্যে অতি দ্রুত পরিবেশন করার জন্য সঙ্ঘের প্রয়োজন। আমি সেই দিকে তাকিয়েই তোমাদের অনেক সময়ে সঙ্ঘবদ্ধ করার কথাও ভাবি। কিন্তু কৃত্রিম প্রয়াসের মধ্য দিয়ে সেই সঙ্ঘ গ'ড়ে উঠবে না, যেই দিব্য সঙ্ঘকে আমি দেখ্‌ছি স্বপ্নে।

সঙ্ঘ-গঠনের ঝড়্‌তি-পড়্‌তি

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কোনও ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার তাড়নায় নয়, কিম্বা নিজ সঙ্ঘের ভিতরে পরিপুষ্টি-বৃদ্ধির প্রচারশীলতাজাত কৃত্রিম তাগিদেও নয়, দেশ ও জগতের ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের স্বাভাবিক দাবীতে তোমাদের সম্মুখে

বিরাট, ব্যাপক, সুবিস্তারিত সঙ্ঘ-গঠনের দায়িত্ব একদিন এসে পড়বে। সেই দিন যদি তোমরা দেখ্‌তে পাও যে, কিছুকাল তোমাদেরই সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত থেকে তারপরে অন্তরের বৃহত্তর আকর্ষণে অন্যত্র চ'লে গিয়ে কেউ তার মনের মতন বড়টী হ'য়ে উঠেছে, তখন তোমরা তাকে নিজেদেরই একজন শিষ্য ব'লে দাবী ক'রে নিজেদিগকে জগতের কাছে উপহসিত ক'রো না। প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী যেখানকার শিষ্য নন, সেখান থেকেও একটা সুকৌশল প্রচার আমরা লক্ষ্য ক'রে যেন আসছি যে, তিনি সেখানকারই শিষ্য। এটা একটা কুদৃষ্টান্ত। এতে ক'রে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সম্মান এক কণাও কমে নি, কিন্তু যাঁরা তাঁকে নিজেদেরই শিষ্য ব'লে প্রচার কত্তে প্ররোচিত হচ্ছেন ব'লে মনে হচ্ছে, তাঁদেরও এতে সম্মান এক কণা বাড়ে নি। সুচতুর প্রচারণার মুখে দু-চার জন সাধারণ লোকে এসবে বিশ্বাস স্থাপন কর্লেও এসব প্রচারণার ফল অতি স্বল্পকালস্থায়ী। জগতের মহাপুরুষেরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ মহিমাতেই চির-উজ্জ্বল হ'য়ে থাক্‌বেন। কোন্ নামজাদা ব্যক্তি কোন্ মহাপুরুষের নিকটে দুদিন চারদিন শিষ্যের মত বিনীত মন নিয়ে অনুগত হ'য়ে ছিলেন, সেই কথাটা মহতের মহত্ত্ব-বৃদ্ধির পক্ষে একেবারেই অবান্তর। আমি সহস্রবার তোমাদের বল্‌ছি, দল বাড়াবার জন্য চেষ্টা করা তোমাদের নিষ্প্রয়োজন। কেন না, সত্যের আকর্ষণে দল তোমাদের আপনি বাড়বে। কিন্তু তার অতিরিক্ত একথাও বল্‌ছি যে, দল স্বাভাবিক গতিতে বাড়বার মুখে যে উচ্ছ্বাস আপনা আপনি সৃষ্ট হবে, তাতে তোমরা কোনও অন্যায়, অসৎ

বা অৰ্দ্ধ-সত্য বাক্য, চিন্তা বা ব্যবহারকে আস্‌তে দিও না। সঙ্ঘ-গঠনের পথে উঠ্‌তি, বাড়্‌তি, ঝড়্‌তি, পড়্‌তি প্রভৃতি কত রকমের অনুগত জনগণের সঙ্গে তোমাদের দেখা হবে,—কেউ এসে পড়েছে ব'লেই উল্লসিত হ'য়ো না, কেউ তোমাদের সঙ্ঘ পরিত্যাগ ক'রে দূরে স'রে গেছে ব'লেই বিষাদে এলিয়ে প'ড়ো না, কেউ এল না ব'লে মনঃক্ষুব্ধ হ'য়ো না, কেউ চ'লে গেল ব'লে বিমর্ষ হ'য়ো না বা তার শক্তি, বুদ্ধি, সামর্থ্য, যোগ্যতা এবং পৌরুষের দিকে লোভের দৃষ্টিতে তাকিও না। যারা আস্‌বে না, আর যারা চ'লে গেল, তাদের জন্য শোক না ক'রেই তোমাকে বিপুল বিক্রমে সংগঠন কার্য্য চালিয়ে যেতে হবে। গুরু নানক থেকে গুরু গোবিন্দ পর্য্যন্ত একই নীতিতে অবিচ্ছেদ-ধারায় কাজ চলেছিল বলেই শিখপন্থ একটী বীর্য্যবান্‌ জাতির পন্থ, এই কথাটী খুব ভাল ক'রে মনে রেখো।

আবার আসিবে তারা

কথা বলিতে বলিতে শ্রীশ্রীবাবামণি শিবপুর-প্রান্তে মুসলমানদের সমাধিস্থলে আসিয়া পড়িয়াছেন। একটী বটবৃক্ষতলে একটী অতি বৃহৎ সাপের ছোলম পড়িয়া আছে। তাহারই পাশে তৃণের উপরে বসিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি সদ্যোরচিত গান ধরিলেন—

মাটিতে যাহারা পচিল ভাই,
শ্মশানে যাহারা হইল ছাই,
আবার আসিবে তারা,

আমার নয়নে নয়ন মিলায়ে
ফেলিবে অশ্রুধারা।
আবার আসিবে তারা।
দূরে অতি দূরে গেল চ'লে,
কিছু ব'লে, কিছু নাহি ব'লে,
সবাই আবার ফিরিয়া আসিবে,
প্রেমে হ'য়ে মাতোয়ারা ;
মোহন মিলন-মূরলী বাজিয়ে
মুক্ত, বাঁধন-হারা,
আবার আসিবে তারা।
গেছে চলে, তবু কাঁদি না ভাই;
গেছে চলে, তবু যাওয়া যে নাই;
গেছে চলে ফিরে আসিবে বলিয়া,
অন্তরে জাগে সাড়া ;
সবারে হারায়ে বুঝেছি চরম,
কেহ নহে মোরে ছাড়া।
আবার আসিবে তারা।
আবার আসিবে হাসিতে হাসিতে,
সোহাগ-সলিলে ভাসিতে ভাসিতে,
মিলন-মালায় গাঁথি বনফুল,
গাঁথি' আকাশের তারা;
আবার আসিবে তারা।

শিবপুর

৭ই চৈত্র, ১৩৪০

শ্রীশ্রীবাবামণি আপরাহ্নিক ভ্রমণ-ব্যপদেশে বাঘাউড়া গ্রামে শ্রীযুক্ত আশুতোষ চক্রবর্ত্তীর গৃহে আসিয়াছেন।

গুপ্ত দানের মর্য্যাদা

শ্রীশ্রীবাবামণি আশু বাবুকে জানাইলেন যে, শিবপুরের শ্রীযুক্ত গৌরীভূষণ রায় চৌধুরী মহাশয় সম্প্রতি যে-কোনও কার্য্যে ব্যয়ের জন্য শ্রীশ্রীবাবামণির চরণে গোপনে পাঁচশত টাকা অর্পণ করিয়াছেন।

একজন ভদ্রলোক বলিলেন,—গৌরীবাবুর ত' দানশীলতার জন্য কোনও খ্যাতি আছে বলে আমরা জানি না!

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—খ্যাতিমান্ ব্যক্তির দান অনেক সময়ে লোকলজ্জার খাতিরেই অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু দান-বিষয়ে যাঁর কোনো লোকখ্যাতি নেই, তাঁর দান যে কত বিশুদ্ধ, কত সুন্দর, তা' তুলনা দিয়ে বলা চলে না। আপনারা যাঁদের বাহ্যদৃষ্টিতে কৃপণ ব'লে জ্ঞান করেন, তাঁদের অনেকেই নামকরা দানবীরদের চেয়ে দানের শুদ্ধতার দিক দিয়ে মহত্তর। লোকে জানে না, এমন যে দান, তার মর্য্যাদা অনেক বেশী।

তবু দুঃখ নাই

মূলগ্রাম হইতে দুই তিনটী যুবক শ্রীশ্রীবাবামণির চরণ দর্শনার্থে শিবপুর আসিয়াছেন, কিন্তু শ্রীশ্রীবাবামণি বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন শুনিয়া তাঁহারা তাঁহার খোঁজে মাঠে বাহির হইলেন।

মাঠের চাষীদের কাছে খবর পাওয়া গেল যে, শ্রীশ্রীবাবামণি বাঘাউড়ার দিকে গিয়াছেন। তখন তাঁহারা বাঘাউড়া রওনা হইলেন।

তাহাদের পাইতেই শ্রীশ্রীবাবামণি উল্লসিত হইয়া বলিলেন, —এসেছ অনেক কষ্ট ক'রে কিন্তু তার চেয়ে বেশী ভাবনা হ'ল যে, রাত এসে যাচ্ছে, ফিরে যাবে কেমন ক'রে ?

যুবকদের একজন বলিলেন,—দেখা যে পেয়েছি, একেই মহাভাগ্য ব'লে মনে করি। আর ফিরে যেতে চাই না।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—চমৎকার কথা বলেছ। এই ভারতের সহস্র সহস্র সাধকেরা বলেছেন,—"আর যেন ফিরে না আসি এই দুখের দেশে।" জন্ম দুঃখময়, মৃত্যু দুঃখময়, জীবন-যাত্রা দুঃখময়। তাই এই দেশ থেকে একবার পাড়ি দিয়ে সে দেশে পৌছুতে পারলে আর ফিরে আসবার ইচ্ছাটি কেউ করেন না। কিন্তু বাছা, যুগে যুগে মানবমনের অনুভূতি-ভঙ্গীর পরিবর্ত্তন হয়। আমার মনোভঙ্গী হচ্ছে এই।

এই বলিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি স্বরচিত একটী গান ধরিলেন—

এসেছি এই দুখের দেশে,
সইব দুঃখ হেসে হেসে,
তবু আমার প্রাণ-প্রভুরে
দেখতে পাওয়া চাই,

আস্‌ব যাব বারংবার,
হয় যদি তাই ইচ্ছা তাঁর ;

তাঁরে যদি আমার প্রাণের
মধ্যখানে পাই।
জন্ম মৃত্যু দুঃখময়,—
তবু দুঃখ নাই।।

যাঁর নয়নের ইঙ্গিতে
যাঁর মননের ভঙ্গীতে
সঙ্গীতেরই মতন হয়ে
ফুটল চারি ঠাঁই
বিশ্ব ভাষায় বিশ্ব মধু,—
আনন্দে কুড়াই।
তাঁর চরণে নয়ন রেখে
এই আসি এই যাই।
জন্ম মৃত্যু দুঃখময়,—
তবু দুঃখ নাই।।
আস্‌ব যত, যাবও তত,
তন্তুবায়ের মাকুর মত ;
আমার যাওয়া-আসার মাঝে
তাঁহার মহিমাই
জ্বল্‌জ্বলন্ত দীপক রাগে
দিনরজনী গাই।
যাওয়া-আসার নিত্য আমি
তাঁর পানেই ধাই।

জন্ম মৃত্যু দুঃখময়,—
তবু দুঃখ নাই।

যুবকেরা সেই রাত্রিতে শিবপুরেই রহিয়া গেলেন। গৌরীবাবুর অতিথিপরায়ণা সহধর্ম্মিণী এবং জ্যেষ্ঠপুত্র ফণীবাবু তাঁহাদের খুবই আদর আপ্যায়ন করিলেন।

শিবপুর, কুমিল্লা
৯ই চৈত্র, ১৩৪০

মানুষের প্রতি ব্যবহার

অপরাহ্নে চারিদিকের বিভিন্ন গ্রাম সমূহ হইতে কয়েকটী যুবক আসিয়াছেন। এক জন প্রশ্ন করিলেন,—সাধুদের প্রতি আমাদের মনোভাব ও ব্যবহার কি হওয়া উচিত ?

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—প্রশ্নটা যে অসম্পূর্ণ হল বাবা। প্রশ্ন কর যে, মানুষ মাত্রের প্রতি আমাদের মনোভাব ও ব্যবহার কিরূপ হওয়া উচিত ? সাধুরাও মানুষ।

প্রশ্নকর্ত্তা বলিলেন,—বেশ, তাই জিজ্ঞাসা কচ্ছি।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমাদের মনোভাব হওয়া উচিত এই যে, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের বিধাতা, তোমার আমার সকলের পরমপ্রভু সকলের প্রাণের যিনি প্রাণ, মানুষরূপী একটী গবাক্ষের মধ্য দিয়ে তিনি তোমার প্রতি তাঁর করুণার নয়ন নিক্ষেপ কচ্ছেন। এই মানুষটীকে, হোক্ সে বড় কিম্বা ছোট, পরমেশ্বরের বাস-মন্দিরের গবাক্ষ জেনে অতিশয় সমাদর করা আমার তোমার সকলের কর্ত্তব্য। তিনি যদি সাধক হন, মহাপুরুষ হন, তবে

বুঝতে হবে যে, গবাক্ষটী আকারে বৃহৎ, তাই কে জানে, হয়ত আমার বা তোমার স্থূল চক্ষু দিয়েও এর ভিতর দিয়ে ভগবান্‌কে দেখতে পাওয়া যেতে পারে। তাই সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে তাঁকে সম্মান কর্ব্বে, মান দেবে। ভুলেও অসম্মান কর্ব্বে না।

অন্তরের আনুগত্যকে এক স্থানে রাখ

প্রশ্নকর্তা বলিলেন,—আপনি আমার গুরু, আর সেই মানুষ যদি আপনার প্রতি অন্যায় আচরণ ক'রে ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমার প্রতি কেউ অন্যায় বা অবিচার করেছে বলে তোমরা আবার তার সাথে ঝগড়া বাধাবে কেন ? ভগবানের মন্দিরের গবাক্ষে যদি মাকড়শায় জাল বুনে থাকে, তাহ'লে তুমি তাতে ঢিল ছুঁড়তে যাবে কেন ? সেই ঢিল নির্জীব গবাক্ষকে স্পর্শমাত্রও না ক'রে যদি ভগবানেরই গায়ে গিয়ে পড়ে ? মানুষকে মানুষের মর্য্যাদা দেবে, সাধককে সাধকের মর্য্যাদা দেবে, সাধ্বী পত্নী যেমন কেবল নিজ পতি ব্যতীত অন্য পুরুষের নিকটে আনুগত্য স্বীকার করে না, তেমন নিজের অন্তরের আনুগত্যকে এক স্থানেই বেঁধে রাখবে। হাওড়া স্টেশনে একই জানালাতে পুরীর আর এলাহাবাদের টিকিট পাওয়া যায় না। যার যার টিকিটের জানালায় গিয়ে নিজ নিজ পারের কড়ি দেবে, প্রতি জানালায় নয়।

সাধুসঙ্গ কখন পরিত্যাজ্য

প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসিলেন,—যদি এই মানুষের সঙ্গে আমাকে কৌশলে আমার গৃহীত মত, পথ ও নীতি থেকে ভ্রষ্ট করার

Collected by Mukherjee T.K.,Dhanbad

ব্যবস্থা করে ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দূরে সরে যাও। কাছে দাঁড়াবার দরকার নেই। গাজিপুরে যারা বেলাফুল থেকে তিলের বীজের সাহায্যে সুগন্ধি নির্য্যাস বের করে, তারা বেলা ফুলের নির্য্যাস তৈরীর ঘরে চামেলীফুল বা মালতীফুলকে ঢুকতে দেয় না। কেননা, তাতে নির্য্যাসের খিচুড়ি হ'য়ে যাবে।

প্রশ্নকর্ত্তা বলিলেন,—সাধু মহাপুরুষেরা এরূপ কর্ব্বেন কেন ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন—তোমার গুরুভক্তি পরীক্ষার জন্য, তোমার ইষ্টনিষ্ঠা যাচাই করার জন্য। তাঁরা ইচ্ছা ক'রেই এ রকম করেন তা নয়, ভগবান তাঁদের দিয়ে করিয়ে নেন।

শিবপুর

১১ই চৈত্র, ১৩৪০

বিষয়-বিষের জালা

নবীনগর হইতে একজন ভক্তলোক শ্রীশ্রীবাবামণির পদপদ্ম দর্শনে আসিয়াছেন। তিনি বিষয়লিপ্সার বিষয়ে প্রসঙ্গ তুলিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —শাস্ত্রকার বল্‌ছেন, —"কো মূঢ়ো বিষমশ্নাতি বিষয়ম্ বিশয়াভিধম্"—কে সেই মূর্খ যে বিষয় নামক বিষম বিষকে পান করে ? বাস্তবিক বিষয়-বিষের জ্বালা কালকূটের চেয়েও বেশী। বিষ খেলে একবার মাত্র মৃত্যুজ্বালা ভোগ হয়, মৃত্যু তাতে বারংবার হয় না। কিন্তু বিষয়ের তৃষ্ণা একবার এলে দুঃখং জন্মনি জন্মনি, একজন্মে তার জ্বালা যায়

না, বহুবার যোনি ভ্রমণ ক'রে ক'রেও সেই জ্বালার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া শক্ত।

সম্পূর্ণ বিষয়-বর্জ্জন কি সম্ভব

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু পার্থিব জগতে একেবারে বিষয় নিরপেক্ষ হয়ে বাস করা অসম্ভব। বৈষ্ণব বাবাজী মালা-জপ কর্ব্বেন, তাও তার এক ছড়া তুলসীর মালা ক্রয়ের জন্য অর্থ চাই। বৈদিক আচার্য্য যাগ-যজ্ঞ কর্ব্বেন, তাও তাঁর হব্য-কব্য বিনা পয়সায় আসবে না। কুম্ভ মেলায় স্বামীজীরা ধর্ম্মকথা শুনাবেন, তাও একেবারে অর্থ ছাড়া হবার উপায় নেই। যিনি মালা জপেন না, যাগযজ্ঞ নিরর্থক মনে করেন, অন্তর্যাগে যাঁর সাধন, যিনি মুখফুটে ধর্ম্ম-কথা উপদেশ করেন না, মর্ম্মের বাণী চিন্তার ভিতর দিয়ে দিকে দিকে বিকিরণ করেন, তিনিও নিজ দেহ-যাত্রা নির্ব্বাহার্থে দিনান্তে একমুষ্টি নীবার-কণার জন্য বিষয়ের অপেক্ষা রাখ্‌তে বাধ্য। জগতের সকল লোক মহাপুরুষ হোক্, এটাই যদি আমাদের কাম্য হয়, তাহলে মহাপুরুষদের জীবন যাত্রার ভার সমাজ এসে গ্রহণ করুক, এ দাবী করা চলে না। মহাপুরুষদের দেহ-যাত্রা-নির্ব্বাহের ভার তাঁদের নিজেদের উপরই থাকা উচিত। প্রকৃত মহাপুরুষরাও যদি নিজ নিজ দেহ-যাত্রা-নির্ব্বাহের ভার অপরের উপরে না দিয়ে সর্ব্ব সময়ে নিজেদের উপর রাখেন,.তাহলে অ-মহাপুরুষ মহাপুরুষম্মন্যেরা আর সমাজের স্কন্ধে চেপে জলৌকাবৃত্তি করার অবকাশ পাবে না। এই জন্যও মহাপুরুষদের এই বিষয়ে স্বাবলম্বন রক্ষা করা

সমাজ-হিতার্থে কর্ত্তব্য। তাই, একেবারে বিষয় বর্জ্জন করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

কোন্ অর্থ বিষময়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই ক্ষেত্রে করণীয় কি ? কবিরাজ যেমন ঔষধ তৈরীর জন্য বিষকে শোধন ক'রে নেন, কোনটাকে শোধন করেন পানের রস দিয়ে, কোনটাকে শোধন করেন ঘৃতে ভেজে, কোনটাকে শোধন করেন গোমূত্রে ভিজিয়ে, ঠিক্ তেমনি বিষয়-সমূহকেও ভগবৎ প্রয়োজনে গ্রহণের ভিতর দিয়ে তার বিষ নাশ ক'রে নিতে হবে। সাপুড়ে যেমন সাপের বিষ-দাঁত ভগ্ন ক'রে নির্ভয়ে তার সাথে খেলা করে, জীবন-নাশের বা অন্য অনিষ্টের কোনো আশঙ্কাই থাকে না, ঠিক্ তেমনি বিষয়কে একমাত্র ভগবৎ প্রয়োজনে ব্যবহারের দৃঢ় অঙ্গীকারে তার বিষ-দাঁত ভেঙ্গে ফেল্‌তে হবে। যে বিষয় ভগবৎ-সেবার সৌকর্য্যার্থে, তাকে বিষহীন ব'লে জ্ঞান করা চলে। যে অর্থ নিজের ইন্দ্রিয়সুখের বর্দ্ধনের জন্য, নিজ যশ, নিজ প্রতিপত্তি, নিজ প্রভুত্ব ও নিজ কর্তৃত্ব প্রসারের জন্য, সেই অর্থই বিষম বিষ-স্বরূপ।

শিবপুর (কুমিল্লা)
১২ই চৈত্র, ১৩৪০

গঙ্গাসাগর অঞ্চল হইতে দুই তিনটী অল্প-বয়স্ক বালক আসিয়াছে। তাহারা শিবপুরের ফকীর আপ্তাবুদ্দিনের সাক্ষাৎ-মানসে আসিয়াছিল, সেখানে শুনিয়াছে যে, শ্রীশ্রীবাবামণিও এই সময়ে এই গ্রামেই আছেন। তাই তাহারা শ্রীশ্রীবাবামণির

নিকটেও কয়েকটী সৎকথা শ্রবণের অভিলাষ জ্ঞাপন করিল।

পিতৃদেবো ভব

শ্রীশ্রীবাবামণি স্নেহভরে ছেলেদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া কে কি ভাবে আসিয়াছে, পথে কত ক্লেশ কার হইয়াছে, বিস্তারিত জানিবার পরে বলিলেন,—গৃহে ফিরে যাও, পিতামাতাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর-ঈশ্বরী জ্ঞানে তাঁদের কায়মনোবাক্যে সেবা কর, পিতৃ-মাতৃ সেবার সাথে সাথে সত্যবাক্য, ইন্দ্রিয়-সংযম, মিতাচার-ব্রত পালন কর। তোমাদের জীবনের সকল কুশল এর ভিতর দিয়েই বিকশিত হবে। সৎকথা শোনার তোমাদের এতই আগ্রহ যে, ফকীর সাহেবের কাছে তোমরা অত দূর থেকে এই প্রখর গ্রীষ্মে পায়ে হেঁটে এসেছ। কিন্তু বাছা, সৎকথা শুনে যদি তা' পালন না কর, তবে এ সব ফকীর-দরবেশদের এত শ্রম সব ত' একেবারে ব্যর্থ হবে। যাদের পিতৃ-মাতৃ-সেবা অকৃত্রিম, মহাপুরুষদের বাণীর মর্য্যাদা তারাই সহজে রাখ্‌তে পারে। শাস্ত্র বল্‌ছেন, পিতৃদেবো ভব, অর্থাৎ পিতাকে দেবতা জ্ঞান ক'রে তাঁর পরিচর্য্যা কর।

শিবপুর (কুমিল্লা)
১৩ই চৈত্র, ১৩৪০

অখণ্ড-দীক্ষিতের কৌলিক পরিচয়

অখণ্ড-দীক্ষিত সাধকের কৌলিক উপাধি সম্পর্কে কথা উঠিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দীক্ষাকে যদি মান নবজন্ম, তাহ'লে দীক্ষার পরে আর দীক্ষার পূর্ব্বের জন্মের কৌলিক পরিচয় প্রদানের

কোনও অর্থ থাকে না। আর কৌলিক পরিচয় যদিও দাও, তবু সমদীক্ষিত অপর সকলের সাথে যে তোমার সামাজিক ভেদ কিছু আছে, একথা মানা সঙ্গত হবে না। তবে জোর ক'রে কোনো বিধান কারো উপরে চাপাবার প্রয়োজন দেখি না। সময় এলে তোমাদের মনে সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে এই প্রশ্নের একটা স্থায়ী মীমাংসার অনুপ্রেরণা আস্‌বে। যা কর্‌বার, তখন ক'রে নিও।

অখণ্ড-দীক্ষিতের পারস্পরিক বৈবাহিক আদান প্রদান

অখণ্ড-দীক্ষিতগণের পারস্পরিক বৈবাহিক আদান-প্রদানের প্রসঙ্গও উঠিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অখণ্ড-দীক্ষিত হ'য়ে যাঁরা সংসারী জীবন যাপন কর্ব্বেন, তাঁদের সন্তান-সন্ততির বিবাহের ব্যাপারে প্রচলিত সামাজিক গণ্ডীবেদ কতটা থাকবে বা না থাকবে, এটাও নিশ্চয়ই একটা বিবেচ্য বিষয় হ'য়ে দাঁড়াবে। অখণ্ড কি একমাত্র অখণ্ডের নিকট কন্যাদান কর্‌বে, না বাহিরের লোককে নিজ কন্যার পাণি-পীড়নের সুযোগ দেবে ? অখণ্ড কি নিজ পুত্রের জন্য অপর অখণ্ডের কন্যাকেই বধূ ক'রে ঘরে বরণ ক'রে তুলে নিয়ে আসবে, না তার গৃহে বাহিরের লোকের কন্যারাও বধূরূপে আস্‌বে ? যে অখণ্ডের পূর্ব্বপুরুষ কুলীন ব্রাহ্মণ, তার পুত্রের সাথে যে অখণ্ডের পূর্ব্বপুরুষ সুবর্ণ-বণিক, তার কন্যার বিবাহ অপ্রশস্য ব'লে বর্জ্জিত হবে, না আচরণীয় ব'লে গৃহীত হবে ? এসব প্রশ্নের মীমাংসার প্রয়োজন অদূর ভবিষ্যতে তোমাদের

হবে। কিন্তু ধনৈশ্বর্য্যে, দৈহিক শৌর্য্যে, নৈতিক চরিত্রে এবং সর্ব্বোপরি আধ্যাত্মিকতার সম্পদে যতক্ষণ না তোমরা এক অপরাজেয় মহাশক্তি রূপে আত্মপ্রকাশ কত্তে পাচ্ছ, ততক্ষণ চলতি সমাজের সমাজপতিদের ভ্রূকুটি ও শাসন উপেক্ষা ক'রে বিবেকের অনুশাসনকে মান্য ক'রে তোমরা চল্‌তে পারবে ব'লে ধারণা করা তোমাদের সঙ্গত হবে না। জীবিকার জন্য যে-সমাজ পরমুখাপেক্ষী, শারীরিক শক্তি-সামর্থ্যের অভাবে যে-সমাজ অপরের উৎপীড়ন নীরবে সহ্য কত্তে বাধ্য হয়, নৈতিক মেরুদণ্ড যার দুর্ব্বল ও বক্র এবং ধর্ম্মবলে যে-সমাজ বহু-বলীয়ান্ নয়, বিবেকের অনুশাসনকে মান্য ক'রে চলার ক্ষমতা তাদের কখনো হয় না।

বিবাহের বিধি

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও বলিলেন, —একমাত্র সমবেত উপাসনা দিয়েই তোমাদের বিবাহ, অন্নপ্রান, শ্রাদ্ধ, উপনয়ন, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীকে নিজ ধর্ম্মে শুদ্ধি—এ সব কাজ হ'তে পার্ব্বে। সময় এলেই হ'ল।

শিবপুর, কুমিল্লা
১৪ই চৈত্র, ১৩৪০

ওঁকারায় নমোনমঃ

সমবেত উপাসনার কথা হইতেছিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —আমি যে তোমাদের ধর্ম্মোপদেশ দেই, তার পশ্চাতে আমার আমি নেই। আমার আমিকে আমি

অনেক দিন আগেই পরমঙ্গলময় অখণ্ড-নামের কাছে বলি দিয়েছি। আমার নিজের মুক্তির প্রয়োজন-পানে-তাকিয়ে নয়, তোমার বা অপর একজন সন্তানের ব্যক্তিগত মুক্তির পানে তাকিয়েও নয়, নিখিল বিশ্বের সর্ব্বাঙ্গীণ মুক্তির পানে তাকিয়ে আমি আমাকে অখণ্ডনামের পায়ে বিসর্জ্জন দিয়েছি।

ওমেকং পরমং ব্রহ্ম,
ওমেকং শরণং মম,
সর্ব্বেষাং মিলনং, তস্মৈ
ওঙ্কারায় নমোনমঃ।

ওঙ্কারই পরব্রহ্ম, ওঙ্কারই আমার পরম শরণ, ওঙ্কারই সকল কিছুর মিলনভূমি, সেই ওঙ্কারকে বারংবার করি প্রণাম।

মন্দির, কুলগুরু ও দীক্ষামন্ত্রের দান

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিয়া চলিলেন,----মন্দিরগুলি হিন্দুর ধর্ম্মবোধকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এক একটা মন্দিরকে আশ্রয় ক'রে এক একটা মত, এক একটা পথ যেন ঝড়ের মুখে মাথা গুজে বেঁচে রয়েছে। তাই শত শত খণ্ড দেবতার পূজা ক'রেও এরা আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন। ভক্তেরা এক একটা মন্দিরকে আশ্রয় ক'রে যদি না অর্চ্চনা কত্তেন, তাহলে পরধর্ম্মীদের দুর্ম্মদ আক্রমণের মুখে হিন্দুধর্ম্ম ব'লে কোনও একটা জিনিষের অস্তিত্বই থাক্‌ত না। তাই খণ্ড দেবতার উপাসকদের আমি শত্রুবোধে বিদ্বেষ করি না। এই খণ্ড প্রতিমার উপাসক ও উপাসিকারা ভুল বা ত্রুটি যাই ক'রে থাকুন, একটা নিমিষেও এই যুক্তিকে

অস্বীকার করেন নি যে, ইটই পরমদেবতা নন, কাঠই পরমদেবতা নন, রং রাংতা আর যাই দিয়েই বিগ্রহ গ'ড়ে থাকুন না কেন, যতক্ষণ না প্রাণপ্রতিষ্ঠা হচ্ছে, ততক্ষণ বিগ্রহ জড় পদার্থই। এই যে জড়ের অতীতে একটা নিবদ্ধ দৃষ্টি, তাই তাঁদের বিগ্রহ ভগ্ন হবার পরেও ধর্ম্মবোধকে বাঁচিয়ে রেখেছে। ভারতের বাইরে অন্য দেশে যাও, দেখ্‌বে নিরাকার উপাসকদের আগমণের সঙ্গে সঙ্গে দেখতে না দেখতে তাদের প্রাচীন কালের পূজা, অর্চ্চনা, দর্শন-শাস্ত্র, দেবতা সব বাতাসে মিলিয়ে গেছে। ভারতে তা' যায় নি। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, এই বোধ থেকে ভারতের ধর্ম্মের উৎপত্তি, উপলব্ধি থেকে তার সৃষ্টি, কোনও ব্যক্তি-বিশেষের উপলব্ধিই বিশ্বজনের মনের উপরে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা সেখানে নেই,—এই সত্যকে যে কেউ নিজে সাধন ক'রে উপলব্ধি কত্তে পারো, এই তার দৃপ্ত ঘোষণা। তাই, এই উপলব্ধিকে অস্বীকার না ক'রে মানুষ যেখানে খণ্ড ভাবে প্রতীকোপাসনায় প্রমত্ত হয়েছে, সেখানে অসির ঝনৎকারে বা সামরিক প্রতাপে তাকে নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব হয় নি। এক একটা দীক্ষামন্ত্র আশ্রয় ক'রে এক এক জন খণ্ড দেবতা মানুষের মনে স্থায়ী আসন গেড়েছেন, তাঁকে কোনও প্রকারেই কেউ স্থানচ্যুত কত্তে সফল হয় নি। একটু ভাবলেই অবাক্ হবে যে, কি অদ্ভুত ভাবে মন্দির, কুলগুরু, দীক্ষা-মন্ত্র এঁরা সবাই মিলে হিন্দু জাতিটাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

ধ্বংসোন্মুখ হিন্দুজাতি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তাঁরা কিন্তু বাঁচার মতন ক'রে বাঁচিয়ে রাখতে পারেন নি। কোনও প্রকারে ঝড়ের মুখে বালুতে মাথা গুঁজে যেমন ক'রে মরুভূমিতে উটগুলি বাঁচে, ঝড় না থামা পর্য্যন্ত মাথা আর বালুকার তল থেকে তোলে না, ঠিক তেমনি ক'রে, কবে ঝড় আপনা-আপনি থেমে যাবে, তার প্রতীক্ষায় নিতান্তই অদৃষ্টবাদ আশ্রয় ক'রে পড়ে থাকার দ্বারা যে বাঁচা, তাকে ঠিক ঠিক বাঁচা বলে না। অতএব হিন্দু জাতি ঠিক ঠিক বাঁচার মতন ক'রে বাঁচতে পেরেছেন, একথা স্বীকার করা সম্ভব নয়। তাঁর দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞানের উচ্চতা পৃথিবীর নানা দেশে সমাদৃত হয়েছে, এটাই তাঁর বাঁচবার প্রমাণ নয়। বাঁচার প্রমাণ নূতন সৃষ্টিতে। যে হিন্দু জাতি শত শত অনার্য্য জাতিকে শিক্ষা দিয়ে, কৃষ্টির প্রভাবে, সভ্যতার মহিমায় আর্য্য ক'রে, নিজেদের সমকক্ষ ক'রে তুলেছিলেন, তাঁদেরই বংশধর আমরা ঘরের ছেলে মেয়েদের দলে দলে বের ক'রে দিতেই কেবল লাগ্‌লাম, কেউ চলে গেলে তাকে আর ফিরিয়ে আন্‌বার আমাদের কোনও মুরোদই রইল না। আমাদের যোগ্যতা এসে শেষ পর্য্যন্ত এই খানে দাঁড়াল যে, সমগ্র স্মৃতিশাস্ত্র মন্থন ক'রে ক'রে কেবল পাঁতি দিতে লাগলাম যে, কে কি করলে তাকে সমাজ থেকে বের ক'রে দিতে হবে মাথায় ঘোল ঢেলে, আর নগর-প্রদক্ষিণ করিয়ে নির্ব্বাসন দিতে হবে গাধায় চড়িয়ে। আমরা বেঁচে আছি, একথা যেমনই সত্য, আমরা বাঁচার মতন ক'রে বাঁচতে পারি

নি, একথাও তেমন সত্য। যে সময়ে মিশর, পারস্য, ব্যাবিলোন, অ্যাসিরিয়া, মিট্যানি আদি সুসভ্য দেশের প্রাচীন জাতিরা কেবল প্রত্নতত্ত্বের গবেষণারই বিষয় হ'য়ে রইল, সেই সময়ে আমরা এখনও নিঃশ্বাস টানি, পিতৃপরিচয় দেই, একথা যেমনি সত্য, তেমনি, আমাদের ক্ষয়-শীলতা বাড়তে, বাড়তে, আমাদের পঙ্গুত্ব বাড়াতে বাড়াতে আমরা সত্য সত্যই এক মহাবিধ্বংসের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি, একথাও তেমনি সত্য। কিন্তু এই অবস্থার কারণটা কি ? তা' আজ তোমাদের ভাব্‌তে হবে।

আমাদের পূজা ব্যক্তি-প্রধান

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমার মতে, তার কারণ হচ্ছে, আমরা ব্যক্তিকে করেছি প্রধান, সমষ্টিকে করেছি উপেক্ষা। সব ব্যাপারে ব্যক্তিই আমাদের তোষণের পাত্র। আমরা মন্দির গড়ি, কিন্তু তা' কেবল ব্যক্তির প্রয়োজন মিটাবার জন্য, সমষ্টির জন্য নয়। হয়ত আমরা শত জনে মিলেই একটী মন্দির গড়ার অর্থ দিয়েছি, কিন্তু সেখানে আমাদের সকলের হ'য়ে পূজা করেন একটী মাত্র ব্যক্তি, একটী পুরোহিত। প্রসাদ আমরা সবাই নিতে পারি, উৎসবায়োজন আমরা সবাই মিলে কত্তে পারি, কিন্তু পূজার বেলায় আমাদের সকলের প্রতিনিধি হ'য়ে একটা মাত্র লোক তার পূজা নিবেদন করে, আর সেই সময়টাতে আমরা কেউ তাস খেলি, কেউ তামাক টানি। আমাদের পূজা একার পূজা, সকলের পূজা নয়, তাই আমরা অত ধর্ম্মচর্য্যা করেও, কেবল বেঁচেই আছি, বাঁচার মতন বেঁচে থাকতে পারি নাই।

শুধু কঙ্কাল, শুধু জঞ্জাল

স্তিমিত রেখায় শিরা বেয়ে যায়
প্রাণহীন দুটী শোণিত-কণা
তাই কিরে ভবে মহাকলরবে
জীবিত বলিয়া হবিরে গণা ?
মাথার ভিতরে কিলিবিলি করে
ষড়দর্শন ও শাস্ত্র-রাজি,
রামায়ণ ঘরে, মহাভারতেরে
দিয়ে সাজিয়েছি ফুলের সাজি,
গীতা-ভাগবত পুণ্য মহৎ
পূজা করিবারে ন'বৎখানা
প্রতিদিন ভোরে সুকরুণ সুরে
বাজায় মধুর কি মূর্চ্ছনা।
তাই কিরে ভবে মহাকলরবে
জীবিত বলিয়া হবিরে গণা ?
মানুষের প্রাণ চাহিতেছে ত্রাণ
অন্ধকারের শাসন হ'তে,
ছুটিয়া চলিতে আলোকের পথে
উঠিতে চাহিছে সাধন-রথে ;
তুই তারে দিলি শুধু গালাগালি,
প্রেমে গলিল না হৃদয়খানা।
তবু কিরে ভবে মহাকলরবে
জীবিত বলিয়া হবিরে গণা ?

যে আসিতে চায়, অবহেলা পায়—
যে গিয়াছে চ'লে, পায় না ডাক,
ফিরিয়া সে এলে, প্রেমমধু-রোলে
বাজে না তোদের গৃহেতে শাঁখ ;
কত অপরাধ, কত পরীবাদ,—
এই শুধু হয় সমালোচনা।
তাই কিরে ভবে মহাকলরবে
জীবিত বলিয়া হবিরে গণা ?
দিকে দিকে চলে মরারা সদলে,
প্রাণহীন শুধু মুণ্ডরাশি,
শুধু কঙ্কাল, শুধু জঞ্জাল,
শুধু শ্মশানের অট্টহাসি ;
যে ছিল অঙ্গ, হ'ল ভুজঙ্গ,
হিংসায় তোলে ক্রুদ্ধ ফণা,—
তাই কিরে ভবে মহাকলরবে
জীবিত বলিয়া হবিরে গণা ?

বাঁচার মতন বাঁচার পথ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু আজ বাঁচার মত বেঁচে থাকবার আহ্বান এসেছে। এ আহ্বান মহাকালের। যে এ আহ্বান শুনবে না, সে মহাকালেরই ত্রিশূলের আঘাতে প্রাণ দেবে। কাল নির্ম্মম পুরুষ। ধ্বংসেই তার আনন্দ। যেখানে সৃষ্টির গতিবেগ থেমে গেছে, সেখানে যাতে বিষাক্ত বীজাণুর সৃষ্টি হ'য়ে

জগৎসভ্যতার দেহে গ্যাংগ্রিণ না জন্মাতে পারে, তার জন্য মহাকাল তার তীক্ষ্ণ ছুরিকা দিয়ে অবর্দ্ধমান অঙ্গকে হাসতে হাসতে কেটে ফেলে দেয়। এই কাজে তার কারো মুখ চাওয়া-চাওয়ি নেই। তাই আমি নিয়ত তোমাদের বলি মন্দির গড়, যেখানে পাবে আশ্রয়, আর যেখানে সকলে মিলে করবে সকলের আরাধ্যকে সমবেত হ'য়ে উপাসনা ; কে তার কোন্ গুরুর কাছ থেকে কোন্ সাম্প্রদায়িক মন্ত্র নিয়ে সাধন করে, সেই প্রশ্ন যেখানে উঠ্‌বে না, কে নীচ চণ্ডালাধম, আর কে উচ্চ ব্রাহ্মণোত্তম, তার জিজ্ঞাসার যেখানে অবসর থাকবে না, কে উপাসনা কর্‌বে, এই একটী মাত্র কথাই হবে যেখানে বিচার্য্য। জগৎভরা হাজার জন গুরু নিজ নিজ তপঃ-প্রতিভার অনুযায়ী ভাবে শিষ্য-দল সংগ্রহ ক'রে ক'রে করুন হাজার হাজার নূতন সম্প্রদায়ের পত্তন, তাতে হবে না তোমাদের জন্য কোনও জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি। যে নামে কারো কোনো আপত্তি থাক্‌তে পারে না, যে নাম সকল নামের প্রাণ, যে নাম সকল নামের আধার, যে নাম থেকে সকল নামের উদ্‌ভব, যে নামেতেই সকল নামের পরিপূর্ণ বিলয়, সেই নামটী মাত্র মনে রেখে সকলকে তোমরা একবার ডেকে বল, "যতই থাকুক বাহিরের ব্যাপারে বিচিত্র পার্থক্য, তথাপি হে সাধক, এস আমার সাথে সাথে বস, এস আমরা সকলে সামগ্রিক ভাবে সমগ্র বিশ্বের কুশলকে ধ্যানে রেখে প্রাণভরা ডাকে ভগবানকে ডেকে দেখি,—ওঁ নির্ম্মলং নিষ্কলং পূর্ণং ভেদবুদ্ধে-র্বিমর্দ্দকম, হে নির্ম্মল, হে নিষ্কল, হে ভেদ-বুদ্ধির বিমর্দ্দক, তোমাকে আমরা প্রণাম করি।" সকল সাম্প্রদায়িকতার

আজ মূলোচ্ছেদ এই পথেই ক'রা চাই। কেননা, তা' না হ'লে তোমাদের অস্তিত্ব অচিরকাল-মধ্যেই বিলুপ্ত হবে। বাঁচার মতন বাঁচার যেমন আহ্বান এসেছে, জেনো, বাঁচার মতন বাঁচার পথও তার সঙ্গে সঙ্গেই এসেছে। যদি সাহস ক'রে এপথ ধরতে পারো মৃত্যু তোমাদের কখনই নেই।

একা বাঁচিবার চেষ্টা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—একা বাঁচবার চেষ্টা ক'রে কেউ বাঁচতে পারবে না। সবাই কেবল এত কাল ধ'রে একাই বাঁচতে চেয়েছ, তার ফলে বাঁচবার যোগ্যতা তোমাদের এক কণাও বাড়ে নাই। বাঁচতে হ'লে সকলকে একত্র বাঁচতে হবে। কাউকে বাদ দিয়ে কেউ লুকিয়ে লুকিয়ে বেঁচে যাবে, সেই কল্পনা পরিহার করো। কেননা, সে কল্পনা কখনও সত্যে পরিণত হবে না। এ যুগ অতি জটিল যুগ, যার জন্যে এ যুগের কল্কি অবতারের কল্পনা কত্তে গিয়েও, শাস্ত্র-রচয়িতাদের অশ্বারোহী কৃপাণধারী এক জনকেই ভাবতে হয়েছে। এ কাল অতি সঙ্গীণ কাল, যে কালে একটী মাত্র ব্রাহ্মণের ভ্রূকুটির ভয়ে রাজ্যেশ্বর তাঁর সিংহাসন থেকে নেমে এসে রাজমুকুট ঋষির পায়ে ফেলে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস টানে না, যে যুগে সঙঘবদ্ধ বর্ব্বরেরা সঙ্ঘশক্তিহীন দেবপুরুষদের ঘানিতে জুড়ে সরষে থেকে তেল বে'র করে। এযুগে বাঁচতে চাইলেই বাঁচা যায় না, সবাই মিলে বাঁচার চেষ্টা চাই, আর চাই, বাঁচারই জন্য মরার জন্য তৈরী হ'য়ে থাকা। কিন্তু তাও একা নয়, কেননা, একা মরলে হয়ত তুমি দুই, পাঁচ

কি বড়জোর দশ জনকে বাঁচাতে পারবে, কিন্তু তার বেশী নয় সবাই মরার জন্য প্রস্তুত হলে তবে সবাই বাঁচতে পারবে। তাই তোমাদের জীবনপণই কেবল সামগ্রিক ভাবে হবে, তা' নয়, মরণপণও সামগ্রিক ভাবেই হওয়া চাই। তোমাদের মরণ-ভয়কে জয় করার জন্য মৃত্যুরূপা জননীকে তোমরা কত না উপচারে পূজা ক'রেছ, কত তার বিধি, কত তার ব্যবস্থা, কিন্তু মরণভয় তোমাদের যায় নি। যা ক'রেছ, একাই ক'রেছ, যা ক'রেছ একার জন্যই ক'রেছ। তাই তোমাদের অকপট সাধনও মিথ্যা হ'য়ে গিয়েছে।

জীবনীয় রসায়ন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমার কবিত্ব আমাকে কত রকম বিচিত্রতার মধ্যে অবিরাম টানে, কিন্তু আমার ঋষিত্ব আমাকে অখণ্ড আরাম ভরা অখণ্ড-নামেই নিবদ্ধ ক'রে রেখেছে। কবি আমি সকল বিচিত্র সাধনার বিচিত্র আস্বাদের মাধুর্য্যকে স্বীকার করেছি, ঋষি আমি সকল বিচিত্রতাকে একটী মাত্র মহানামের মধ্যে সকলের পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য রূপে দেখেছি। কবি তোমাদের কল্পনায় লীলায়িত ছন্দ জাগাতে পারেন, ঋষি-দেবেন তোমাদের জীবনীয় রয়াসন।

প্রেসের জন্য পাণ্ডুলিপি তৈরী করিতে বসিয়া অদ্য অথবা তাহার কাছাকাছি তারিখে লিখিত একখানা পত্রের মুদ্রিত অনুলিপি পাওয়া গেল। নিম্নে তাহা দেওয়া হইল। যথা—

রোগশান্তি বা পারলৌকিক কল্যাণের জন্য উপাসনা

"লোকচক্ষুর অগোচরে দেখিতে না দেখিতে অখণ্ড-সমাজ একটা শক্তিশালী বহুব্যাপক কর্ম্মসংহতিতে পরিণত হইতে চলিয়াছে। এজন্য কোনও চেষ্টা করি নাই, কোনও কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করি নাই বা ইহার কোনও আকাঙ্ক্ষাও করি নাই। স্বভাবের বশে আপনি দূর দূরান্তর হইতে অপরিচিত নরনারী আমার প্রাণের প্রাণ আপনার আপন রূপে চক্ষের সমক্ষে ধরা দিতেছে। নিশ্চিতই ইহা ঐশী প্রেরণার স্বতঃসিদ্ধ ফল।

"এই ফলকে বৃথা অথবা অস্থায়ী হইতে দেওয়া উচিত নহে। যুগের ধর্ম্মে কদাচিৎ দুই একটী ধর্ম্ম-সংস্থাই আত্মপ্রকাশ করে এবং যদি কোথাও করে, তবে সেখানে ঈশ্বরাভিপ্রায়ের পরিপূর্ণ বিকাশকে নিত্যকালস্থায়ী করিবার প্রয়াস উত্তম। কেন না, তাহাদ্বারা তোমাদের চিত্তশুদ্ধি হইবে।

"গ্রামে গ্রামে তোমরা 'অখণ্ড-মণ্ডলী' স্থাপন কর। কর্ত্তৃত্বের অভিমান পরিহার করিয়া নিজেরা সেবক হইতে চেষ্টা কর এবং সেবকত্বের মধ্য দিয়া সত্য, সংযম, পবিত্রতা ও মহাবীর্য্য সঞ্চয় কর। রুগ্নের শুশ্রূষাকার্য্য অর্থনিরপেক্ষ-ভাবেই হইতে পারে, অবশ্য শুশ্রূষা-শিক্ষা এবং শুশ্রূষা-কালে আত্মরক্ষণোপযোগী সতর্কতা ও পটুতা থাকা আবশ্যক। দরিদ্র-সন্তানের অধীতব্য পুস্তক বা রুগ্ন ব্যক্তির ঔষধ-পথ্য কিনিয়া দিবার জন্য তোমরা

গ্রাম্য সজ্জনদের রাস্তা বাঁধা, পুকুর সেঁচা, পুকুর কাটা, কাঠ ফাঁড়া, জঙ্গল পরিষ্কার করা, ক্ষেত নিড়ান, পুকুরের পানা সাফ করা প্রভৃতি কার্য্য অর্থের বিনিময়ে দলবদ্ধ-ভাবে করিতে পার। ইহাদ্বারা তোমরা 'অখণ্ড-মণ্ডলী'-গুলিকে প্রাণবন্ত ও ক্রিয়াশীল রাখিতে পার।

"সদ্‌গ্রন্থপাঠ ও পর-নিন্দা-ত্যাগ 'অখণ্ড-মণ্ডলীর' প্রধান কার্য্য হইবে। ইহা দ্বারা তোমাদের সেবার প্রয়াস শুদ্ধতার দিকে পরিচালিত হইবে। কিন্তু সকল শুদ্ধতার খনি হইবে তোমাদের সমবেত-উপাসনার অনুষ্ঠানগুলি। সপ্তাহে একটী বার সমবেত উপাসনা করিবে, আচণ্ডাল-ব্রাহ্মণকে ইহাতে ডাকিবে।

"কিন্তু যখন শুনিবে, কেহ রুগ্ন বা কেহ দেহ-ত্যাগ করিয়াছেন, তাহার পরে যত শীঘ্র সম্ভব একটী উপাসনা-সভার অনুষ্ঠান করিবে। সময়ের ও সুযোগের অভাব হইলে সাপ্তাহিক উপাসনা-অধিবেশনকেই উক্ত উদ্দেশ্যের অনুষ্ঠান-রূপে গ্রহণ করিবে। কোনও বক্তৃতা দিবে না, সভা-সমিতির পাশ্চাত্য প্রথানুযায়ী কোনও প্রস্তাব আনয়ন করিবে না, কেহ সভাপতি থাকিবে না। আমন্ত্রিত সকলে আসন পরিগ্রহ করিলে সম্পাদক জানাইয়া দিবেন, কাহার রোগারোগ্যের জন্য বা কাহার পারলৌকিক কল্যাণের জন্য উপাসনা হইতেছে। তৎপরে যথানিয়মে উপাসনা করিবে। তোমরা যে এতদুদ্দেশে উপাসনা করিয়াছ, তাহা রুগ্ন ব্যক্তিকে বা পরলোকগত ব্যক্তির আত্মীয়বর্গকে সহানুভূতিপূর্ণ পত্রের দ্বারা জানান হিতজনক। ইহাতে রুগ্নের সাহস বাড়ে, শোকার্ত্তের শোক কমে।

"সকল খণ্ডকে একত্র গাঁথিবার 'সিমেন্ট' তোমরা পাইয়াছ। এখন ধীর বিক্রমে বিশাল প্রাসাদ গাঁথিয়া যাও।"

শিবপুর (কুমিল্লা)
১৫ই চৈত্র, ১৩৪০

সাম্প্রদায়িতকতা বনাম অসাম্প্রদায়িকতা

মেরকোটা, গোসাইপুর, নারায়নপুর ও সেন্দ গ্রাম হইতে কয়েকজন ভদ্রলোক শ্রীশ্রীবাবামণির চরণ-দর্শনে আসিয়াছেন। প্রত্যেকেরই নানা রকম ব্যক্তিগত সাধন-সমস্যার মীমাংসা প্রয়োজন। যাঁর যাঁর বক্তব্য একান্তে বলিবার পরে প্রত্যেককে যথোপযোগী সাধনোপদেশ দেওয়া হইল। ইঁহারা প্রতিজনেই ভিন্ন ভিন্ন গুরুর শিষ্য। কিন্তু শ্রীশ্রীবাবামণির নিকটে নিজ নিজ ব্যক্তিগত সমস্যার মীমাংসা পাইয়া সকলেই অতিশয় পরিতুষ্ট হইলেন। কে কি উপদেশ পাইয়াছেন, তাহা নিজে ছাড়া অন্য কেহ জানেন না বটে, কিন্তু সকলেরই অন্তরের সন্তোষ সকলে অনুভব করিলেন।

ইঁহাদেরই মধ্যে একজন শ্রীশ্রীবাবামণিকে প্রশ্ন করিলেন,—আচ্ছা বাবা, আমরা ত' দেখছি প্রতিজনেই ভিন্ন ভিন্ন মতের ও ভিন্ন ভিন্ন পথের আশ্রয়-গ্রহণকারী। কোন্ শক্তি বলে আপনি আমাদের সকলেরই অন্তরের মেঘ কাটিয়ে দিলেন ? জান্‌তে সত্যই অতিশয় কৌতূহল হয়।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—রাম, যদু, মধু পরস্পর পরস্পর থেকে পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তি হ'লেও, এঁদের সকলের

মধ্যেই মানবতা এঁদের সামান্য ধর্ম্ম। ঠিক তেমনি শাক্ত, সৌর, শৈব, গাণপত্যাদি ধর্ম্মমত বা হিন্দুত্ব, খ্রীষ্টিয়ানিটি, জুডাইজম্, ইসলাম প্রভৃতি ধর্ম্মপথ বাহ্যতঃ আলাদা হ'লেও পরমেশ্বরনিষ্ঠতা এঁদের সামান্য ধর্ম্ম। এই সামান্য ধর্ম্মটুকু যাতে নেই, তাকে মানুষও বলা চলে না, ধর্ম্মও বলা চলে না। শত মতের শত বিরোধের মাঝখানে যখন তুমি এই সামান্য ধর্ম্মকে দেবে মর্য্যাদা, তখন কোথায় রয়েছে কোন্ বিরোধ, আর কোথায় রয়েছে কোন্ পার্থক্য, তা' অতল তলে ডুবে যাবে। তখন তুমি সকলের পক্ষে সমান, তখন সকলে তোমার পক্ষে সমান। ভেদ ও পার্থক্যের উপরে লক্ষ্য না দিয়ে লক্ষ্য দাও, কোথায় তোমার কার সাথে কি মিলন,—তাহ'লেই দেখবে, জগতের একটী মতের সঙ্গেও তোমার কোনো কলহ নেই।

প্রশ্নকর্ত্তা বলিলেন,—বড় শক্ত কথা বাবা।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শক্ত ত' নিশ্চয়ই। জলের মত সোজা হ'লে সবাই এই তত্ত্বে নিজেকে ঢেলে দিত। কিন্তু শক্ত ব'লেই ত' আর রেহাই পাচ্ছে না। মনকে তোমার সর্ব্বসাম্প্রদায়িকতার ঊর্দ্ধে তুলে নিতেই হবে। সম্প্রদায় ছাড়া কচি অবস্থায় তুমি কিছুতেই গজাতে পার না, নবকিশলয় সব উদ্‌গত হ'তে না হ'তে ছাগলে মুড়ে খেয়ে দেবে। মায়ের কোল ছাড়া যেমন শিশু বাঁচে না। এই জন্যই জগতে সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। কিন্তু ঐ একটী মায়ের কোলে ব'সে তাঁর স্তন্যরস পান কত্তে কত্তেই তোমাকে বিশ্বমায়ের কোলে উঠে বসার জন্য হাত বাড়াতে হবে। গোড়াতে সম্প্রদায়ের আশ্রয় ছাড়া যেমন তোমার

ধর্ম্মচ্যুতির ভয় অপরিসীম, পরিণামে সাম্প্রদায়িক ভাবেও তেমন তোমার ধর্ম্মচ্যুতির ভয় অপরিসীম। তোমার মধ্য দিয়ে যিনি বিকশিত হ'তে চাচ্ছেন, তিনি সকল সম্প্রদায়ের উর্দ্ধে, তিনি যে বিশ্বসম্প্রদায়ের আপন। তাঁর উপরে যে কারো কোন ট্রেড্ মার্ক রেজেষ্টারী করা নেই। তিনি সকলের প্রাণের ধন, তিনি যে সকলের আপনার জন।

বর্ণচোরা আম

ভদ্রলোকেরা রওনা হইবার আয়োজন করিতেছেন। সকলেরই নিকটবর্ত্তী পল্লীতে আত্মীয়-স্বজন আছেন, সেখানেই তাঁহারা যাইয়া আহারাদি করিবেন স্থির করিয়া আসিয়াছেন। কেহ ছাতা হাতে লইয়া উঠিয়াছেন, কেহ মাথায় গামছা বাঁধিতেছেন, এমন সময়ে স্বয়ং গৌরী বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন,—আপনাদের আহারীয় প্রস্তুত, দয়া ক'রে আসুন।

আগন্তুকেরা বলিলেন,—পাশের গ্রামেই আমাদের আত্মীয়বাড়ী আছে, আমরা সেইখানেই যাব যে।

গৌরীবাবু বলিলেন,—সে কি হয় ? এ যে স্বামীজীর বাড়ী। গৌরী ভুষণের নয়, স্বামীজীর বাড়ী থেকে আপনারা না খেয়ে চ'লে যাবেন ?

অগত্যা আগন্তুকদের সেখানেই থামিতে হইল। কেহ কেহ স্নান সরিয়াই আসিয়াছিলেন, অপরেরা নিজ নিজ স্নান এখানে সারিলেন। যথাকালে সকলে আহারে বসিলেন। আহারের বিশেষ আয়োজন করা হইয়াছিল।

আহারান্তে গৃহে ফিরিবার কালে সকলেই নিজেদের মধ্যেই বলাবলি করিতেছেন,—আমরা ত' জানিতাম, গৌরীবাবু অনাতিথেয় ও কৃপণ। আর, আমাদের বলা নেই, কওয়া নেই, অথচ ভিতরে ভিতরে এত পদ রান্নাবান্নার ব্যবস্থা পর্য্যন্ত সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—বর্ণচোরা আম, জানো ত' ? বাইরের রং দেখে বুঝা যায় না যে ফলটী পেকেছে। আমরা জগতে অনেক লোককে নিন্দা করি, তাঁদের ভিতরের মহত্ত্ব কিছু মাত্র জানিনা।

শিবপুর (কুমিল্লা)
১৬ই চৈত্র, ১৩৪০

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব কিছুকাল ধরিয়া ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত শিবপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত গৌরী ভূষণ রায় চৌধুরীর গৃহে অবস্থান করিতেছেন। বাটীর বাহিরের দিকে একখানা ছোট সুপরিচ্ছন্ন গৃহ তাঁহাকে অবস্থানের জন্য দেওয়া হইয়াছে, গৃহ খানা ছায়ায় শীতল। সম্মুখেই ক্ষুদ্র একটী আঙ্গিনা, তাহাতে কচি ঘাস জন্মিয়া অভ্যাগতদের বসিবার যোগ্য একখানা গালিচার মতন যেন তৈরী করিয়াছে। বাড়ীর স্ত্রী-পুরুষ-বালক-বৃদ্ধ সকলেই সর্ব্বক্ষণ তাঁহার সেবার জন্য আগ্রহ সহকারে অপেক্ষমাণ। পরবর্ত্তীকালে অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর বহুবার বলিয়াছেন, নিভৃত পল্লীতে এমন আরামে নিশ্চিন্ত ভাবে সাধন-ভজন করিবার অবসর অতি কমই পাওয়া গিয়াছে। সাধারণতঃ বিকাল বেলা তিনি মাঠে ভ্রমণে বাহির হন, কখনও

কখনও দুই তিন মাইল হাঁটিয়া ফিরিয়া আসেন, কখনও বা আধ মাইল বা সিকি মাইল গিয়াই মাঠের মধ্যে এক স্থানে বসিয়া হয় ধ্যান করেন, নয়ত বা সঙ্গীয় জিজ্ঞাসুদের প্রশ্নের জবাব দেন।

গান শিখিবার উপায়

সঙ্গীতের প্রতি অত্যন্ত রুচি-সম্পন্ন একটী যুবক আজ সঙ্গ নিয়াছে। যুবক জিজ্ঞাসা করিলেন,—গান শিখবার শ্রেষ্ঠ উপায় কি ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভগবান্‌কে ভালবাসা।

যুবক জিজ্ঞাসা করিলেন,—অমুক ওস্তাদ, অমুক সঙ্গীতাচার্য্য যে সঙ্গীতবিদ্যায় অত পারদর্শী, তা' কি তাঁদের ভগবদ্‌ভক্তির ফল ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তা' নয়। কিন্তু আদি মানব প্রথম যে গান গাইলেন, তা' তাঁর ভগবান্‌কে ভালবাসারই ফলে। ভগবান্‌কে ভালবাসার ফলে তোমাদের বেদের সামগান, ভগবান্‌কে ভালবাসার ফলে তোমাদের ব্রহ্ম-গায়ত্রী গান। ভগবান্‌কেই প্রাণ দিয়ে ভালবাস বাবা, দেখবে বিনা আয়াসে কত কাব্য, কত সঙ্গীত তোমার কণ্ঠ দিয়ে নিঃসৃত হচ্ছে। এই যে তোমাদের পাশের বাড়ীতেই রয়েছেন ফকীর আপ্তাবুদ্দিন, তাঁর কণ্ঠ কি অতি মধুর ?

যুবক বলিলেন,—না তা' নয়। তাঁর কণ্ঠ অতি সাধারণ। এমন কণ্ঠ এ অঞ্চলে আরো কয়েক হাজার গায়কের আছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —তবে তোমরা ফকীর আপ্তাবুদ্দিনের গান শোনার জন্য পাগল হ'য়ে ছুটে যাও কেন ? ভগবদ্‌ভক্তিতে আপ্লুত হ'য়ে তিনি গান, আর গাইতে গাইতে তিনি ভক্তিতে গদগদ হ'য়ে যান। তারই জন্য নয় কি ?

যুবক বলিলেন,—ঠিক তাই।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রত্যক্ষ প্রমাণ যখন হাতের কাছে পেয়েছ, তখন তার যুক্তি দিয়ে কি প্রয়োজন ? গান শিখ্‌তে চাও, বেশ ত', ওস্তাদের কাছে গিয়ে সারগম অভ্যাস কর, তান লয় শেখ, রাগরাগিণীর ঠাট ও চাল আয়ত্ত কর, কোনো দোষ নেই। কিন্তু ভগবানকে ভালবাসতে না পারা পর্য্যন্ত তোমার গান শেখা হবে না। এ কথাটি সর্ব্বদা রেখ মনে।

তোমারে বেসেছি ভাল

শ্রীশ্রীবাবামণি গাহিলেন, —

তোমারে বেসেছি ভাল, তাই শুধু জানি গো ;
তাই দিবারাতি গাহি গান।
ধেয়ানে জাগাই নিতি ও-চরণ খানি গো
সদা মোর পুলকিত প্রাণ।
তুমি যে মধুর কত গানে গানে জাগে গো,
তোমার পরশ যেন সারা গায়ে লাগে গো,
প্রতি অণু পরমাণু তব অনুরাগে গো
তার সাথে ধরে নিজ তান।
মধুর আধার তুমি, প্রীতির সাগর গো,

তোমারে বাসিলে ভাল কেহ নাহি পর গো,
দূর হ'য়ে যায় যত লাজ ভয় ডর গো,
নামের অমিয় করি' পান,
গগনের জলধর নয়নের কোণে আসি'
কি বহায় হরষের বান!
হৃদয়-কমল যেন চকিতে ফুটিয়া যায়,
কোথা তুমি, কোথা তুমি,—এ দিকে সে দিকে চায়,
সহসা বাঁশরী-রব ভিতরে শুনিতে পায়,
প্রাণে বহে যমুনা উজান;
দিবা নাই নিশি নাই, তাই দিবা রাতি গাই,
তোমারি মধুর নাম-গান।

শিবপুর, কুমিল্লা
১৭ই চৈত্র, ১৩৪০

গোপন কথা জিজ্ঞাসা

পার্শ্ববর্ত্তী একটী গ্রাম হইতে একটী যুবক আসিয়াছেন। তিনি প্রশ্ন করিলেন, —বাবা, একটী গোপনীয় কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিব। জবাব পাব কি ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —যদি মনে কর যে, কোনও কথা গোপনীয় তা'হলে তা' জিজ্ঞাসা না করাই উচিত। এটা যে কেবল একটা ভদ্রতারই অঙ্গ, তা' নয়। মানুষ মাত্রকেই তার মনের গোপন কথা মনেই সঙ্গোপনে রাখার অধিকার তোমাকে দিতে হবে। তথাপি জিজ্ঞাসা কর্লে তার জবাব দিব।

তুমিই আমার গুরু

যুবক জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনার গুরু কে ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমার গুরু তুমি। তোমাকে মন্ত্র দিতে গিয়েই হঠাৎ স্পষ্ট ক'রে অনুভব করলাম যে, আমি যা দেই উপদেশ, তা' নিজে পালন কচ্ছি না। তাই থেকে আমার জীবনে এক অভিনব বিপ্লব এল। সেই বিপ্লবের তরঙ্গতাড়নে আমার অনেক আপোষ, অনেক নিস্পত্তি ভেসে গেল। সেই বিপ্লব আমাকে বিদ্রোহী ও রণোন্মাদ করল। সেই বিপ্লব আমাকে অজস্র অশ্রুধারে ডুবিয়ে দিল। তাই থেকে আমি আমাকে চিনলাম, তা' থেকে আমি আমার শাশ্বত পথকে ভাল ক'রে ধরার প্রেরণা পেলাম। আমি অখণ্ডমহামন্ত্রের অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠাকে নিজ জীবনে মেনে নিতে এমন ভাবে বাধ্য হলাম যে, এই মহামন্ত্রকে বাদ দিয়ে আমার চিন্তা-চেষ্টা-জীবন-মরণ সবই অর্থহীন। তাই বল্‌ছি তুমিই আমার গুরু।

অখণ্ডের গুরু-পরম্পরা

যুবক বলিলেন,—কিন্তু সকল সম্প্রদায়েই গুরু-পরম্পরার পরিচয় দেওয়ার প্রথা আছে। আমাদের গুরু-পরম্পরা-পরিচয় কি হবে ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমাদের গুরু-পরম্পরা-পরিচয় হবে, পরব্রহ্ম, অখণ্ডনাম, স্বরূপানন্দ। এর মাঝখানে আর অন্য কোনও পরিচয়ের তোমাদের পথ নেই।

যুবক বলিলেন,—আপনার সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন,

আপনি স্বয়ংসন্ত, নিজ স্বভাবেই পরমহংস, কেউ কেউ বলেন, আপনার অনেক জন গুরু। আমাদের কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে আমরা সঠিক জবাব দিতে পারি না। তাতে লজ্জিত হ'তে হয়।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তুমি তোমার গুরুতে নিষ্ঠাবান, এই কথাটুকু যতক্ষণ তোমার পক্ষে সত্য, ততক্ষণ এসব প্রশ্নের জবাব দিতে পার না বলে তোমার লজ্জার কিছু আছে ব'লে মনে করা ভ্রম মাত্র। আমার নিজের জীবনকথা আমি নিজে কি বল্‌ব, জগতে কেউই বুঝি সাহস ক'রে নিজের জীবনকথা বলতে পারেন না। যীশু, বুদ্ধ, রামকৃষ্ণ প্রভৃতিরাও নিজেদের জীবনের সকল কথা ব'লে যেতে সাহস পান নি। তাঁদের জীবনের সবচেয়ে যেটুকু অসাধারণ সময়, সেইটুকু সম্পর্কে নিজেরা কিছুই বলেন নি, বলতে বসেছেন অন্য লোকেরা, যাঁরা সেই সময়ে তাঁদের জানেন নি। আমিই বা সাহস ক'রে নিজের সেই সময়কার কথা বল্‌ব কেমন ক'রে ? যে সময়ের কথা বল্‌তে ওঁদের মতন মহাপুরুষেরও অসাধারণ অরুচি দেখা যায়, সেই সময়কার কাহিনী সব ব'লে আমি তোমাদের উপরে উৎপাত করব না। তবে হ্যাঁ, আমার অনেক গুরুর কথা বলেছ ত' ? সে কথাও সত্য। আমার অনেক গুরু ব'লেই তোমাদের গুরুপরম্পরা পরিচয়ের মাঝখানে এঁরা কেউ আস্‌বেন না।

জীবনের বিকাশ-পথে অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

যুবক বলিলেন,—আমরা আপনার সেই অনেক গুরুদের

সম্পর্কেই জানবার জন্য কৌতুহলী হয়েছি।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তা' বলায়ও শত বিঘ্ন। একটী নিমেষের জন্য যাঁর কাছে মনের বিনতি আসে, তাঁর সাথে সঙ্গে সঙ্গে এমন এক সম্পর্ক সৃষ্ট হ'য়ে যায়, যাতে মনের শত শত সহস্র সহস্র জটিল ভঙ্গিমার রং-পরণ চলে। তার সম্পূর্ণ বর্ণনা দিতে বস্‌লে কত অসুন্দর কথারও অবতারণা করতে হয়। তাই, এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া অতি শক্ত। তবু তুমি জিজ্ঞাসু, তাই যতটুকু সহজ মনে বল্‌তে পারি, ব'লে যাব। বয়স আমার তখনো আট হয়নি, পিতামহের গৃহে এক জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষকে দেখ্‌লাম। তিনি চ'লে যাওয়ার পরও মন বড় টান্‌ল। প্রখর রৌদ্রে পূরা এক মাইল হেঁটে রেল-ষ্টেশানে গিয়ে মহাপুরুষকে, আমার যা-ছিল পয়সা-কড়ি, সব তাঁকে দিয়ে দিলুম। মহাপুরুষ স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে শুধু তাকালেন। মনে হ'ল, আমাকে যেন কিনে ফেললেন। বল, ইনি আমার গুরু কি না ? এই বয়সেই পিতামহ আমাকে তাঁর মুক্তার মতন সুন্দর হস্তাক্ষরে পবিত্র ব্রহ্ম-গায়ত্রী মন্ত্র লিখে দিয়ে বল্‌লেন, ''কণ্ঠস্থ কর, পৈতা হলে কাজে আসবে।'' দুই দিনেই তা' মুখস্থ হ'য়ে গেল। রোজই তা' আবৃত্তি কত্তে লাগ্‌লাম। বল, পিতামহ গুরু হলেন কি না ? কিছু দিন পরে এক জন অতীব প্রাচীন সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত এলেন পিতামহের গৃহে। বহু শাস্ত্রালোচনা হল। পিতামহ থেকে, আমরা যাঁরা বালক ব'লে শাস্ত্রের কিছুই বুঝি না, তাঁরা পর্য্যন্ত সকলেই মেনে নিতে বাধ্য হলাম যে, ইনি অদ্বিতীয় ব্যক্তি। পণ্ডিত চ'লে যাবার জন্য রাস্তায় নেবেছেন, এমন সময়ে

পিতামহের মনে হ'ল যে, পৌত্রকে পৈতার আগেই ব্রহ্মগায়ত্রী লিখে দিয়েছেন কণ্ঠস্থ কত্তে, সেটা ধর্ম্মানুমোদিত হ'ল কিনা, এই ব্রাহ্মণকে তা' জিজ্ঞাসা কর্ল্লে হ'ত। তিনি আমাকে বল্লেন, —"যা তো, গিয়ে কথাটা জিজ্ঞেস ক'রে আয়।" আমি ছুটে গিয়ে পণ্ডিতকে রাস্তায় পেয়ে জিজ্ঞেস কর্ল্লাম যে, "ঠাকুরদাদা ব্রহ্ম-গায়ত্রী লিখে দিয়েছেন, আমি পাঠ কচ্ছি, জপ কচ্ছি, ঠিক হচ্ছে ত' ? তিনি বল্লেন,—"সর্ব্বনাশ, তুমি যে ভয়ঙ্কর অন্যায় কাজ কচ্ছ। তোমার ঠাকুরদাদাকে এখনি গিয়ে বল যে, একাজ চলবে না।" আমি এসেই ঠাকুরদাদাকে কথাটা বল্‌তে তিনি হেসে উঠ্‌লেন,—বল্লেন,—"কেবল বই প'ড়েই শাস্ত্রজ্ঞ রে, তত্ত্বকে জানে নি। যা, আমি বল্‌ছি, আরো বেশী মন দিয়ে ব্রহ্ম-গায়ত্রী জপ কত্তে থাক্। পৈতে যেদিন হয় হবে।" অর্থাৎ পিতামহ কেবল গায়ত্রীটি লিখে দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না, এতে নিষ্ঠাও বাড়িয়ে দিলেন,—এখন বল, তিনি গুরু হলেন কিনা ? কিছু দিন পরে হিন্দুর ঘরে ব্রাহ্মণ-ছেলের যেমন ভাবে উপনয়ন-সংস্কার হ'য়ে থাকে, তাই হ'ল। পিতামহ আমার অপর এক ভ্রাতার আচার্য্য হ'য়ে বস্‌লেন, কুলগুরুমহাশয় এসে আমার আচার্য্য হ'য়ে বস্‌লেন। নিয়মানুযায়ী যথাকালে তিনি আমাকে গায়ত্রী মন্ত্র মুখে মুখে ব'লে ব'লে দিতে লাগ্‌লেন, কিন্তু আমি তাঁর আগে আগেই মুখস্থ-করা গায়ত্রী ব'লে যেতে লাগ্‌লাম। একই ঘরে বসে তিন চার জনের উপনয়ন হচ্ছিল। পিতামহ ব'লে দিলেন,—"আচার্য্যের আগে আগে বলতে নেই।" তখন আমি কুলগুরুমহাশয়ের বলার পরে পরে ব'লে যেতে লাগ্‌লাম।

তিনিও খব সন্তুষ্ট হলেন। এখন বল,—তিনি গুরু হলেন কিনা? এর কিছু দিন পরে পিতৃদেবের লোহার কারখানায় একটা দুর্ঘটনা ঘটল। অনেক ওজনের একটা লোহার যন্ত্র উপরে টানান ছিল লোহার শিকল দিয়ে। শিকল ছিঁড়ে সেই লোহাটা পিতৃদেবের পায়ের উপরে পড়ে গেল। তিনি গুরুতর-ভাবে আহত হলেন এবং সেই প্রসঙ্গে তাঁকে তিন মাসের অধিক কাল শয্যাশায়ী হ'য়ে থাক্‌তে হল। সেই সময়ে পিতার শয্যাপার্শ্বে আমাকে অনেক সময়ে থাকতে হ'ত। সেই সময়ে তিনি আমাকে শিখালেন, ভগবানের কাছে প্রার্থনা কত্তে। বল্লেন,—"পৈতে হয়েছে, ত্রিসন্ধ্যা ত' করবেই, কিন্তু সংস্কৃত মন্ত্রের অর্থ ত' বোঝ না। তাই সোজা সরল বাংলা ভাষায় ভগবানের কাছে প্রার্থনাও করবে। আর প্রতি দিন ডাইরি লিখবে।" ডাইরি লেখার বিবরণ সব ব'লে দিলেন এবং প্রার্থনার ভাষাও জানিয়ে দিলেন। তার ভিতরে একটী কথা ছিল এই, —"হে ভগবান, আমাকে সৎসাহস দাও।" এখন বল, বাবা গুরু হলেন কি না? এর পরে বিদ্যালয়ের এক শিক্ষক বল্লেন, "যে কোনও মন্ত্র লক্ষবার জপ কল্লে সিদ্ধি লাভ হয়।" সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষা সুরু হ'ল। কৃষ্ণ, রাম, গণেশ, দুর্গা, সরস্বতী থেকে সুরু ক'রে শেষে একেবারে কালী পর্য্যন্ত সব দেবতার নাম ও তৎকাল-জানিত সকল মন্ত্র লক্ষবার ক'রে জপ করা হ'তে লাগ্‌ল। কখনো রুদ্রাক্ষ দিয়ে, কখনো তুলসীর মালা দিয়ে, কখনো মাছ-ধরার জালের কাঠি দিয়ে জপ চল্‌তে লাগ্‌ল। কখনো ঠাকুর-ঘরে ব'সে, কখনো কখনো লোক-ভয়ে ঘরের কারে ব'সে, কখনো নির্জনতার জন্য বনের মধ্যে বাঁশঝাড়ে

ব'সে বা শিয়ালের গর্ত্তে ব'সে জপ চল্‌তে লাগল কিন্তু সব মন্ত্রই গিয়ে ক্রমে ক্রমে প্রণবে পরিণত হ'তে লাগল। প্রণবই যে সর্ব্বমন্ত্রের সমাহার, প্রণব থেকেই যে সকল মন্ত্রের সৃষ্টি, প্রণবেই যে সকল মন্ত্রের লয়, একথা তখন জানতে পারি নি, বা বুঝতে পারি নি, কিন্তু এক এক মন্ত্র বা নাম ধ'রে জপ সুরু হ'ত, লক্ষ জপ পার হ'য়ে যেত, তখন হঠাৎ দেখ্‌তুম প্রণবই জপ কচ্ছি, অন্য মন্ত্র আর নেই। এই সময়টায় আমার প্রথম জীবনের গুরুগিরি সুরু হয়। ননীলাল কুণ্ডু, তারাপদ দত্ত, বঙ্কিম মজুমদার ইত্যাদি এই সময়কার সব শিষ্য-দল আমাকে ঘিরে বসেছে, তারাও যে যেমন পাচ্ছে, সাধন ক'রে যাচ্ছে। এই সময়কার এমন অনেক জীবন্ত ব্যাপার রয়েছে, যা সাধারণের বিশ্বাস করা কঠিন। তাই সেই সকল কথা কেউ কখনো জান্‌বেনা। সেই সময়টায় আমার পিতা ও পিতৃব্যের কাজে-কর্ম্মে ব্যবহারে সর্ব্বদা কত কত অলৌকিক শক্তির খেলা দেখে হাজার লোক হচ্ছে চমৎকৃত, তাই আমার অভিজ্ঞতায় নিজের ঘটনা যা যা এসেছে, তাকেও আমি নিতান্ত স্বাভাবিক ব'লেই মনে কত্তাম। তাতে আমার মনে কোনও উদ্বেগ বা উল্লাস সৃষ্ট হয় নি। কিন্তু একটা জিনিষ এই এসে দাঁড়াল যে, আমার বৈদিক সন্ধ্যার মন্ত্রতন্ত্র, বাংলায় ভগবানের কাছে প্রার্থনা করার মহাবাক্য, সবই এক সঙ্গে চ'লে গেল, রইল শুধু এই মহামন্ত্র প্রণব, যাঁকে ছেড়ে দিলে আমার অস্তিত্বই থাকে না। এখন বলত' সেই স্কুলের মাষ্টার মশাই আমার গুরু কিনা? বয়স বেড়ে চলেছে, সাধু-পন্থে নেমে গেছি, কিন্তু মনের ভিতরে এক অদ্ভুত নিঃসঙ্গতা

আমাকে পীড়া দিচ্ছে। এই রকম নিঃসঙ্গতা-বোধ এলেই মানুষ অন্য মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তা কত্তে চায়। অবশ্য দীক্ষার প্রয়োজন আমি অনুভব করি নি। কিন্তু এই সময়ে এক গৃহী সাধক এসে নিজে সেধে আমার সঙ্গে আলাপ জমালেন মিষ্টি কথা-বার্ত্তায় প্রাণ নরম হ'ল। তাঁকে প্রেমপূর্ণ পত্রাদি লিখতে আরম্ভ কর্ল্লাম। কিছু দিন পরে তাঁর সঙ্গে হাওড়াতে বলদেও-পাড়াতে মিলন হ'ল। তিনি আমাকে মন্ত্রাদি দেবার আগেই দেখলাম তাঁর শিষ্যদের কাছে আমাকে তাঁর শিষ্য ব'লে পরিচয় দিলেন। মনটা একটু সন্দিগ্ধ হ'ল। কিন্তু পরদিন ভোর সময়ে স্নান সেরে আসতেই তিনি বল্লেন, "ব'স ত' সামনে।" বস্‌লাম। বল্লেন, —"চোখ বোজ ত'।" বুজলাম। তাঁর উদ্দেশ্য আমি কিছুই ধারণা কত্তে পারি নি। তিনি আমার কাণে এক মন্ত্র দিয়ে বল্লেন,—"তোমার দীক্ষা হ'ল।" সঙ্গে সঙ্গে মনটা হ'ল বিদ্রোহী। দীক্ষা ত' আমি চাই নি, দীক্ষার ত' আমার দরকার নেই। একি উৎপীড়ন। কিন্তু তবু মন্ত্র ত' ভাল বেসেই হয়ত' দিয়েছেন, হয়ত' আমার ভালর জন্যই দিয়েছেন। তাই মনকে কোনও প্রকারে প্রবোধ দিয়ে মনের আপত্তির মধ্য দিয়েই সেই মন্ত্র জপতে লাগ্‌লাম। এখন বল, ইনিও গুরু হলেন কিনা ? এই সময় থেকেই আমার দ্বিতীয় স্তবকের গুরুগিরি আরম্ভ হ'ল। তোমরা আমার সেই সময়ের শিষ্য। কিন্তু তোমাদের মন্ত্র দিতে গিয়ে দেখি, আমার এই নূতন গুরুদেবের দেওয়া মন্ত্র তোমাদের দিতে অক্ষম হ'য়ে যাচ্ছি। আমার সেই আবাল্যের সাধনার ধন ছাড়া অন্য জিনিষ দিতে আমার মন কুণ্ঠিত হ'য়ে পড়ছে। অথচ

তোমাদের দীক্ষার প্রয়োজন উপলব্ধি করেই তোমরা আমার কাছে এসেছ। আমি সেই গৃহী সাধকের দেওয়া মন্ত্র নিজেও বর্জ্জন কর্ল্লাম, তোমাদের মধ্যে দু-এক জনকে সেই মন্ত্র দিয়েছিলাম ব'লে তা' আবার বদলে নূতন ক'রে অখণ্ডমন্ত্র দিয়ে বল্লাম, আগের সব মিথ্যা, অখণ্ডমন্ত্রই মন্ত্র, বাকী সব নিরর্থক। আমার দ্রোহভাবে মহাপুরুষ রুষ্ট হলেন। তিনি ভাব্‌লেন এবং তাঁর চেয়ে অনেক বেশী ভাব্‌লেন তাঁর অনুগত শিষ্যগণ, যে, আমাকে তাঁর শিষ্য ব'লে দাবী করা তাঁর শাশ্বত অধিকার; আমি ভাবলাম, তাঁকে গুরু ব'লে প্রচার করা আমার অমার্জ্জনীয় মিথ্যাচার। কোথায় তিনি আমাকে উৎপীড়ন করেছেন, আমার অঙ্কুর-জীবনের শিকড়ের দিকে না তাকিয়ে হঠাৎ একটা মন্ত্র দিতে গিয়ে আমার জীবন-তরুর আসল মূলটীকে কোথায় আঘাত করেছেন, তার ফলে সত্যই যে আমার হৃদপিণ্ড থেকে অবিরাম রক্তক্ষরণ হচ্ছে আর আমাকে মরণ-যন্ত্রণা দিচ্ছে, একথা তিনি বুঝতে অক্ষম। আর, জীবনের অভিক্ষা-ব্রত যাঁর কাছে পাই নি, সঙ্কীর্ত্তনের হরিওঁ-মহাসাধন যাঁর কাছ থেকে আসে নি, পবিত্র-প্রণব-মহামন্ত্র যিনি আমাকে দেন নি, তাঁকেই জীবনের ধ্রুবতারা ব'লে কেন স্বীকার কত্তে হবে, আমি বুঝতে অক্ষম। উপকারের ঋণ, ভালবাসার ঋণ, স্নেহের ঋণ আমার অন্তর স্বীকার করে, তাঁর প্রাপ্য ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা দিতে আমার কুণ্ঠা নেই, কুণ্ঠা তার চাইতে বেশী জিনিষ দিতে। কি বিদ্‌ঘুটে অবস্থা! ভদ্র মন চায় আপোষ কত্তে, ঝগড়ার কাজ কি ? বিপন্ন বিপর্য্যস্ত বিত্রস্ত মন চায় ছুটে পালাতে,—সে আপোষের প্রস্তাবকে গ্রহণের অযোগ্য

বলে জ্ঞান করে। এমনি এক মহাদুঃখকর ধর্ম্মসঙ্কটে প'ড়ে গেলাম। ক্ষুদ্রবৃহৎ কতকগুলি ঘটনা যেন দাবানল জ্বালিয়ে দিল। উভয় দিকেই কতকগুলি অতীব অসুন্দর ব্যাপার ঘ'টে গেল কিন্তু পৃথিবীর সকল ব্যাপার নিয়ে আপোষ চলে, অন্তরের গূঢ়তম সাধন নিয়ে আপোষ চলে না। এখানে আপোষ করার মানে অপমৃত্যু। এখানে আপোষ করার মানে সেই শৈশবের গায়ত্রী-জপ থেকে সুরু ক'রে উদ্ভিন্ন যৌবনের সকল প্রাপ্তিকে অস্বীকার করা। এখানে আপোষ মানে নিজেকে নিজে প্রবঞ্চনা করা। তিনি ভেবেছিলেন যে, আমাকে তাঁর কাছে দীক্ষা নিতে ইচ্ছুক ভেবে তিনি মন্ত্র দিয়েছেন, আমি বুঝেছি যে, তিনি আমার মনের কোমল ভাবের সুযোগ নিয়ে অনিচ্ছুক অবস্থায় হঠাৎ দীক্ষা দিয়েছেন। এই কথাটা ধ'রেই বিরাট মনোমালিন্য সৃষ্ট হ'য়ে গেল। মন্ত্রটী পাবার পরে তাকে সেবা দেবার খুব চেষ্টা করেছি, মন যাতে তাতে বসে, তার জন্য মন্ত্রদাতার সাথে· হৃদ্যতার উচ্ছ্বাস সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু হায়, অশান্তির দাবদাহে প্রাণ ত' আর বাঁচে না। তাঁর স্নেহপরায়ণ চিত্তটীর কথা ভেবে তাঁকে মহাসমাদরে অন্তরে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করি, আর ভিতর থেকে বিক্ষোভের অগ্ন্যুৎপাত চতুর্দ্দিকে লাভাপ্রবাহ প্রবাহিত ক'রে আমাকে গন্ধকের ধোঁয়ায় অস্থির করে, দহনের জ্বালায় অধীর করে। তিনি যে মন্ত্র দিয়েছিলেন, অতীতে সেই মন্ত্র আমি কখনো জপি নি, তাই একে অনাবশ্যক ব'লে মনে কত্তে পাচ্ছি না। আল্লা জপেছি লক্ষবার, গড জপেছি লক্ষবার, কালী, দুর্গা, শিব, গণেশ কিছু বাদ যায় নি, তন্ত্রসার দেখে দেখে

বীজমন্ত্রও অনেক একধার থেকে জপেছি, কিন্তু নূতন পাওয়া এ মন্ত্রটী নয়। তাই এর আবশ্যকতা একেবারে অস্বীকার কত্তে পাচ্ছি না, কিন্তু জীবনের অতীত অভিজ্ঞতা, জীবনের ভবিষ্যৎ স্বপ্ন, জগতের সম্পর্কে নিজ কল্পনার ভাবী মানচিত্র, এ সব কিছুরই সঙ্গে এ মন্ত্রের মিলন-সাধন সম্ভব হচ্ছে না। জোর ক'রে মনকে যত বেশী নত কত্তে চাই, মন তত বেশী ক'রে ঘাড় বাঁকিয়ে প্রতিবাদ করে। আমার পিতৃদেবের একটা গান আছে, —"কে আমায় পরিয়ে দিল প্রীতির এমন কণ্ঠমালা, এ যে, রাখ্‌তে নারি ফেলতে নারি, বল্ গো একি হল জ্বালা।" আমার আবস্থা তাই হ'ল। স্নেহ, ঋণ, কিছুই অস্বীকার কত্তে পাচ্ছি না। দেবাসুর-সংগ্রামে প্রাণ ক্ষতবিক্ষত হ'তে লাগ্‌ল। এ বিপদ থেকে আমার কি উদ্ধার নেই ? কোথায় যাই, কোথায় গেলে এই অপ্রার্থিত দীক্ষারূপ রাক্ষসীর হাত থেকে রক্ষা পাই। কেঁদে বুক ভাসিয়েছি,—"হে পরমেশ্বর, আমাকে রক্ষা কর, মহাপুরুষ ব'লে জগতে আমার কোনও পরিচয়ের প্রয়োজন নেই আমি কেবলি শিষ্যলোভাতুর হ'য়ে নিজেকে কপট শিষ্য সাজিয়ে বহু জনকে শিষ্য ক'রে অফুরন্ত ভণ্ডামি নিজের সঙ্গে করেছি। হে পরমাত্মা, আমাকে তুমি মুক্তির পথ ব'লে দাও। আমাকে তুমি রক্ষা কর।" পশুবলে বলাৎকৃতা রমণী যেমন ক'রে আর্ত্তনাদ করে, আমার প্রাণে তেমন হাহাকার, তেমন চীৎকার চলেছে। রেলে চড়ি, কেবল কাঁদি, পথ চলি, কেবল কাঁদি, নির্জ্জনে বসি, কেবল কাঁদি। হায়, আমার উপায় কি ? এ সূর্য্য-গ্রহণের কি রাহুমুক্তি নেই ? যে দীক্ষালাভকে আমার জীবনের পক্ষে আমি

নিষ্প্রয়োজন মনে করেছি, অপ্রার্থিত ভাবে তাই এসে প'ড়ে আমাকে এত অশান্তিতে দগ্ধ কর্ব্বে, একথা কে আগে জানত? হঠাৎ ভগবান্ মাতৃমূর্ত্তিতে আমার অন্তরে স্নিগ্ধ সাজে ফুটে উঠ্‌লেন। তখনি ট্রেন ধরলাম। ছুটে গেলাম সেই গৃহে, যেই গৃহ পরিত্যাগ ক'রে চ'লে এসেছি। গর্ভধারিণী জননী-দেবীর চরণে পতিত হয়ে কেঁদে বল্‌লাম,—"মা, আমাকে এই দীক্ষা-সঙ্কটে রক্ষা কর।" মা হেসে বল্লেন,—"ভয় কি, তুমি আমার চিরকালের মাতৃভক্ত সন্তান, আমি তোমার মনের কাঁটা খুলে দিব।" তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন, দক্ষিণেশ্বর। আমি গঙ্গাতীরে দাঁড়িয়ে এক গণ্ডূষ জল হাতে নিয়ে মহাপুরুষের দেওয়া আমার সেই অসহ্য মন্ত্র বহুবার জপ ক'রে চিরতরে তাকে জাহ্নবী-সলিলে বিসর্জ্জন দিলাম, যেন স্বপ্নেও সে আর আমাকে উৎপীড়ন না কর্ত্তে পারে। তার পরে মা আমাকে আমার প্রাণের আরাধ্য অখণ্ড মহামন্ত্র দিয়ে দিলেন। এই ভাবে প্রাণে আমার কতকটা শান্তি ফিরে এল। এখন বল ত', মা আমার গুরু কিনা? এ ভাবে মন আমার অনেকটা শান্ত হ'য়ে এসেছে, এমন সময়ে প্রেরণা পেলাম দশনামী সন্ন্যাসীর সম্রাট্ ও প্রণব মন্ত্রের সিদ্ধ সাধক মহামণ্ডলেশ্বর জয়েন্দ্র পুরীর চরণ দর্শন করার। অনেক অন্বেষণের পরে হরিদ্বারে তাঁর দেবদুর্লভ দর্শন লাভ হ'ল। এবার স্বেচ্ছায় তাঁর অনুগত হলাম। তিনি আবার আমাকে ঐ প্রণব মন্ত্রই শোনালেন। অন্য মন্ত্রদাতার প্রতি মনের যে বিদ্বেষ, যে শত্রুতার ভাব, যে আক্রোশ এসেছিল, তা এখন একেবারে দূর হ'য়ে গেল। প্রাণে শান্তি এল, অন্তরের উদ্বেগ গেল, দ্বিধা

আড়ষ্টতা পালাল। এল আমার তৃতীয় পর্ব্বের গুরুগিরি। লক্ষ্য এখন একমাত্র ওঙ্কার। সম্মুখে, পশ্চাতে, দক্ষিণে বামে ঊর্দ্ধে, অধোদেশে, দেহে, মনে, প্রাণে, আত্মায়, ভাষণে, গানে, জীবনের ইতিক্রমে আর স্বপ্নের বিলাসে, সব শুধু ওঙ্কার; দ্বিধাহীন দ্বন্দ্বহীন নিঃসংশয় ওঙ্কার। এখন বলত' বাবা, ইনি আমার গুরু হলেন কিনা ?

দীক্ষার প্রয়োজন ছিল না

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দীক্ষার প্রয়োজন ছিল না। ছিল প্রয়োজন সৎসঙ্গের, সদুপদেশের, সদুৎসাহের এবং সৎপ্রেরণার, —মন্ত্রদীক্ষার নয়। তবু কেমন ক'রে একটা দীক্ষা হ'য়ে গেল, তাই পর পর তিনটা দীক্ষা দিয়ে সকল ব্যাপারের হ'ল সংশোধন। এমন বিচিত্র ও দুঃখপূর্ণ যার দীক্ষা-জীবনের ইতিহাস, তার আবার গুরু-পরম্পরা কেন ? ব্রহ্মাণ্ডের সকলের জীবনই কি একটা নির্দ্দিষ্ট ধরা-বাঁধা গণ্ডীর ভিতর দিয়ে গতানুগতিক ভাবেই চল্‌বে ? এই গতানুগতিকতার শৃঙ্খল কেটে দেবার ক্ষমতা কি ব্রহ্মাণ্ড-পতির নেই ?

দীক্ষার লক্ষ্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমার নিজের জীবনের এই নিবিড় দুঃখ তোমাদের সম্পর্কে আমাকে বড় হুঁসিয়ার ক'রে দিয়েছে। এই জন্যই এখন আর আগের মত তোমরা দীক্ষার্থী হ'য়ে এলেই আমি উল্লসিত হই না। এই জন্যই আমি তোমাদের জিজ্ঞাসা করি, আমাকে পরীক্ষা ক'রে দেখ তোমরা নিঃসংশয়িত হ'য়েছ

কি ? যে-কোনও প্রকারে মহামন্ত্র কাণের ভিতরে ঢুকিয়ে দিতে রুচি পাই না। এই জন্যই তোমাদের প্রতিজনকে জিজ্ঞাসা করি, তোমরা পুরুষ হ'লে পিতামাতার, স্ত্রীলোক হ'লে স্বামী ও অভিভাবকদের অনুমতি নিয়ে এসেছ কিনা। এই জন্যই দীক্ষাদানের পরে তোমাদের প্রত্যেককে এই একটী কথা স্পষ্ট ক'রে ব'লে দিতে আমার কখনো ভুল হয় না যে, দীক্ষিত হ'য়েই অন্যান্য গুরুর শিষ্যরা যেমন ক'রে নিজেদের গুরু-ভাই ও গুরু-ভগ্নীর সংখ্যা বাড়াবার জন্যে আদা-জল খেয়ে লেগে যায়, তোমরা তেমন ক'রো না। তোমরা দল বাড়াবার জন্যে চেষ্টিত হবে না, একথা আমি অভ্রান্ত ভাষায় ব'লে দিই। সমগ্র জগৎ বরং অদীক্ষিত থাকুক, তবু যেন দীক্ষা নেবার পরে দ্বিধায়, কুণ্ঠায়, দ্রোহে, আর অশান্তিতে আমার মতন ক'রে আর কেউ দগ্ধ না হয়, এমন ক'রে অন্তরের জ্বালায় ছটফট কেউ না করে। দীক্ষার লক্ষ্য শান্তি এবং নিষ্ঠা,—সেই শান্তি, সেই নিষ্ঠাই যেন সবাই পায়।

গুরু-পরম্পরার তাৎপর্য্য

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —গুরু-পরম্পরার একটা বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। তা' হচ্ছে continuity of the same ideal ,—একই ধারার ও আদর্শের ক্রমাবগমন। তাই, তোমাদের গুরু-পরম্পরা-পরিচয় হবে, পরব্রহ্ম—অখণ্ডনাম—স্বরূপানন্দ। পরব্রহ্ম থেকেই অখণ্ড-নামের প্রকাশ, অখণ্ড-নামের আশ্রয়েই স্বরূপানন্দের বিকাশ। তোমরা অন্য কোনও গুরু-পরম্পরাই

স্বীকার ক'রো না। কেননা তা' কত্তে গেলেই তোমাদের আদর্শের মধ্যে বিরাট বিরাট সব ওলট-পালটের সৃষ্টি হবে এবং একমাত্র প্রণবমন্ত্রকে পরমোপাস্য জেনে সকল মতের সকল পথের সকল সাধকের জন্য একত্র মিলনের যে পবিত্র মঞ্চ তোমরা ধীরে ধীরে গ'ড়ে তুলছ এবং অতি সুনিশ্চিত ভাবে যে মঞ্চের সুদৃঢ় বিস্তার দিনের পর দিন হচ্ছে, তা' দেখ্‌তে না দেখ্‌তে তা' হ'লে ধ্বসে যাবে। অখণ্ডতত্ত্বের ভিত্তিতে সমগ্র ভারতেরই মাত্র নয়, সমগ্র এশিয়ারই মাত্র নয়, সমগ্র বিশ্বের নানা ভিন্নপন্থীকে যাতে তোমরা একত্র পেতে পার, তার জন্য তোমাদের সমবেত উপাসনাতে আমার প্রতিচিত্র বর্জ্জন কত্তে পর্য্যন্ত আমি নির্দ্দেশ দিয়েছি, আর প্রতিচিত্র যদি ব্যবহৃত হয়, তবে তারও ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টি ক'রে কৃতিত্বের দাবী তোমাদের জন্য নয়, সর্ব্বসম্প্রদায়কে এক স্থানে এনে মিলাবার কৃতিত্বের দাবীই যেন তোমরা কত্তে পার। তাই, তোমাদের গুরু-পরম্পরা-পরিচয় হচ্ছে,—পরব্রহ্ম—অখণ্ডনাম—স্বরূপানন্দ। অন্য কোনও গুরু-পরম্পরাই তোমরা স্বীকার কত্তে পার না, কেননা, তা' কত্তে গেলেই তোমাদের নানা বিষয়ে নানা আপোষ-রফার প্রয়োজন ও তাগিদ এসে যাবে, যাতে ক'রে তোমাদের সামগ্রিক আদর্শ টুক্‌রো টুক্‌রো হ'য়ে বিনাশ প্রাপ্ত হবে। কোনও সুবিধার প্রত্যাশাতেই তোমরা সেই আপোষের পথে পাদচারণা ক'রো না। সমূহের হিতের জন্য তোমাদের সাধনা, তোমাদের ত্যাগ সমগ্রের বিকাশের জন্য, তোমাদের মন্ত্র সমগ্রের মন্ত্র। তার নিষ্কলুষতা বজায় থাকা দরকার—

আমার কোনও জিদের মান রাখার জন্য নয়, সমগ্র ভারতের প্রাচীন সাধনার অস্তিত্ব রক্ষারই জন্য। চারিদিক থেকে বিকট মৃত্যু বিরাট মুখব্যাদান ক'রে আর্য্যসাধনাকে গ্রাস করার জন্য ছুটে আসছে। তোমাদের সৃষ্টি তাকে কার্য্যতঃ প্রতিরোধ ক'রে নিখিল বিশ্বকে অমৃতের আস্বাদন দেওয়ার জন্য, যে অমৃত এক জনে চাখতে গেলেই নিখিল বিশ্বকে ভাগ দিয়ে আস্বাদ কত্তে হয়, যে অমৃত বিতরণের কালে অসুর ব'লে কাউকে বঞ্চনা করা চলে না। তোমাদের সৃষ্টি বিরাট ঐতিহাসিক প্রয়োজনে, ব্যক্তির মুক্তিটুকুর জন্য নয়। তোমাদের সৃষ্টি সমষ্টির এক বিরাট বিপুল বিশ্বরূপ-ধারণের প্রয়োজনে, ব্যষ্টির ব্যক্তিগত তত্ত্বোপলব্ধির বা রসাস্বাদনের প্রয়োজনে নয়। তোমাদের প্রয়োজন বৃহৎ, তাই তোমাদের গুরুপরম্পরা পরব্রহ্ম থেকে শুরু, তাই তোমাদের গুরু পরম্পরার অখণ্ডনামের মধ্য দিয়ে বিকাশ।

শিবপুর
১৮ই চৈত্র, ১৩৪০

মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য

একজন প্রশ্ন করিলেন,—গৃহস্থদের কর্ত্তব্য কি ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মানুষ মাত্রের যা প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য গৃহস্থের তাই হবে প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। সেই কর্ত্তব্যটী হচ্ছে, সর্ব্বপ্রযত্নে মাতা ও পিতার সেবা করা। তাঁদের কাছে জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে যত প্রকারে ঋণী আছ, তা' কখনো তুমি পরিশোধ কত্তে সমর্থ হ'তে পার না। কিন্তু সেই অপরিসীম

ঋণ স্মরণ ক'রে মনে মনে অগাধ কৃতজ্ঞতা পোষণ ক'রে তাঁদের সেবা করার চেষ্টা কর। যাতে অন্য অন্য পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা নিজ নিজ পিতামাতার প্রতি সেবা-পরায়ণ হয়, তার জন্য যত্ন নেও। যাতে সকল দেশের সকল সমাজের বালক-বালিকারা নিজ নিজ পিতামাতাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর-ঈশ্বরী জ্ঞানে সমগ্র শক্তি নিয়ে তাঁদের সেবা করে, তার জন্য চেষ্টা কর, যত্ন কর, মনে মনে সুগভীর আকাঙ্ক্ষা পোষণ কর। এইটীই হচ্ছে মানুষ মাত্রের অতি শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য।

সন্ন্যাসীর পিতৃমাতৃ-সেবা

প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,—কিন্তু সন্ন্যাসী ত' পিতামাতার সেবার কোনও ধার ধারেন না!

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সমগ্র জগতের সেবাকে তাঁর লক্ষ্য-বস্তু করাতে তিনি সীমাবদ্ধ ভাবে নির্দ্দিষ্ট একটী পিতার ও নির্দ্দিষ্ট একটী মাতার সেবার অবসর পান না। কিন্তু তিনি যখন বিশ্বজগৎকে তাঁর পবিত্র সেবা উপহার দেন, তখন সেই সেবার ভাগ থেকে তাঁর পিতা বা মাতা বঞ্চিত হন না। সংসারের সাথে সকল সংশ্রব বর্জ্জনের প্রয়োজনহেতু তিনি যদিও তাঁর পিতাকে বা মাতাকে সেবা কত্তে অক্ষম হন, তথাপি তিনি কখনও মনে জ্ঞানে অকৃতজ্ঞ হ'তে পারেন না, এটা নিশ্চিত জান্‌বে।

কর্ত্তব্য পালনের মানে

প্রশ্নকর্ত্তা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—পিতৃমাতৃ-সেবার

পরবর্ত্তী কর্ত্তব্য গৃহস্থের কি হবে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই কর্ত্তব্য পালনের পরে সেই কর্ত্তব্য করবে, এমন কোনও ধারাবাহিক ক্রম কর্ত্তব্যের বেলায় থাকতে পারে না। জীবনের সবগুলি কর্ত্তব্যই একটার সঙ্গে অপরটাকে বিরোধ না এনে সামঞ্জস্যের ভিতর দিয়ে পালন ক'রে যাওয়ার নাম হচ্ছে কর্ত্তব্য পালন। সুতরাং পিতৃমাতৃ-সেবার আগে বা পরে কোনও কর্ত্তব্যের কথা বলা চলে না। বল্‌তে হয় যে, এই কর্ত্তব্য পালনের সঙ্গে সঙ্গে আর কি কি কর্ত্তব্য পালন গৃহস্থের পক্ষে অতিশয় প্রয়োজনীয়।

গৃহস্থ-জীবনের কর্ত্তব্য

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—গৃহস্থের জীবনে অতি গুরুত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য হচ্ছে, স্ত্রীর পক্ষে স্বামীকে আর স্বামীর পক্ষে স্ত্রীকে সর্ব্বতোভাবে ঈশ্বরানুগত করার চেষ্টা করা। তার পরের কর্ত্তব্যই হচ্ছে ঈশ্বরানুগত মন দিয়ে সংসারের সকল নিত্য, নৈমিত্তিক ও আগন্তুক কর্ত্তব্যগুলিকে গৌণ কর্ত্তব্য জ্ঞানে উদ্‌যাপন করা এবং সর্ব্বকর্ম্মের সাথে সাথে, সর্ব্ব কর্ম্মের ফাঁকে ফাঁকে অনুক্ষণ ভগবৎস্মরণ, ভগবচ্চিন্তন, ভগবদালাপন দ্বারা প্রাণে প্রেমভাবের উদ্দীপন করা। তৃতীয় কর্ত্তব্য সন্তান-সন্ততি এবং পোষ্য-বর্গকে সত্যধর্ম্মের অনুকূল জীবন যাপনের সুযোগ ও শিক্ষা দেওয়া, উৎসাহ দেওয়া, উদ্দীপনা দেওয়া। এই তিন কর্ত্তব্য যিনি পালন করেন, তিনি গৃহিকুলের তিলক স্বরূপ, জগতে তাঁর মতন ভাগ্যবান্ ব্যক্তি আর কেউ নেই।

সঙ্গীকে ঈশ্বরানুগত করিবার জন্য দম্পতীর কার্য্যক্রম

প্রশ্ন হইল,—স্বামী বা স্ত্রীকে ঈশ্বরানুগত করবার চেষ্টায় কার্য্যক্রম কি ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—স্বামী এবং স্ত্রীর পারস্পরিক ব্যবহারের যতগুলি অবস্থা আছে, তার প্রতিটীর মাঝে নিজে করবে ঈশ্বর-স্মরণ, আর তার পরে সঙ্গীকে করাবে ঈশ্বর-স্মরণ। স্বামী স্ত্রীর কাছে ও স্ত্রী স্বামীর কাছে যত অকপট, এমন অকপট জগতে আর কারো কাছে কেউ বোধ-হয় হয় না। তাদের এই অকপট সাহচর্য্যেও তারা ভগবানকে কেউ ভুলে থাকবে না, এক জন অপরকে ভগবান্ ভুলে থাকতে দেবে না, এমন যে পণ, তাই হচ্ছে, তাদের শ্রেষ্ঠ কার্য্যক্রম। কিন্তু এই কার্য্যক্রম কখনো সফল হ'তে পারে না, নিত্য স্বাধ্যায়ের অভ্যাস না থাক্‌লে। প্রতিদিন একত্র ব'সে দুজনে সামান্য কিছু কাল হ'লেও নিজের সাধনের অনুকূল, এমন ধর্ম্মগ্রন্থ অবশ্যই পাঠ কর্ব্বে, যাতে তাদের উভয়ের সম্পর্ক নিবিড়তর, গভীরতর হওয়ার সাথে সাথে প্রত্যেকের সম্পর্ক ভগবানেরও সাথে নিবিড়তর ও গভীরতর হ'তে থাকে।

দম্পতীমধ্যে একজন যদি অপরজনকে সহযোগ না করে, তাহা হইলে কি কর্ত্তব্য

প্রশ্ন হইল,—স্ত্রী কিম্বা স্বামী যদি তাহাতে সহযোগ না করে ?

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—আমি যদি 'আমি' না হতাম, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতাম যে, তাহলে স্ত্রী কিম্বা স্বামী তার স্বামী কিম্বা স্ত্রীর সঙ্গে সর্ব্বপ্রকার দাম্পত্য ব্যবহারে অসহযোগ কর্ব্বে। কিন্তু গৃহকলহ সৃষ্টি ক'রে আমি ধর্ম্ম-প্রচার করি না। তাই আমার জবাব হচ্ছে, যে সহযোগ করে না, তাকে সহযোগ কত্তে বাধ্য কত্তে হবে। যদি সত্যি কোনও স্ত্রী তার স্বামীকে ভালবাসে, যদি সত্যি কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে ভালবাসে, তাহ'লে তার পক্ষে স্বাধ্যায়ে সহযোগ করবার জন্য অতি সহজেই উপায় আবিষ্কার হ'য়ে যাবে। পৃথিবীতে দুইটী জিনিষের আবিষ্কার করার ক্ষমতা অসাধারণ, একটী জিনিষ হচ্ছে অভাব বোধ, অপরটীর নাম ভালবাসা।

প্রেম কিরে ভাই সহজ জিনিষ

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—

প্রেম কিরে ভাই সহজ জিনিষ,
প্রেমের বলে কিনা হয় ?
প্রেমের বানে যায়রে ডুবে
উন্নতশির হিমালয়।
পাষাণ গলে প্রেম-পরশে,
দগ্ধ মরু স্নিগ্ধ রসে,
চিন্‌তে পারে আপন জনে,
অন্তরে হয় পরিচয়;
দ্বন্দ্ব-বিভেদ দূর হ'য়ে যায়,

দূর হ'য়ে যায়, সকল ভয়।
সেই প্রেমেরই উপাসনা
করবে তোরে সিদ্ধমনা,
আপন জনায় কাছে টেনে
করবে রে তোর বুকে লয়,
দেখবি তখন বিশ্বভুবন
শুধুই যে তোর ইষ্টময়।

স্বামী ও স্ত্রী দুইটী আলাদা বস্তু নহে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—স্বামী আর তার স্ত্রী দুইটী আলাদা বস্তু নয়। তারা দুই জনে মিলে একটী বস্তু।

পত্নী পতি দুইটী ঘটে
দুইটী রূপে একই বটে,
বাইরে থেকে কেউ জানে না,
দু'জন মিলে একজনা,
তাই ত' তারা দুঃখ কুড়ায়
সুখের লোভে এক কণা।

শরীর ত' ভাড়াটে বাড়ী। যতক্ষণ ভাড়া চালাচ্ছ, ততক্ষণ এতে বাস কত্তে পাচ্ছ। ভাড়া টানা বন্ধ হ'ল ত' বাড়ীও ছেড়ে চলে যেতে হ'ল। ভাড়াও দেবে না, বাড়ীতেও বাস কর্ব্বে, এ কখনো দীর্ঘকাল চলতে পারে না। কিন্তু যে বাস কচ্ছ স্ত্রী-মূর্ত্তিধারী বাড়ীটাতে, স্বামীরূপধারী বাড়ীটাতেও সে-ই বাস কচ্ছ। ভাড়াটে মাত্র একজন, দুজন নয়। এই কথাটী অবিরাম চিন্তা

কত্তে কত্তে সত্যের আস্বাদন এসে যাবে। তখন তোমাদের সহজ স্বাভাবিক অপ্রাকৃত বিকারহীন প্রেমের প্রকাশ হবে। স্ত্রী তার স্বামীর দেহটীর মধ্যে নিজেকে কেবল খুঁজুক, স্বামী তার স্ত্রীর দেহটীর মাঝে নিজেকে কেবল খুঁজুক। অবিরাম অবিশ্রাম খুঁজতে খুঁজতে দুইজনের মধ্যেকার সত্য সম্বন্ধটী এক দিন হঠাৎ আবিষ্কার হয়ে যাবে। তখন তার সহযোগ-অসহযোগের কোনও প্রশ্নই আসবে না।

সত্য ধর্ম্ম

পুনরায় প্রশ্ন হইল, —সন্তানসন্ততিগুলিকে সত্য ধর্ম্মের অনুকূল শিক্ষা দেওয়ার কথা বল্‌লেন। কিন্তু সত্য ধর্ম্ম কি, তা কি ক'রে বুঝব।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —তুমি যে মানুষ, এ কথা যে ধর্ম্ম শিক্ষা দেয়, তাই হচ্ছে সত্য ধর্ম্ম। তুমি মানুষ বলেই অন্য মানুষের প্রতি তোমার কর্ত্তব্য মানুষোচিত হবে। তুমি মানুষ ব'লেই শ্রেষ্ঠ মানুষেরা যে সাধনা নিজ নিজ জীবনে ক'রে গেছেন, তার সঙ্গে তোমার জীবনের সাধনা অবিরোধী হবে। তুমি মানুষ ব'লেই অনাগত যুগের শত কোটি মানুষের ভবিষ্যৎ চিন্তা ক'রে তুমি তোমার অতি সাধারণ কাজগুলিও করবে। সেই শিক্ষা যেই ধর্ম্ম দেয়, তাই হচ্ছে সত্য ধর্ম্ম।

গার্হস্থ্যাশ্রমত্যাগীর কর্ত্তব্য কি

পুনরায় প্রশ্ন হইল, —গার্হস্থ্যাশ্রমত্যাগীর কর্ত্তব্য কি ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —ভগবৎসাধন ও ভগবন্নাম কীর্ত্তনের

দ্বারা আত্মকুশল সম্পাদন তাঁর প্রথম কর্ত্তব্য। দ্বিতীয় কর্ত্তব্য, অহঙ্কার ও আত্মাভিমান বিসর্জ্জন দিয়ে মানুষমাত্রকেই উন্নত আধ্যাত্মিক পথে বিচরণ কত্তে সহায়তা করা। তৃতীয় কর্ত্তব্য —নির্লোভ নির্লালস চিত্তে নিষ্কাম নিরুদ্বেগ মনে জীবকে ঐহিক ও পারত্রিক কুশলের সমন্বয়-সাধন কার্য্যে প্রোৎসাহিত করা। চতুর্থ কর্ত্তব্য, ব্যক্তিগত সুখের তৃষ্ণাকে সর্ব্বতোভাবে বিনাশ ক'রে নিখিল ভুবনের পরম সুখকে একমাত্র কাম্য জ্ঞান করা।

অখণ্ডগণের কর্ত্তব্য

শ্রীশ্রীবাবামণির বলিলেন,—মানুষ মাত্রেরই যাহা কর্ত্তব্য, অখণ্ড মাত্রেরও তাই কর্ত্তব্য। কারণ, অখণ্ডেরা সকলের আগে মানুষ। মানুষের প্রতি মানুষের যা কর্ত্তব্য, মানুষের প্রতি তোমাদের প্রতিজনের তাই কর্ত্তব্য। একথা একটী নিমিষের জন্যেও ভুলে যেও না। বৈষ্ণব যদি ভুল ক'রে ব'লে থাকেন যে, তাঁর কর্ত্তব্য আগে বৈষ্ণবের প্রতি, শাক্ত যদি ভুল ক'রে ব'লে থাকেন যে, তাঁর কর্ত্তব্য আগে শাক্তের প্রতি, খ্রীষ্টান যদি ভুল ক'রে ব'লে থাকেন, তাঁর কর্ত্তব্য আগে খ্রীষ্টানের প্রতি, মুসলমান যদি ব'লে থাকেন, তাঁর কর্ত্তব্য আগে মুসলমানের প্রতি, হিন্দু যদি ব'লে থাকেন, তাঁর কর্ত্তব্য আগে হিন্দুর প্রতি, অখণ্ড তা' হলে বলবে তার কর্ত্তব্য আগে মনুষ্য-মাত্রের প্রতি, তার পরে হবে গণ্ডীর বিচার। গৃহী অখণ্ডের কর্ত্তব্য আর উদাসীন অখণ্ডের কর্ত্তব্য বাবা প্রকৃত প্রস্তাবে একই। কে গৃহী, আর কে অগৃহী, সেই বিচার তোমাদের নিকটে প্রধান নয়। কে সত্যিকারের অখণ্ড,

সেইটীই একমাত্র লক্ষ্য করার বিষয় হবে।

প্রেম-প্রচারণ আর ঈশ্বর-তোষণ,
এই হবে অখণ্ডের চরিত্র-ভূষণ।
ঈশ্বর-ভজন লাগি' জগৎ-উদ্ধার,
জগৎ-উদ্ধার তরে আত্মার প্রসার।
আত্মসুখ পরসুখে করি' বিসর্জ্জন,
বিশ্বসুখ তাঁর পায়ে করিবে অর্পণ।

অখণ্ড-মাত্রেরই জান্‌বে এই হচ্ছে কর্ত্তব্য। প্রকৃত প্রস্তাবে মনুষ্য মাত্রেরই এই হচ্ছে কর্ত্তব্য।

হরিওঁ-কীর্ত্তনে বিশ্ববিপ্লাবন

ইহার পরে সমাগত জিজ্ঞাসুরা কিছুক্ষণ মাঠের মধ্যে বসিয়াই হরিওঁ কীর্ত্তন করিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি নিমীলিত নয়নে কীর্ত্তন শ্রবণ করিলেন।

কীর্ত্তন শেষ হইলে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—হরিওঁ, হরিওঁ হরিওঁ, হরিওঁ,—কি সুন্দর নাম। ওম্ মানে সবকিছু, হরিওঁ মানে হে হরি, তুমিই সব কিছু। কি মধুর নাম। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা বল্‌ছেন, শূদ্রকে কেন প্রণব শুনাচ্ছ ? বৈষ্ণবেরা বল্‌ছেন চারি যুগে আমাদের চারি নাম, এ নাম ত' সেই তালিকার মধ্যে নেই। কিন্তু সেই আপত্তির কি কোনও জবাব দেওয়ার প্রয়োজন আছে ? জবাব হচ্ছে, আরও বেশী ক'রে হরিওঁ নাম কীর্ত্তন করা। বিরুদ্ধতা করাই যাঁদের লক্ষ্য, তাঁরা যুক্তি শুনেও কি মান্‌বেন ? ব্রাহ্মণদের যদি বল, বেদেই শূদ্রকে বেদে অধিকার

দেওয়ার কথা আছে, তা হ'লে তাঁরা শুনেও মান্‌বেন না। বৈষ্ণবদের যদি বল যে, তাঁরা যেই চারি নামকে চারি যুগের ব'লে বর্ণন ক'রে থাকেন, সেই চারিটী নাম বেদে চারি যুগের নাম ব'লে কীর্ত্তিত হয়-ত' হয় নাই, বেদেই আছে হরিওঁ, তাই আসুন কলহে কাজ কি, আপনারাও আসুন, আমাদের সাথে হরিওঁ কীর্ত্তন করুন। বিচার, যুক্তি, তর্ক, শাস্ত্রের বচন নিয়ে মারামারি কত্তে গিয়ে এদের কাউকে বশ মানাতে পার্ব্বে না। কিন্তু অবিরাম প্রাণ ভ'রে মন ভ'রে প্রেম সহকারে হরিওঁ কীর্ত্তন ক'রে যাও, বিশ্বভুবন-মিলনকারী এই মহানাম সকলকে একঠাঁই এনে জড় ক'রে দেবে। যুক্তির জবাব যুক্তি নয়, কাজ। শাস্ত্র-বিচার যেখানে নিজ নিজ সংস্কারকে সমর্থন করার জন্যই হয় প্রয়োজিত, সেখানে শাস্ত্র-বচনের জবাব শাস্ত্র-বচন নয়, তার জবাব হচ্ছে কাজ। এক দিন সব বিরুদ্ধবাদীরা এসে এই হরিওঁ নাম কীর্ত্তন ক'রেই প্রেমে হাবুডুবু খাবেন, কিন্তু তারা তা' জানেন না, তাই বিরুদ্ধতা। ঐরাবত কি ভাগীরথীর ধারাকে ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছিল ? সে নিজেও বরং সেই স্রোতে ভেসে গেল। সমগ্র জগৎ ভাসিয়ে দেবার জন্য এই নামের পুনরবতরণ হয়েছে। আমার নিজের কোনও মহত্ত্বে নয়, একমাত্র পরম গুরুর ইচ্ছায়। ভারতে, ভারতের বাইরে সমগ্র পৃথিবীতে এই নামের তরঙ্গ উঠ্‌বে, যাঁদের বল ম্লেচ্ছ, যাঁদের বল বিধর্ম্মী তাঁরাও এসে এই নামের ভিতরে নিজ নিজ ইষ্টকে খুঁজে পাবেন। জোর ক'রে নয়, জবরদস্তির ফলে নয়, কৌশলবিস্তারের মহিমায় নয়, প্রেমের বলে এই মহানাম সকল মানবের হৃদয়ে তাঁর

আসন ক'রে নেবেন। সমগ্র মানবজাতির মহামিলনের এই মহামন্ত্র নিজের রাস্তা নিজে কেটে নেবেন। সেই শুভদিন দূরে নয়। প্রেম-বারিধি দিকে দিকে তার উদ্বেল তরঙ্গরাজিকে উত্তাল-নর্ত্তনে নিক্ষেপ সুরু করেছেন। তোমরা তা' দেখ্‌তে পাচ্ছ না।

ঘুরিলাম কত দিগ্‌দেশ

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবামণি মৃদুকণ্ঠে আবৃত্তি করিলেন,—

ঘুরিলাম কত দিগ্‌দেশ,
কত যে বেদনা বুকে বিঁধিল শেলের মত
কহিয়া না হয় তার শেষ।
সুধাইনু কত জনে, "বলিতে কি পারো গো,
আমার প্রাণের প্রিয় কৈ"
সবাই কহিল—"জানি, আসো কাছে আরো গো,
তবে ত' তাঁহার কথা কই!"
কাছে গিয়ে দেখি হায়, সকলি শুধু কথায়,
যত বেশী দিন যায়, তত কথা বেড়ে যায়,
প্রাণের আকূতি কেহ বুঝিল না লেশ—
ঘুরিলাম, ঘুরিলাম, শুধু দেশ ঘুরিলাম,
সীমাহীন সে পথ অশেষ।
গায়ে কাঁটা, পায়ে কাঁটা, কত চলে পথ হাঁটা,
কত চলে বৃথা খাটা, কেবলি বিকার ঘাটা ?
মতামতে হাতাহাতি, হানাহানি দিবারাতি,
দেখিতে নয়নে বাজে ক্লেশ,

ইহারি লাগিয়া কিগো তেয়াগি সুখের নেশা
পরিয়াছি বিরাগীর বেশ ?
ছাড়িলাম ছুটাছুটি, পায়ে পায়ে লুটাপুটি,
ধরিলাম চাপি' মুঠি তোমার চরণ দুটি ;
অযাচিত করুণায় জাগিলে দীন হিয়ায়,
সকল ব্যথার হল শেষ ;
বুঝিলাম রেখেছিলে আমারে তোমারি কোলে
আঁখি-প্রহরায় অনিমেষ।

শুধু একজন

উল্লিখিত গানটী বারংবার আবৃত্তি করিবার পরে শ্রীশ্রীবাবামণি অন্য একটী গান আবৃত্তি করিলেন,—

শুধু এক জন, ওরে,
শুধু এক জন,
দিবানিশি করে মোর
হৃদয়ে রমণ।
সকলের প্রাণ-রূপে
সতত যে থাকে রে,
সকলেরে সতত যে
নিজ বুকে রাখে রে,
সকলের সব ব্যথা,
বেদনা ও কাতরতা
নিজের আঁচল দিয়া
সতত যে ঢাকে রে,

সেই এক জন শুধু
সেই এক জন,
আমার নয়ন-কোণে
ভুবন-মোহন।
প্রতি নামে যাঁর নাম,
প্রতি গানে যাঁর গান,
প্রতি ধামে যাঁর ধাম,
প্রতি প্রাণে যাঁর প্রাণ,
নিখিল ভাবের মাঝে
যিনি ভাষাচয়,
নিখিল ভাষার সাজে
যিনি ভাবময়,
সেই এক জন শুধু,
সেই এক জন,
দেহ মন প্রাণ মোর
করিল হরণ।
তাঁরি গুণ-গানে হাসি,
তাঁরি গুণ-গানে রে,
নয়নের জলে ভাসি
তাঁরি প্রেম-বানে রে,
যাঁর টানে ভ্রমি আমি
বিপুল ভুবন।
শুধু সেই জন, ওরে
শুধু সেই জন,

আমারে ভুলাল মোর
জীবন-মরণ।

সবারে ভুলিয়া তোমারেই যেন

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবামণি গাহিলেন,—

সবারে ভুলিয়া তোমারেই যেন
জানি জীবনের সার,
সবারে ফেলিয়া তোমারেই যেন
দেই জীবনের ভার।
যখন দেখিরে তুফানের তোড়ে
জীবনের মূল নড়িচে সজোরে,
ভুলি না যেন সে বিপদের ঘোরে
অভয় পদ তোমার,
বিপত্তি যত বাড়িবে তোমারে
স্মরিব বারংবার।
বিঘ্ন যখন গেল গো কাটিয়া
সান্ত্বনা এল প্রাণে,
তখন যেন গো ধরণী ভাসাই
তোমার মধুর গানে ;
তোমার অসীম গুণ-গরিমায়
নিখিল ভুবন যেন ছেয়ে যায়,
ছোটবড় সবে শুনিবারে পায়.

তুমি কত আপনার,—

সকল সময়ে চির-বান্ধব

তুমি ছাড়া নাহি আর।

গানের ছন্দে সুরের মন্দ্রে

হৃদয়ের পারাবার

উচ্ছ্বসি' উঠি' ডুবাইয়া দিবে

জগতের হাহাকার।

সবারে বিলাবে স্বাধীন জীবন

দানিবে আত্মচেতনার ধন,

পরম প্রেমের সুখাস্বাদন

বিতরিবে চারি ধার,

ভাঙ্গিবে সবার দীর্ঘ দিনের

তমসার কারাগার।

সবারে করিবে সবার আপন,

সবারে করিবে হৃদয়ের ধন,

ভেদবিচ্ছেদ চূর্ণিয়া সবে

করিবে যে একাকার,

একের মূরতি সবার আননে

ফুটিবে, সে কি বাহার!

ওঙ্কার-ঘন উজ্জ্বল-বরণ

নয়নে প্রতি জনার!

শিবপুর (কুমিল্লা)
১৯ শে চৈত্র, ১৩৪০

তোমারে খুঁজিয়া মরি

রাত্রি এখনও এক ঘণ্টার উপরে আছে। শ্রীশ্রীবাবামণি নিজ শয্যায় জাগ্রদবস্থায় উপবিষ্ট। এমন সময় বাহিরে আড়ালে কি রকম একটা শব্দ হইল, তিনি নিঃশব্দে বাহির হইলেন। দেখিলেন, বেড়াতে মাথা রাখিয়া একটী তরুণ যুবক কাঁদিতেছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি জিজ্ঞাসা করিলেন,—ব্যাপার কিরে ?

তরুণ বলিলেন,—আমি আপনাকে চাই, আপনাকে ছাড়া আমার জীবন আর চলে না, আপনাকে না পাওয়া পর্য্যন্ত আমার জীবন মিথ্যা।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—আয় কাছে আয়, আমার বুকের কাছে আয়।

তরুণ শ্রীশ্রীবাবামণির বক্ষঃসংলগ্ন হইলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দেখ্ বাবা, তোরই মাঝে তুই হ'য়ে আমি নিরন্তর বাস কচ্ছি। বাইরে আমাকে খুঁজে কি হবে ? তোর ভিতরে তুই আমাকে খোঁজ্। খুঁজলেই পাবি।

তরুণ বলিলেন,—আমার ভিতরে খুঁজে আমি কিছুই পাচ্ছি না। আমার ভিতরে একেবারে শূন্য! আমি নিজেকে একেবারে রিক্ত ক'রে দিয়েছি।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তাতেও কিছু ভাববার নেই। ঐ রিক্ততার মাঝেই ভগবানের পরমকরুণায় অভিষিক্ত পূর্ণতার

সিংহাসন। ঐ শূন্যের মাঝেই তাঁকে খোঁজ, যিনি পরমপূজ্য, পরমপূর্ণ। খুঁজলেই পাবি। যে খোঁজে, সেই পায়। যোগ্যতার অযোগ্যতার বিচার নেই, যে চায়, তারই কাছে তিনি ধরা দেন।

তরুণ শান্ত হইলেন। মাইল দেড়েক দূর এক গ্রাম হইতে গভীর নিশীথে তিনি আসিয়াছিলেন, অরুণালোকে পথঘাট আলোকিত হইবার আগেই তিনি গৃহে ফিরিলেন।

যতদূর দৃষ্টি চলে, শ্রীশ্রীবাবামণি বালকটির পানে তাকাইয়া রহিলেন, পরে নিজে নিজে আবৃত্তি করিলেন,—

তোমারে খুঁজিয়া মরি নিখিল ভুবন ভরি'
তবু হায় দেখা নাহি পাই,
আমারি ভিতরে তুমি আমি হ'য়ে দিবাযামী
বিরাজিছ, খোঁজ তার নাই।

শোণিত কি ভালবাস

প্রাতঃস্নান সমাপন করিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি আত্মকার্য্য করিলেন, তাহার পরে পত্র লিখিতে বসিলেন। এক জনের পত্রের উত্তরে লিখিলেন,—

"ভগবানের সহিত আমার সম্বন্ধের কথা জানিতে চাহ ? তাহা আমি ভাষায় বর্ণনা করিব কি করিয়া ? তাহার বিচিত্রতাও অদ্ভুত। কি যে তাঁহার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ নহে, তাহাই বরং বলা কঠিন। ঠিক এই মুহূর্ত্তে আমি তাঁহাকে নিয়া যাহা ভাবিতেছি, নিম্নে লিখিতেছি। তাহা হইতে যদি কিছু বোঝ, ত' বুঝিবে। বুঝাইবার ভাষার অভাব বোধ হইতেছে।"

"শোণিত কি ভালবাস,
নাকি ভালবাস অশ্রু-জল ?
বল বল বল নাথ,
তাই আমি দিব অবিরল।
"আঘাতে আঘাতে যবে
কাঁদি আমি বিষণ্ণ ব্যথায়,
দর দর দর বেগে
রক্তধারা শুধু বয়ে যায়,
অশ্রু মিশে তার সাথে
সৃষ্টি করে গঙ্গা-যমুনায়,
তৃপ্ত হয় তুষ্ট হয়
তখন কি তব চিত্ত-তল ?
"শুকুনিরা মাংস-খণ্ড
চঞ্চু দিয়া ছিন্ন ভিন্ন করে,
অন্তরাত্মা কাঁপি' ওঠে,
থরথরি অজানিত ডরে,
আশ্রয় দেখিনা কোথা
খুঁজি, সারা বিশ্ব চরাচরে,
তোমার অন্তরে জাগে
তখনি কি হাস্য খল-খল ?
"তাই যদি ভালবাস
বলনা গো স্পষ্ট ভাবে মোরে,
তোমারি লাগিয়া দুঃখ

সহিয়াছি যৌবনে কৈশোরে,
তোমারি লাগিয়া আমি
বরি' নিব মৃত্যু মহাঘোরে,
দুঃখরাশি দিব পায়ে
যেন প্রস্ফুটিত পুষ্পদল।

"তাঁহার জন্যই আমার অবিরাম হৃৎপিণ্ডের রক্ত-ক্ষরণ, তাঁহারই জন্য আমার নিখিল জগতের সকল দুঃখ-বরণ, তাঁহারই এক কণা তৃপ্তিতুষ্টির জন্য আমার অনন্ত কাল ধরিয়া বেদনার পসরা মাথায় বহিয়া অন্তহীন অনিশ্চিত দুঃখযাত্রা,—ইহাই আমার চিত্তের সুখ। নিজের সুখের জন্য আমি কিছুই চাহি না, —তবু তাঁহাকে সুখী না করিয়া আমার নিস্তার নাই। তাঁহাকে সুখী করিবার সংস্কার আমার রক্তমাংস-মেদ-মজ্জায় ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত হইয়া আছে।

"ইহা হইতে যদি সম্বন্ধ আবিষ্কার করিতে পার, করিও। নিজে আর ইহার অধিক বাগ্‌বিন্যাস করিতে পারিতেছি না।"

আমার মূর্ত্তিরে দিবি পূজা

অপর একখানা পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি একটী কবিতা লিখিয়া পাঠাইলেন। নিম্নে তাহা উদ্ধার করা হইতেছে।

আমার মৃত্যুর পরে আমার মূর্ত্তিরে দিবি পূজা,
এই কিরে অভিলাষ মোর ?
তারি লাগি' সারা জন্ম অবিশ্রাম পথে পথে খোঁজা
"কোথা তুমি মম মনচোর ?"

তারি লাগি' জাগিয়াছি বিরহ-অনলে জ্বালি' প্রাণ
কাঁদি' সারা নিশি করি' ভোর,
তিতিয়াছে বক্ষ মম, তিতিয়াছে শয্যা উপাধান
তবু থামে নাই আঁখিলোর ?
চতুর্দ্দিকে যক্ষরক্ষ মৃত্যুভয় দেখাইতে হায়
ধরিয়াছে কি মূর্ত্তি কঠোর,
তারি সঙ্গে সঙ্গে দেখি বিস্তারিয়া মোহিনী মায়ায়
কত জন পাতিয়াছে ক্রোড়।
কত না ঐশ্বর্য্য আর কত না সম্পদরাশি দিয়া
ভুলাইতে চেয়েছে আমারে,
হুহুঙ্কারে ফিরায়েছি পদাঘাত মস্তকে হানিয়া,
প্রলোভন কি করিতে পারে ?
এত বীর্য্য, সে কি শুধু প্রকাশিনু এই ভাবি হায়,
মোরে মূর্ত্তি পূজি' সবিস্তারে
আমার আসল লক্ষ্য চিরতরে যেন ডুবে যায়
উন্মাদের বাহ্য আড়ম্বরে ?
আমি চাহি বিশ্বপতি একাসনে হবেন মিলিত
বিশ্বভরা লইয়া সবারে,
ছোট বড় ভেদাভেদ সব কিছু করিয়া চূর্ণিত,
কেহ যেন বাদ নাহি পড়ে।
সবারে লইয়া মোর হবে এক পূজা-আয়োজন,
বিশ্বময়ী আমার অর্চ্চনা,
কেহ নাহি তুচ্ছ ভবে, সকলেরে মোর প্রয়োজন,

হিমাচল কিম্বা বালুকণা।
কেহ নাহি ছোট, তাই সবারে জানিয়া সুমহান,
তারে আনি' করিব বন্দনা,
সবার ভিতরে ব্রহ্ম লভিবেন অপূর্ব্ব উত্থান,
তবে আমি হব সিদ্ধমনা।
কিবা সার্থকতা আছে ঘটা করি' মোরে পূজিবার
যদি না হল সে আরাধনা,
যাহার লাগিয়া আমি আসিয়াছি ভবে বারংবার
কিন্তু শুধু লভেছি বঞ্চনা ?
কত জন জগতের কত ভাবে প্রতিষ্ঠা লভিল,
কত ভাবে পাইল অর্চ্চনা,
কত ভাবে বৈতালিক কত সুরে বন্দনা গাহিল,
কত তার বিচিত্র মূর্চ্ছনা,
কত অলঙ্কারে কত ছন্দে কত শব্দ-যাদুকর
মহাকাব্য করিল রচনা,
মুখরিত মধু-রসে বিদগ্ধের সাহিত্য-বাসর
বিচারিয়া বাক্যের ব্যঞ্জনা,
শব্দে শুধু শব্দ বাড়ে ;—তৃপ্তি কোথা প্রাণমন-ভরা,
সর্ব্বাত্মার কোথা সে সাধনা
মৃত্যুময় মর্ত্ত্যভূমে নামাইয়া আনিতে অমরা,
বিদূরিতে মর্ম্মের বেদনা ?
ছোট যারা চিরকাল ছোট হ'য়ে পড়িয়া থাকিবে
সবলের চরণের তলে,

চিরকাল নত হয়ে অনুক্ষণ পদধূলি নিবে
দিবারাত্রি সবে দলে দলে ;
যাঁর চেয়ে উচ্চ নাই, তাঁরে' করি' নিত্য অনুধ্যান
মায়াময় অসার ভূতলে
ব্রহ্মময়ী সত্তা লভি' জাগিবে না বিনাশি' অজ্ঞান
আপনার বজ্রবাহুবলে,
গর্জ্জিবে না রুদ্রসম মিথ্যারে করিতে ভস্মীভূত
উপলব্ধ সত্যের অনলে,—
তার মাঝে মোরে পূজা শঙ্খ-ঘণ্টা করি' আন্দোলিত
বল, বল, কেমনে তা' চলে ?

আমারে পূজিতে চাহ ? পূজ ঐ দরিদ্র ভিক্ষুকে
কটিতটে বস্ত্র নাহি যার,
সমবেদনার কথা বলিবার কেহ নাহি দুখে,
অন্ন বিনা নিত্য হাহাকার,
সারা দিন পথে পথে ব্যাকুল হইয়া ঘুরি' মরে
কেহ কি বুঝিবে দুঃখ তার,
ভরসাবিহীন নেত্রে দৃষ্টি দেয় প্রতি ঘরে ঘরে
কিন্তু হায়, দেখামাত্র সার,
দরিদ্র দেখিয়া রুদ্ধ হয়ে যায় মুক্তবাতায়ন,
রুদ্ধ হয় উন্মুক্ত দুয়ার,
সবার বান্ধব আছে, তার শুধু বান্ধব শমন,
বন্ধুহীন নিখিল সংসার।

আমারে পূজিতে চাহ ? পূজ ঐ পলিত-মস্তক

দন্তহীন গলিত-চর্ম্মেরে,
আশাহত চক্ষু যার সবারে জানিয়া প্রবঞ্চক
মুখ হ'তে মুখান্তরে ফেরে,
একদা যাপিত যার জীবন কি মহাপরাক্রমে
গেছে সব কুগ্রহের ফেরে,
স্মরণ করিলে তাহা অন্তরের আহত সম্ভ্রমে
বেদনার বোঝা যায় বেড়ে,
সহিয়া তাহার যত দীর্ঘ আর কবোষ্ণ নিঃশ্বাস
পার ভুলাইতে অতীতেরে ?
সত্যই সনাথ সে যে, নহে নিরাশ্রয়, এ আশ্বাস
দিতে পার বৃদ্ধ অনাথেরে ?
আমারে পূজিতে চাহ ? ঐ চলে সঙ্কুচিতা বালা
ভবিষ্যৎ নাহিক যাহার,
অন্তরে গোপন করি' অন্তরের পূঞ্জীভূত জ্বালা
দুশ্চিন্তার নাহি পারাপার ;
সংসারের সকলেরে হৃদয়ের সরল বিশ্বাসে
জানিয়া বান্ধব আপনার
লভিয়াছে হলাহল তাহাদের নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে,
সর্ব্বসুখ হল ছারখার ;
ভালবাসিয়াছে যারে অভিন্ন-জীবন মনে জানি'
প্রাণমন করিয়া উজাড়,
তারি কপটতা আজি বক্ষে নিদারুণ বজ্র হানি'
সর্ব্বনাশ করিয়াছে তার।

আমারে পূজিতে চাহ ? মাতৃহীন অবোধ শিশুরা
বুভুক্ষায় কেঁদে নিদ্রা যায়,
জেগে দেখে পালে পালে পথচারী ক্ষুধার্ত্ত পশুরা
আবর্জ্জনা-স্তূপ পানে ধায়,
তাহাদের সঙ্গে করি' ঠেলাঠেলি আর মারামারি
পর্য্যুষিত অন্ন খুঁটি খায়,
চতুর্দ্দিকে অতি তীব্র কি উৎকট দুর্গন্ধ বিস্তারি'
তাই গিলে পেটের ক্ষুধায়,
অতিশ্রমে অবসন্ন দেহখানি দেয় এলাইয়া
অপবিত্র সেই মৃত্তিকায়,
অনাতিথ্যে অনাদরে কারো বিন্দু স্নেহ না পাইয়া
চক্ষু মুদে অনন্ত নিদ্রায়।

আমারে পূজিতে চাহ ? ওই দেখ সদ্যোজাত কত
কচি কাঁচা মানব-সন্তান,
সর্ব্বাঙ্গ কর্দ্দমে লিপ্ত, রুধিরাক্ত তারি নাভি-ক্ষত,
ঝাড়ে ঝোপে কন্টক-শয়ান,
মাংসলোভী পিপীলিকা দলে দলে ঘিরিয়াছে তারে
আছে বুঝি কণ্ঠাগত প্রাণ,
তৃষ্ণায় উঠিছে হিক্কা, চীৎকার করিতে নাহি পারে,
এখনি সে করিবে প্রয়াণ,
ধরণীর যাত্রা-পথে পদক্ষেপ করিবার সাথে
বিয়োগান্ত বিদায়ের গান
জোর করি গাওয়াইল জনক-জননী নিজ হাতে

এমনি রে নিষ্ঠুর পাষাণ।

আমারে পূজিতে চাহ ? ইহাদের মধ্যে থাকি' আমি
আশা-প্রত্যাশায় বুক বাঁধি,
প্রদোষে মধ্যাহ্নে সারা উষায় সন্ধ্যায় দিবাযামী
তোমার সেবার লোভে কাঁদি;
তুমি আসি' স্নেহ-হস্তে ঘুচাইবে যন্ত্রণা আমার
বুঝাইবে নহি অপরাধী,
ব্রহ্ম আমি সর্ব্বঘটে বদ্ধ হ'য়ে রচেছি সংসার
এ আমার উপাধির ব্যাধি,
সর্ব্বভূত—অন্তরাত্মা সবার আত্মীয় হ'য়ে আমি
যেই দিন সকলেরে বাঁধি
আমার বক্ষের সাথে, সেই দিন সকলের স্বামী
হ'য়ে আমি নিজেরে আস্বাদি।
আমারে পূজিতে হ'লে এত জনে পূজা দিতে হয়,—
এত জনে করি' অর্ঘ্যদান,
তৃপ্ত করি' তুষ্ট করি', বিদূরিয়া দুঃখ সমুদয়,
স্নিগ্ধ করি' এতগুলি প্রাণ,
এতগুলি ব্যথিতের ক্ষুধিতের অনাথের তরে
সৃষ্টি করি' আশ্রয়ের স্থান,
স্বার্থপর ইহমুখ প্রত্যেকটী মানুষের ঘরে
সজ্জিত করিয়া অন্ন-পান,
এই সব অনাদৃত নারায়ণে মহাসমাদরে
প্রেমভরে করিবে আহ্বান,—

তার পরে মোর পূজা-মহোৎসব করিবার তরে
যত পার হ'য়ো আগুয়ান্।
যাঁহার আত্মীয় বলি' বিশ্বজোড়া যে আছ যেখানে
সবাই আত্মীয় হল তোর,
তাঁহার আত্মার সাথে যুক্ত করি' দিতে মনে প্রাণে
আজি তোর কর্ত্তব্য কঠোর;
সবারে ডাকিয়া কাছে টানি' আনি' বক্ষের উপরে
ভাঙ্গি' দিবি তার নিদ্রাঘোর ;
আর কত ঘুমাইবে, জাগৃত উষা বিশ্ব ভ'রে ;
জীবে জীবে বাঁধি' প্রেমডোর,
সবারে সবার আজি আত্মীয় করিয়া নিতে হবে,—
তবে যত দুঃখ হবে দূর,
প্রেমোচ্ছ্বাসে মিলি' সবে উৎসবের মহাকলরবে
তবে হবে আনন্দ প্রচুর।

দীক্ষা, গুরু ও দীক্ষার বাজার

অপর একজন পত্র-লেখকের পত্রের জবাবে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—"তুমি দীক্ষালাভের জন্য ব্যাকুল হইয়াছ দেখিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। অধিকাংশ সাধকেরই পক্ষে দীক্ষালাভ ভগবানকে পাইবার জন্য অত্যাবশ্যক ব্যাপার। এই জন্যই ভারতের প্রায় ধর্ম্মগুরুরাই দীক্ষার মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং প্রায় সকল মতাবলম্বী সাধকের পুরাণকথাতেই বিশেষ বিশেষ উল্লেখযোগ্য সাধকদের কিভাবে দীক্ষা লাভ হইবার

পরে ভগবল্লাভ হইয়াছিল, তাহার বিস্তারশঃ বর্ণনা দেখা যায়। তাঁহারা যেই উদ্দেশ্যে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সহিত আমার মতামতের কোনও বিশেষ বিরোধ নাই। কিন্তু আমি অতিরিক্ত একটা কথা তোমাকে বলিতে চাহি যে, দীক্ষা না নিয়াও যদি তুমি একনিষ্ঠ প্রযত্নে ভগবানকে একই নিয়মে একই রীতিতে একই অধ্যবসায়ে বৎসরের পর বৎসর যুগের পর যুগ ডাকিয়া যাও, তাহা হইলে ভগবান্, দীক্ষা পাও নাই বা নাও নাই বলিয়া, তোমাকে উপেক্ষা করিবেন না। তোমাকে উদ্ধার করা, তোমাকে দর্শন দেওয়া, তাঁহার স্নেহের কোলে তোমাকে তুলিয়া লইয়া বিগতমোহ করা যে তাঁহারই নিজের এক বিরাট প্রয়োজন। সেই প্রয়োজনের তাগিদেই তিনি খেলায় খেলায় এই জগদ্ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া বসিলেন। তাই দীক্ষা নেওয়াটার উপরে অত বেশী গুরুত্ব আরোপ না করিয়া তাঁহাকে ডাকার উপরেই যাবতীয় গুরুত্ব আরোপ কর। তাঁহাকে ডাকাটাকেই প্রধান বলিয়া জান। তাঁহাকে ডাকা না-ডাকার উপরেই যে সব নির্ভর করিতেছে, তাহা জানিয়া, দীক্ষা পাও নাই বলিয়া মনের যে অবসাদ আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা দূর কর।

‘‘আরো একটা বিষয়ে আমি তোমাকে খোলাখুলি কয়েকটা কথা বলিতে চাহি। আমার নিকটেই তোমাকে দীক্ষা লইতে হইবে, ইহার কোনও মানে নাই। আমা অপেক্ষা যোগ্যতর মহত্তর উন্নততর মহতের সাক্ষাৎকার পাওয়া তোমার পক্ষে সম্ভব কিনা, তাহা দেখ এবং তাহার জন্য যত কাল সঙ্গত, প্রতীক্ষা বা পর্য্যটন কর। যাঁহাকে দেখিলাম, তাঁহারই কাছ

হইতে একটা দীক্ষা নিয়া বসিলাম, যাঁহার নাম লোকমুখে খুব শুনিলাম, তাঁহারই পিছে পিছে দীক্ষার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইলাম, ইহা এক মারাত্মক সৌখিনতা। জগতের অনেককে এই সখের মাশুল বড় কড়া হাতে গণিয়া গণিয়া দিতে হইয়াছে। আমাকে দেখিয়া তোমার ভাল লাগিয়াছে বলিয়াই আমি তোমার গুরু হইবার যোগ্য, ইহা তোমাকে কে বলিল? আমার মুখের কথায় বড়ই মধু, ইহার জন্য তুমি আসিয়া আমার শিষ্য হইবে, ইহা কোন্ দেশী সদ্‌যুক্তি? বিবাহ করিবার আগে যেমন পাত্র বা পাত্রীকে মানুষ বহুবার বুঝিতে চেষ্টা করে এবং একটা ভুল সম্পর্ক স্থাপন করিয়া শেষে না জীবন ভরিয়া অনুতাপের যন্ত্রণায় কাঁদিতে হয়, তাহার জন্য যতটা সম্ভব সতর্ক হয়, দীক্ষার ব্যাপারে তেমন অথবা তাহার শতগুণ সতর্কতার প্রয়োজন। আমাকে ভাল লাগে, ভক্তিশ্রদ্ধা করিতে ইচ্ছা করে, বেশ ত' যত ইচ্ছা ভক্তি শ্রদ্ধা কর। হুট করিয়া আমাকে একেবারে গুরুর আসনে বসাইয়া দিয়া তাহার পরে মনকে কেবলই আঁখি-ঠার দিয়া দিয়া শাসন করিয়া চলিতে হইলে, তাহার বিপদ কিন্তু কম নহে।

"সাধারণতঃ আমি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া থাকি। শেষ রাত্রিতে জাগিয়া কাজ করা আমার আট বছর বয়স হইতে অনুশীলিত অভ্যাস। নিদারুণ ভ্রমণাদি ক্লেশে পিষ্ট না হইলে সাধারণতঃ গ্রামের কোনও লোকই আমার আগে শয্যাত্যাগ করেন না। শেষরাত্রে উঠিয়া যখন পূর্ব্বাকাশের পানে তাকাই আর প্রায়োদ্‌ভিন্ন উষার সৌন্দর্য্য উপভোগ করি, তখন সকলের

আগে আমার যে কথাটা মনে হয়, তাহা হইতেছে এই যে, পথ-প্রদর্শন করিতে গিয়া যেন কাহাকেও সংশয়ে না পরিচালিত করি। পৃথিবীতে গুরুর অভাব নাই। তাহার প্রধান কারণ এই যে, তোমাদের ন্যায় দীক্ষার্থীরও অভাব নাই। দীক্ষা প্রার্থনার চাহিদা খুব বেশী, তাই দীক্ষাদানের দোকানও সাজিয়াছে সহস্র সহস্র। কিন্তু কে বিচার করিয়া দেখিয়াছে যে, দীক্ষাদাতা সকল সময়েই দীক্ষাপ্রার্থীর মঙ্গলের জন্যই দীক্ষাদান করিতেছেন, না, অনেক সময়ে তিনি অপরের উপরে অনায়াসে কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার আগ্রহেই লোককে দীক্ষা দান করিবার সুযোগগুলির সদ্ব্যবহার করিতেছেন ? যখন দেখি, একই সন্ন্যাসী-গুরুর দুই শিষ্য বা একই গৃহি-গুরুর দুই পুত্র একই ব্যক্তিকে বা একই পরিবারের লোকগুলিকে নিয়া টানাটানি করিতেছে, তখন দীক্ষাদাতার উদ্দেশ্য-মধ্যে নীচ স্বার্থপরতা ছাড়া আর কিছু আছে বলিয়া বিশ্বাস করিব কি করিয়া ? যখন দেখিতে পাই যে, একই ব্যক্তিকে বা পরিবারকে দীক্ষিত করিবার জন্য একই সঙ্গে তথাকথিত গুরুদেব আর তথাকথিত শিষ্যের মধ্যে "টাগ্-অব-ওয়ার" বাঁধিয়া গিয়াছে, তখন ইহাকে নিছক ব্যবসায় ছাড়া আর কি নাম দিব ? তোমাদের কাহারই দীক্ষা ছাড়া কিছুতেই ভগবদ্দর্শন হইবে না বলিয়াই ভগবানকে পাওয়াইয়া দিবার বাজারে এত দালালি। একজন মহাপুরুষ কাহাকেও দীক্ষা পালটাইয়া নূতন করিয়া তাহাকে দীক্ষা লইতে বাধ্য করিলেন। কেন ? না, তাহা না হইলে যে এই ব্যক্তির ভগবদ্দর্শন হইবেই না। শিষ্য আসিয়া দুদিন আগে যাহাকে দীক্ষা দিয়া গিয়াছেন,

গুরুদেব নামে পরিচিত মহাপুরুষ আসিয়া সব জানিয়া শুনিয়া তাহাকে ধরিয়া আবার আর একটা মন্ত্রে দীক্ষা দিয়া গেলেন। কেন না, জীবোদ্ধারই ত' তাঁহার সুমহৎ ব্রত। সমগ্র ভারত জুড়িয়া এই কাণ্ড চলিতেছে। মহাপুরুষ শিষ্য-দেব যাঁহাকে দীক্ষা দিয়া গিয়াছেন দুদিন আগে, মহাপুরুষ গুরু-দেব আসিয়া তাঁহারই পুত্র-কন্যাদের দীক্ষা দিয়া দিয়া নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়া এবং সম্পত্তির চৌহদ্দী বাড়াইয়া গেলেন। এ কথা তিনি বলিতে পারিলেন না, তোমাদের গুরুদেব আসিলে তাঁহার কাছ হইতেই দীক্ষাটা নিয়া নাও। কেহ বা ভয় প্রদর্শন করিয়া, কেহ বা প্রলোভন দেখাইয়া, কেহ বা মধুর বচন বলিয়া, কেহ বা শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করিয়া, কেহ বা নিজ জীবনের অসাধারণ অলৌকিক ব্যাপার সমূহ নিজে বলিয়া বা অনুগত জনদের দ্বারা বলাইয়া, কেহ বা দেশ-বিদেশ ভ্রমণের কৃতিত্বে গর্ব্বগরিমা জাহির করিয়া, কেহ বা নিজ গুরুদেব বা পিতৃদেবের মহিমা গাহিয়া গাহিয়া এ ভাবে অপরের শিষ্যকে নিজের শিষ্য করিবার জন্য অসাধারণ অধ্যবসায় প্রয়োগ করিতেছেন। ইহারই নাম দীক্ষার বাজার।

"তুমি সেই বাজারে ঢুকিয়া যাইতেছ। শোণপুরের মেলায় গরু কিনিতে গিয়া যেমন করিয়া ক্রেতা নাস্তানাবুদ হয়, দীক্ষার বাজারে দীক্ষা পাইতে গিয়াও শিষ্যের তেমন প্রতি পদে নাস্তানাবুদ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। তাই আমি বলি, দীক্ষা কাহার কাছ হইতে নিবে, তাহা এখনই স্থির করিয়া ফেলিবার দরকার নাই। সেই ভগবানের জন্য তোমার দীক্ষা হয়ত প্রয়োজন, তাঁহাকে

বারংবার কাতর প্রাণে প্রাণের নিবেদন জানাইতে থাক, তোমার প্রতিক্ষার ফলে তোমার সর্ব্বাভীষ্ট প্রপূরক যেন তোমার কাছে এমন ভাবে আসিয়া আবির্ভূত হন, যাহার পরে আর দ্বিধাদ্বন্দ্বের কোনও অবসর থাকে না। দীক্ষা নেওয়াটা খুব বড় কথা নয়, দীক্ষা নিবার আগে সাধন করিবার জন্য নিজেকে সর্ব্বতোভাবে তৈরী করিয়া রাখাই বড় কথা। ক্ষেত্রে বীজ বপনের চেয়ে বড় কথা হইতেছে, বীজটী বপনের পরে যাহাতে সত্যই অঙ্কুরিত হইতে পারে, তেমন ভাবে তাহাকে হলকর্ষণ করিয়া, পাট করিয়া, নিষ্কন্টক করিয়া, নিস্তৃণ করিয়া রাখা।

"দীক্ষা আমি কত হাজার লোককে দিয়াছি, আরও কত লক্ষ লোককে হয়ত দিব। তাই তোমাকে দীক্ষা দিয়া ফেলাটা আমার কাছে একটা কঠিন ব্যাপার নয়। কিন্তু দীক্ষা নেওয়াটা তোমার পক্ষে অহিতকর না হয়, সত্যই দীক্ষা তোমার জীবনের পরম সম্পদ আহরণের সহায়ক হয়, তাহারই জন্য আমার দুশ্চিন্তা অধিক। আমার বরং দুই চারি হাজার শিষ্য কম হইল, তথাপি যেন আমার কাছে আসিয়া শেষে কেহ অনুতাপের অশ্রুধারায় বক্ষ না সিক্ত ক'রে!

"আমি বড় সরল মনে, বড়ই অকপট অন্তরে তোমার নিকটে সকল কথা খুলিয়া বলিলাম। ইহা হইতে কোনও অনাবশ্যক দুঃখ আহরণ করিও না।"

গুরুগিরির উল্লাস ও দায়িত্ব

এই পত্রে শ্রীশ্রীবাবামণি আরও লিখিলেন,—

``এ প্রশ্ন অবশ্যই তুমি করিতে পার যে, হাজার হাজার লোককে যিনি দীক্ষা দিয়াছেন তিনি তোমারই দীক্ষার প্রসঙ্গে কেন এত কথার অবতারণা করিতেছেন। তাহার জবাব এই যে, এক দিন দীক্ষা দিতে গিয়া কতই না উল্লাস অনুভব করিতাম, সে কথা আমার স্মরণে জাগিয়া আছে। দীক্ষা নিয়া শিষ্য সাত্ত্বিক হইল কিনা, তাহার অপেক্ষা আমার নিজের তৃপ্তি কতটা হইল, তাহাই আমার বেশী লক্ষ্য করিবার বস্তু ছিল। মন্ত্র নিয়া শিষ্য আমাকে মানিবে কিনা, আমাকে গুরু বলিয়া অন্তরে উপলব্ধি পাইল কিনা, তাহা অপেক্ষা আমি যে তাহার গুরু হইলাম, ইহাই আমার অধিকতর তৃপ্তিপ্রদ হইত। যদিও সেই দিনও ছল বল কৌশলের দ্বারা কাহাকেও শিষ্য করিবার জন্য চেষ্টা করি নাই, তথাপি কেহ যদি কাণের কাছে আসিয়া পরামর্শ বা ইঙ্গিত যোগাইত যে, একবার একটা লোকের কাণে কোনও প্রকারে একটী মন্ত্র ঢুকাইয়া দিতে পারিলেই, আজ না হউক কাল, সে অনুগত হইবেই হইবে, তাহা হইলে সেই উপদেশ, ইঙ্গিত বা পরামর্শকে একেবারে গ্রহণের অযোগ্য বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করিয়া দিবার মতন মনোভাব আমার ছিল না। গুরুগিরি করিয়া আমি হইতাম উল্লসিত, শিষ্য নামধারী ব্যক্তিগণের মনের অবস্থা কি হইত, তাহা আমার জানিবার প্রয়োজন ছিল না। সেই যুগ ভগবানের কৃপায় অতি তাড়াতাড়িই অতিক্রান্ত হইয়া চলিয়া যায়। তাহার পর হইতে আমি দীক্ষাদানের মধ্যে আমার নিজের উল্লাসকে আর খুঁজিয়া দেখি নাই, দেখিয়াছি দীক্ষিতের অন্তরের উল্লাসকে। তাই সেদিন হইতে বলিতে সুরু

করিয়াছি, দলে দলে তোমরা দীক্ষা নিতে ত' আসিয়াছ, তোমরা আগে নিজেদের প্রকৃত কুশল কোথায়, তাহা বিচার করিয়া ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখ। ইহার ফলে কত জন আমার দোকানে তৈরী মাল থাকিতেও আমার দিতে অনিচ্ছা দেখিয়া অন্য দোকানে গিয়া পেট ভরিয়া মিঠাই সন্দেশ খাইয়াছে, অন্যত্র দীক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে আমি মনে কোনও বেদনা অনুভব করি নাই। গুরুগিরির দায়িত্ব আমাকে অধিকতর ধীরগামী করিয়াছে। অনেকের মনোভাব এইরূপ দেখা যায় যে, তাঁহার দ্বারা যদি জগতের উদ্ধার না হয়, তবে তিনি জগতের উদ্ধার চাহেন না। আমার মনোভাব ইহার বিপরীত। আমার দ্বারা যদি জগতের উদ্ধার না হইয়া অন্য শত শত অপর ব্যক্তির দ্বারাও হয়, তাহা হইলে আমি সেই শত শত ব্যক্তির নিকটে অন্তরে অন্তরে চিরকৃতজ্ঞতার বাঁধনে বদ্ধ থাকিব। জগতের উদ্ধারই আমার প্রয়োজন, আমি নিজেই ব্যক্তিগত ভাবে তাহার নিমিত্ত হইলাম কি না, ইহা আমার নিকটে অতি তুচ্ছ কথা. তাই আমি তোমাদের দীক্ষা নিতে আসিবার আগে শতবার পরীক্ষা, প্রতীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ করিতে নির্দ্দেশ দিতে আনন্দ পাই। সরলতার পথকে আমি জানি প্রকৃত নিরাপত্তার পথ। আমি তাই তোমাদের কাছে সরল মনে সকল কথা লিখিলাম।''

গুরুমূর্ত্তি-ধ্যানের ভিত্তি কোথায়

উক্ত পত্রে শ্রীশ্রীবাবামণি আরও লিখিলেন,—

''দীক্ষা নিবার পরে, গুরুদেব তোমাকে মুখে বলিয়া দিন

আর না দিন তোমার দেশের সাধনগোষ্ঠী-সমূহের বহু-শতাব্দী-সঞ্চিত স্বাভাবিক সংস্কার-বশে তোমাকে শ্রীগুরুমূর্ত্তি ধ্যান করিতে হইবে। আমি বলিব, আমাকে ধ্যান করিও না, অন্য একজন গুরুদেব বলিবেন, তাঁহাকে ধ্যান করিতেই হইবে, এই যে গুরুদেবের উপদেশের মধ্যে পার্থক্য, তাহাতে দীক্ষাপ্রাপ্ত সাধকের সাধনসিদ্ধির পথে গুরুধ্যানের আবশ্যকতার পার্থক্য হইবে না। গুরুমূর্ত্তি-ধ্যান গুরুদত্ত নামে নিষ্ঠাবর্দ্ধনের এতই সহায় যে, অনেক অতি কঠোর যুক্তিবাদী গুরুও শেষ পর্য্যন্ত এই ব্যাপারটায় নিজেদের মতামতের গোঁড়ামি পরিহার করিয়া শিষ্যকে গুরুমূর্ত্তি ধ্যানে প্রশ্রয় দিয়াছেন। সমাজ-সংস্কারমূলক আন্দোলনের মুখে সাময়িক পত্রে সংস্কারকেরা যত কড়া কড়া নিবন্ধ প্রবন্ধই এই সম্পর্কে লিখিয়া থাকুন না কেন, তাহা দ্বারা প্রকৃত সাধকদের উদগ্র যাত্রাপথের কোনও পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারেন নাই। অর্থাৎ ইচ্ছায় অনিচ্ছায় গুরুমূর্ত্তিধ্যানটা প্রকাশ্যে বা গোপনে প্রতিটি সাধন-গোষ্ঠীর মধ্যেই রহিয়া গিয়াছে। এই একটী মাত্র খুঁটির জোরেই প্রতিটী নূতন পুরাতন ধর্ম্মসাধনগোষ্ঠী নিজের পরিপুষ্টি সাধন করিয়া যাইতেছে। এই একটী মাত্র খুঁটির জোরে ডাণ্ডাধারী দীক্ষাদাতারা ঘরে ঘরে যাইয়া জোর করিয়া লোককে দীক্ষা দিয়া যাইতেছেন এবং মনে মনে আশ্বস্ত হইতেছেন যে, আজ কিম্বা দশ বৎসর পরে গুরুর মূর্ত্তিটী ইহাকে ধ্যান করিতেই হইবে। এই একটী মাত্র খুঁটির জোরে স্থানে স্থানে প্যাণ্ডাল সাজাইয়া বিরাট হোমযজ্ঞাদির আয়োজন করিয়া লোককে আকৃষ্ট করিয়া সাধু দর্শনার্থীকে ভিতরের ঘরে পাঠাইয়া সঙ্গে সঙ্গে আচম্বিতে

তাহার কর্ণে এক মন্ত্রফুৎকার করিয়া দিয়া বলিয়া দেওয়া হইতেছে,—'দীক্ষা তোমার হইয়া গেল'। ভারতের কোনও কোনও প্রদেশে ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীরা সরলা নিরীহ গ্রাম্য-বালিকার হাত ধরিয়া টান দিলেই যেমন সে মনে করিয়া বসে যে, তাহার সেখানেই বিবাহ হইয়া গিয়াছে, ঠিক তেমনি এই ভাবে মন্ত্র দেওয়া হইয়া গেলেই শতকরা নব্বই জনেই মনে করিয়া বসে যে, তাহার দীক্ষা সত্যই বুঝি হইয়া গেল। ইহাই হইতেছে ইহাদের খুঁটি। একবার মনে যদি ছাপ পড়িয়া যায় যে, দীক্ষা হইয়াছে, তাহার পর হাজার হও তুমি নাস্তিক বা সন্দেহবাদী, একদিন না একদিন গুরুদেবটীর মূর্ত্তি তোমাকে ধ্যান করিতেই হইবে। ইহাই ইহাদের খুঁটি। এই জন্যই ভয়প্রদর্শন, প্রলোভন-বিস্তার, কৌশলাবলম্বন ইত্যাদি কোনও উপায়কেই ইঁহারা অসদুপায় মনে করেন না। আমার পূণ্যশ্লোক পিতামহের গৃহে এক সাধুবেশী অতিথি আসিয়া মাসাধিক কাল অন্নধ্বংস করার পরে একদিন খাইতে বসিয়া আবদার ধরিলেন যে, আমার খুল্লতাত যদি না সস্ত্রীক তাঁহার কাছ হইতে দীক্ষা নেন, তাহা হইলে তিনি অন্নগ্রাস গ্রহণ করিবেন না। খুল্লতাত হাসিয়া বলিলেন,—'বেশ ত, দীক্ষা নিব। আহার ত' আগে করুন।' তিনি আহার করিয়া উঠিবার পরে খুল্লতাত তাঁহার বিছানাপত্র ও অন্যান্য জিনিষ সব রাস্তায় নিয়া রাখিয়া আসিয়া তাঁহাকে বাহিরে নিয়া বলিলেন,—'আর এ গৃহে নহে, অন্যত্র যাও।' কিন্তু অতিথিকে খুশী করিবার জন্যও যদি দীক্ষা সেখানে নিতেন, তাহা হইলে একদিন না একদিন তাহার মূর্ত্তি ধ্যান

করিবার মতন প্রয়োজনবোধ আসিয়া যাইত। বিবাহে যেমন বালিকার সম্মতি নেওয়া সঙ্গত, দীক্ষাতেও তাহাই। কিন্তু অসম্মতিতেও বিবাহ দিয়া দিলে বালিকা যেমন তাহা বাধ্য হইয়া মানিয়া লয়, দীক্ষার ব্যাপারে ভারতীয় মনে সেই রকম একটা বদ্ধমূল দুর্ব্বলতা রহিয়া গিয়াছে, যাহার সমর্থনে যুক্তির জোর কিছুই নাই, আছে প্রথার দাসত্ব। আবার গুরুমূর্ত্তি ধ্যানে নিষ্ঠা আসে, এই অকাট্য সত্যটীকে উড়াইয়া দেওয়া যায় নাই বলিয়াই গুরুদেবেরা শিষ্যদের উপরে অপ্রতিহত ক্ষমতা লইয়া বিরাজও করিতেছেন। এই একটি মাত্র কারণেই বারংবার বলা হইয়াছে যে, নাম, নামী ও নামদাতা এই তিনে মিলিয়া এক, একই এই তিনটীতে বিভক্ত হইয়া প্রপঞ্চের জগতে শিষ্যকে ভবপারের ভেলা ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছেন। এই জন্যই বলা হইয়াছে, গুরুতে মানুষবুদ্ধি করার মতন অপরাধ নাই, তাঁহাকেই ইষ্ট, অভীষ্ট, পরমেষ্ট, সর্ব্বাধিপতি এবং ইহ-পর জীবনের সর্ব্বস্ব বলিয়া জানিতে হইবে।

‘‘দীক্ষা একটা নিতে গেলেই এই সকল অবস্থা আসিয়া পড়ে। সবল প্রবল তেজস্বী মন এই সকল আরোপিত কথার সহিত বাস্তবের যতক্ষণ না মিল পায় ততক্ষণ অস্বীকার করিবার চেষ্টা করে, ইহা লইয়া তাহার মনে বিষম কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের সূচনা হয়, অন্ধকারে লড়াই করিতে গিয়া নিজেরই অস্ত্রাঘাতে নিজে ক্ষতবিক্ষত হইয়া যখন সে সংগ্রামের সামর্থ্য হারায়, তখন মনকে প্রবোধ দিয়া বলে যে, প্রমাণিত না হইলে কি হয়, উহাই প্রকৃত সত্য, অতএব আমি বৃথাই এতকাল যুদ্ধ করিয়া

করিয়া হয়রাণ হইলাম, এখন আমার বিনা সর্ত্তে আত্মসমর্পণই কর্ত্তব্য। বাস, ইতি হইয়া গেল, দেশপ্রচলিত গুরুবাদের বিজয়-ডঙ্কা চারিদিকে বাজিয়া উঠিল, একজন এইরকমের পাষণ্ড দলন করিয়া গুরুদেব লোক-মহিমার উত্তুঙ্গ শৈলশৃঙ্গে আরোহণ করিলেন, আর এই একটী বিষয়ে পরাজয়ের ইতিবৃত্ত জলে স্থলে অন্তরীক্ষে গানে, কবিতায়, কাহিনীযোগে প্রচার করিয়া করিয়া সুকণ্ঠ চারণের দল নিজেদের সঙ্কীর্ণ সাধনগোষ্ঠীকে জগন্ময় বিস্তারের প্রয়াস পাইল।

"ইহাই অবস্থা।

"তাই তুমি দীক্ষা চাহিয়াছ বলিয়াই আমি বলিতে পারি না যে, এস, দীক্ষা লইয়া যাও, বা আমার অবসর যখন হইল না, তখন অন্য কোথাও গিয়া দীক্ষা-কার্য্যটী যেমন তেমন করিয়া সারিয়া ফেল। তোমাকে প্রতীক্ষা করিতে, আত্মপরীক্ষা করিতে এবং শ্রীভগবানের করুণামুখাপেক্ষী হইতেই বলা আমি কর্ত্তব্য বলিয়া অনুভব করিতেছি।"

বেলারাণীর গল্প

সর্ব্বশেষে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"একটী গল্প বলিলে তোমার জানিবার বিষয়টুকু তুমি সহজে হয়ত ধরিতে পারিবে। বেলারাণী বড় চমৎকার স্বভাবের মেয়ে, সকলেই তাহাকে ভালবাসে। কেহ তাহাকে একটী গোলাপফুলের মালা দিয়াছে, কেহ দিয়াছে চমৎকার একখানা দর্পণ, কেহ এক জোড়া সোণার দুল, যাহা কাণে কেবল দোলে আর মনে

করাইয়া দেয় কে ইহা দিয়াছে। একজন আসিয়া সব চেয়ে বড় জিনিষটার খোঁজ দিল, বরের সন্ধান দিল, বেলার বিবাহ ঠিক হইল। কন্যাযাত্রীদের দ্বারা পরিবেষ্টিতা হইয়া বেলা বিবাহের আসরের দিকে যাইতেছে, তখন সেই ভালবাসার জনদের একজন বলিয়া বলিল, —'ওগো বেলা, আমার দিকে একটীবার তাকাও, আমিই কি তোমার বক্ষোভিলম্বী সুরভি ফুলমালাটী দেই নাই উপহার ? তোমার যে অত সুবাস আজ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে, তাহার জন্য আমি কি নহি কৃতিত্বের অধিকারী ?' বেলা বলিল,—'হইতে পারে তোমার কাছে আমার ঋণ অপরিসীম কিন্তু আমি আজ ছুটিয়াছি বরের সন্ধানে, আমি আর তোমার পানে তাকাইতে পারি না, আমার বিবাহের লগ্ন বহিয়া যাইবে যে!' একটু না যাইতেই আর একজন আসিয়া বলিল,— 'বেলা গো বেলা, আমাকে চিনিতে পারিতেছ না ? আমার দেওয়া দর্পণখানায় রোজ তুমি তোমার সুন্দর মুখখানা শতবার দেখিয়া কত পরিতৃপ্তি পাও। তুমি যে সুন্দরী, তাহা আমি না হইলে তোমাকে বুঝাইয়া দিত কে ? নিজেকে অত সুন্দরী জানিয়াছিলে বলিয়াই না আজ তুমি অতি সুন্দর বর পাইবার জন্য ছুটিয়া চলিয়াছ ! এজন্য কি আমার কৃতিত্বের দাবী কিছুই নাই ?' বেলা বলিল,—'হয়ত তোমার সব কথাই অবিকৃত সত্য, কিন্তু আমার বর আমার জন্য কত কাল অপেক্ষায় বসিয়া থাকিবেন ? আমি চলিলাম, তোমার পানে তাকাইবার আমার অবসর নাই।' দুই পা অগ্রসর না হইতেই আর একজন আসিয়া বলিল, —'বেলা, ও বেলা, অত ছুটিবার প্রয়োজন নাই, আমার

দিকে একবার তাকাও, আমিই তোমাকে বরের সন্ধান দিয়াছি, আমি না বলিলে তাঁহার নাম-গোত্র-বংশ পরিচয় তোমাকে কে দিতে পারিত ? একটু থাম, অত তাড়াহুড়ার প্রয়োজন কি গো, একবার আমার মুখপানেই তাকাইয়াই দেখনা যে, তোমার বর আর আমি একই কি না ?' একথার কি উত্তর দিতে হয়, বেলা তাহা জানে না। বেলার মতন আরও কত মেয়েকে বর-সন্ধানী ভদ্রলোকেরা এই কথা বলিয়াছেন, কিন্তু কেহই ইহার উত্তর দিতে সাহস পায় নাই। যে কথার উত্তর ইহার আগে কেহ কোথাও দেয় নাই, সে কথার উত্তর চট্ করিয়া বেলাই বা দিতে পারিবে কি করিয়া ? কিন্তু তথাপি সে গতানুগতিক-পন্থী মেয়ে নয়। যে বরকে সে কখনো দেখে নাই, যে বরের নামটীও এই মাত্র সে শুনিল, তারই প্রতি তাহার অন্তরের সমস্ত অভিলাষ প্রধাবিত। সে থামিল না। জবাবও দিল না। পথ চলিতেই লাগিল। কিছু দূর যাইতেই বেলা দেখিল,—একটী বয়স্কা মেয়ে-মানুষ আসিয়া পায়ে গড় করিয়া প্রণাম করিল। বলিল,—পেন্নাম হই মা-ঠাক্রুণ, ধন্যি দেশের মেয়ে আমাদের ঘর পুণ্যিময় করিতে আসিয়াছে। আমি হইলাম কিনা, তোমার এই বরের বাড়ীর চাকরাণী। দাসী বল, ঝি বল, আত্মীয়া বল, অভিভাবিকা বল, মাসীমা বল, পিসীমা বল, আমিই এবাড়ীর সব কিনা ! কত্তাবাবু আমাকে কত স্নেহ করেন। এস না মা-ঠাক্রুণ, একটু খানি বসো না, একটু নরম গরম দুটি চারটি প্রাণের কথা কই !' বেলা হাসিয়া বলিল,—'তুমি এ বাড়ীর কে, তাহা আমি আগে জানিব কি করিয়া ? বাড়ীর যিনি মালিক, আগে তাঁর সাথে

হউক পরিচয়, তাহার পরে সকলের পরিচয়ই আস্তে আস্তে পাইব। এখন আমাকে পথের মাঝখানে দেরী করাইও না ভাল মানুষের মেয়ে।' কিছুক্ষণ না যাইতেই আর একজন বলিল,—'ওগো বৌদি, তুমি আমাকে চেন না বুঝি ? আমি যে তোমার ননদ গো ! এস না ভাই, একটু আমোদ-আহ্লাদ করি।' বেলা হাসিয়া বলিল,—'হয়ত তুমি মিথ্যা বল নাই, কিন্তু ভাই, আমার ত' বরের সাথে এখনো কোনও সম্পর্কই স্থাপন হইল না। আগে তাঁর কাছে যাই, আগে তাঁকে পাই, আগে তাঁর সোহাগে সোহাগিনী হই, তারপরে না তোমাদের কাহার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক, তাহার নির্ণয় হইবে।' বেলা কেবলি চলিতে লাগিল। একটু দূরে যাইতেই একটী সুশ্রী সুকান্ত যুবক আসিয়া বলিল,—'ও বৌদি, তুমি আমাকে একেবারে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতে চাও ? এস না বৌদি, দশ মিনিট একটু দশ-পঁচিশ খেলি। তারপরে তুমি দাদার কাছে যাইও। আমি দাদার ছোট ভাই। আমাকে প্রথম দর্শনেই একেবারে বিমুখ করিও না বৌদি। দাদার কাছে গেলে ত' একটীবারের জন্য আমাদের পানে তাকাইবে না। তাই, অতি মিনতি করিয়া বলিতেছি, বৌদি, একটীবার আমার কথা রাখো না।' এইবার বেলার মনে আশার রশ্মি ফুটিয়া উঠিয়াছে। তবে সে বরের কাছাকাছি নিশ্চয়ই আসিয়াছে। এতক্ষণ পথে পথে নানা জনের নানা কথায় কেবলই তাহার সংশয় ও উদ্বেগ বাড়িয়া চলিতেছিল। সে অধরে সরস হাসি ফুটাইয়া বলিল,—'এখন আর সময় নষ্ট করিও না লক্ষ্মী ভাইটি আমার, বরের কাছে আগে যাই, তাঁকে আগে পাই, তারপরে

তিনি নিজেই আমাকে তোমার সঙ্গে দশ-পঁচিশ খেলিবার জন্য পাঠাইয়া দিবেন। তার জন্য ভাবনা করিও না ভাই। আমি ত' পরের মেয়ে, তুমি তাঁর আপন ভাই। তোমার কিসে শান্তি, তোমার কিসে আনন্দ, তার দিকে তাকাইয়া তিনি নিজেই তোমাকে ডাকিয়া পাঠাইবেন তাঁর আর আমার সাথে দশ-পঁচিশ খেলিবার জন্য। এখন রাস্তা ছাড় লক্ষ্মী ভাই!'

''বেলারাণীর বর অন্বেষণের এই গল্পটীর সহিত নিজের জীবনটী মিলাইয়া দেখ। হয়ত আমি যাহা বলিতে চাহিতেছি, তাহার কতক বুঝিতে পারিবে।''

পরোপদেশে পাণ্ডিত্যং

মানভূম-বলরামপুর-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

''পরকে উপদেশ দিবার বেলা আমরা নিজেদিগকে এত উচ্চস্থানে নিয়া বসাই যেন জীবনে আমরা কোনও ভুল, ত্রুটী, অপরাধ করি নাই এবং যাহাকে উপদেশ দিতে যাইতেছি, জগতের যত অন্যায় ও অসৎ-কার্য্য সেই ব্যক্তিটীই করিয়া বসিয়াছে। ফলে, আমাদের উপদেশ হয় নীরস ও প্রাণহীন এবং উপদিষ্ট ব্যক্তি তাহা প্রতিপালনের জন্য অন্তরে কোনও আকর্ষণ অনুভব করে না। অপরকে উপদেশ দিবার সময়ে নিজেকে যদি উপদিষ্ট ব্যক্তির সহিত তুল্যমূল্য জানিয়া হিতবাণী প্রদানে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে উপদেশের মধ্য হইতে অনাবশ্যক পাণ্ডিত্য ও অনর্থক অভিমান আপনা আপনি দূরীভূত হইয়া

যায়। ইহার ফলে তাহাকে উপদেশ দিতে বসিয়া আমি নিজেকেই উপদেশ প্রদান করি এবং তাহার উন্নতি-সাধনের সঙ্গে সঙ্গে আমার নিজেরও উন্নতি সাধিত হয়। ভুল-ভ্রান্তি-অপরাধে বারংবার পরিক্লিষ্ট হইয়া পরিশেষে যে আমার নিকটে আসিয়াছে উদ্ধারের পথ জানিতে, তাহাকে উদ্ধার করা যে আমার আত্মোদ্ধারের সহিত সমার্থক, এই কথাটুকু যদি জানি, তবেই আমার অন্তর ও বাহির হইতে সকল অভিনয়ের আড়ম্বর পলায়ন করিতে বাধ্য হইবে। জগৎকে উদ্ধার করিবার উচ্চাশা ভাল, কিন্তু সেই জগতের মধ্যেই যে আমি বাস করিতেছি, এই কথা মনে রাখিয়া। সাহিত্যিক-উচ্ছ্বাসে কাব্য-রচনা সম্ভব হইতে পারে, সেই বাক্যে রসোচ্ছলতাও যথেষ্ট থাকিতে পারে, কিন্তু সবার সহিত আমার আর জগৎ-পতির সহিত সকলের সন্নিধি না যদি অনুভূতিতে জাগে, তবে তাহা সাহিত্য-পদবাচ্য হইবে না। সহিতের ভাবকে বলা হয় সাহিত্য। কাহার সহিত তুমি নিজেকে এক বলিয়া অনুভব করিয়াছ যে, তোমার উপদেশ-রাশিকে সাহিত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া নিব? জগৎ-পতির সহিত নিজেকে না মিলাইতে পার, অন্ততঃ জগতের সহিত মিলাও। আলাদা থাকিও না। সমগ্র জগতের সহিত না পার, অন্ততঃ জগতের সেই সকল দুঃখদীর্ণ দৈন্যশীর্ণ চিরদুর্ব্বল নরনারীর সহিত নিজের পরিপূর্ণ সন্নিধি প্রতিষ্ঠা কর, যাহারা স্বভাবেরই বশে তোমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। উচ্চাসনে বসিয়া আড়ম্বরের বাহুল্যে তুমি অতি সরল কথাকে অতি অসাধারণ করিয়া বলিতে পার, কিন্তু যাহার শ্রবণে ঢালিবার জন্য বলিতেছ, তাহার প্রাণে তাহা প্রবেশ

করিবে না। পাণ্ডিত্য সন্মাননীয়, কিন্তু ইহাই সবকিছু নহে। ভুল তুমিও করিয়াছ, আমিও করিয়াছি। তুমি ভুল করিয়া সংশোধনের উপায় জানিবার জন্য কাঁদিয়া আসিয়া আমার কাছে পড়িলে, আর আমি আমার ভুল সংশোধন না করিয়া তোমাকে উপদেশের পর উপদেশ প্রদান করিলাম। উপদেশের কপালে এই দুর্ভাগ্য ছিল বলিয়াই এই জগতে কত জনেই কত জনকে কত উপদেশ দিল, কিন্তু কেহ কাহারও উপদেশ মানিল না।''

স্বরূপে আমারে দাও দেখা

বর্দ্ধমান-খণ্ডঘোষ-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

''ভগবানের কাছে প্রার্থনার ভাষা আমি তোমাকে কি শিখাইয়া দিব বাছা ? কাতর প্রাণে তাঁহার নিকটে নিবেদন কর, হে প্রভো,

''স্বরূপে আমারে দাও দেখা
যেন আমি চিনিবারে পারি,
দেখিয়া তোমার রূপ-রেখা
সৃজিত এ জগত তোমারি।

''ভুবন ভরিয়া তব রূপ,—
সে যে তব, জানিব কেমনে ?
তুমি যে করিয়া আছ চুপ,
দ্বিধা তাই মোর সারা মনে ;
খলখল হাসিতে উছলি'

মন-জলধির যত বারি
দেখা দাও ‘আসিয়াছি’ বলি’,’’—
তবে ত’ চিনিতে তোমা পারি।
‘‘কতই ত’ দেখিলাম তবু
কিছুই ত’ হইল না জানা,
তোমারে দেখিনি তাই প্রভু
চারি দিকে দেখি শুধু নানা।
চোখের সুমুখে আজি আসি’
দাঁড়াও যে সুগোপনচারী,
দেখিয়া তোমার রূপ-রাশি
সবারে চিনিতে যেন পারি।
‘‘তোমারে চিনিতে আমি চাহি,
তোমারে জানিতে আমি চাই,
অপর কামনা মোর নাই,
বল কিসে তব দেখা পাই ?
পলকের লাগি’ আঁখি-পাশে
দাঁড়াও হে বহুরূপধারী,
তোমারে দেখিয়া হৃদাকাশে
সবারে চিনিতে যেন পারি।

‘‘তাঁহাকে যদি তাঁহার প্রকৃত রূপে একটী বার দেখিতে পাও, নিমেষ মধ্যে নির্ণীত হইয়া যাইবে যে, সমগ্র জগতের কোন্ বস্তুর প্রকৃত রূপটী কি। সেই এক জনকে দেখিলে না বলিয়াই ত’ সপ্ত-ভুবন পর্য্যটনের পরেও এই জগতের কোনও

বস্তুকেই দেখা হইল না।''

সত্য-সম্বন্ধে নির্ণয়

ঐ পত্রেই শ্রীশ্রীবাবামণি আরও লিখিলেন,—

''কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা জানাও, হে ভগবান্, তোমার সহিত আমার সত্য সম্বন্ধ তুমি নির্ণয় করিয়া দাও, তাহা হইলেই সমগ্র জগতের সকলের সহিত আমার প্রকৃত সম্বন্ধ নির্ণয় হইয়া যাইবে। তুমি আমার কে, তাহা জানিলাম না বলিয়াই ত' জগতের কে আমার কে, তাহা এতদিনেও জানিতে পারিলাম না। যুক্তি দিয়া সংস্কার দিয়া, দেশ-প্রচলিত প্রথা দিয়া কাহার সহিত আমার সম্বন্ধকে চিলকাল ধরিয়া রাখিতে পারিব? আমি যাহাকে আমার কল্পিত সম্বন্ধের সূত্র দিয়া বাঁধিয়া রাখিতে চাহিব, কোন্ মুহূর্ত্তে সে কোন্ কাণ্ড করিয়া আমার সেই সূত্রকে নিষ্ঠুর ঘাতকের মত ছিন্ন করিবে, তাহা কে বলিতে পারে? কল্পনার রঙ্গীন ফানুসে আত্মীয়তা-বোধের মুখ-মারুত ভরিয়া মহাশূন্যে উড়াইয়া দিতেছি, কোথায় যে উড়িতে উড়িতে সে পড়িবে, তাহা জানি না।

''তোমার সাথে দিবস রাতে কত যে হয় দেখা,
তথাপি হায় হয় নি পরিচয়;
তুমিই নাকি বিশ্বরূপী শাস্ত্রে আছে লেখা,
প্রত্যয়ে তা হয়নি সুনিশ্চয়।

জগৎভরা আপন জনার নাইক সীমা-শেষ
স্বার্থে আঘাত লাগ্‌লে দেখি সবার শত্রু-বেশ,

তখন ত' আর থাকে না ক' আত্মীয়তার লেশ,
তাই ত' তাদের বন্ধুতাতেও ভয়।
"শত্রু যারা পিছন থেকে তীক্ষ্ণ ছুরি বিঁধে,
আকণ্ঠ যার গুপ্ত ভাবে রক্তপাতের ক্ষিধে,
তাদের দেখেও সোহাগ জাগে সিধে সরল হৃদে,
বুঝি না তা কেমন ক'রে হয়।
"শত্রু মিত্র সব ভুলিয়ে দেখাও তুমি কে,
তোমার রূপের বিমল বিভায়, জ্ঞানের আলোকে,
উৎসবেরই উল্লাসে আর মৃত্যুমাখা শোকে
অজ্ঞানতা আমার কর জয়,
সকল দ্বিধা সকল দ্বন্দ্ব আপন হাতে রুখে
তোমার প্রেমে আমায় কর লয়।
"তোমায় দেখে সবায় দেখি, তোমায় জেনে জানি
রূপ রসে আর গন্ধে ভরা বিশ্ব-জগৎখানি,
মিনতি মোর এর বেশী তো নয়।
তোমার সাথে ঘটাও আমার সত্য পরিচয়॥"

পত্রের অনুলিপি

অদ্যই শ্রীশ্রীবাবামণি চট্টগ্রাম রওনা হইবেন। একস্থানে কিছুদিন বাস করিবার পরে কোথাও যাইবার দিন আসিলে, সেদিন শ্রীশ্রীবাবামণির আর পরিশ্রমের অন্ত থাকে না। কারণ, যত চিঠিপত্র নানাস্থান হইতে আসিয়া জমিয়াছে, সবগুলিরই জবাব আজ শেষ করিতে হইবে। সেই কারণে অদ্য পত্র-লেখার পরিশ্রমের কোনও অন্ত ছিল না। কিন্তু অদ্যই আবার চারি

পাঁচটী যুবক উপদেশার্থী হইয়া আসিয়াছেন দূরবর্ত্তী কোনও গ্রাম হইতে।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—চিঠির তাড়া দেখ্‌ছ ত? জনে জনে একটী ক'রে কলম নিয়ে বসে যাও। প্রত্যেক খানা পত্র নকল ক'রে যাও, আর তারি মধ্য থেকে নিজ নিজ প্রয়োজনীয় উপদেশ সংগ্রহ ক'রে নেবে। যে পত্রের যেটুকু নকল কত্তে হবে, তা' চিহ্নিত ক'রে দিচ্ছি।

সাধারণতঃ শ্রীশ্রীবাবামণি দৈনিক যত পত্র লিখিয়া থাকেন, তাহার অতি সামান্য অংশেরই অনুলিপি রক্ষা সম্ভব হয়। অদ্য তাহার ব্যতিক্রম হইল। সেই ভক্ত যুবকগণকে শত ধন্যবাদ, যাঁহাদের শ্রমের গুণে অদ্যকার বহু পত্রের অনুলিপি পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি জীবনে অসংখ্য বক্তৃতামঞ্চ হইতে ভাষণ দিয়াছেন। কিন্তু তাহা অপেক্ষাও বেশী উপদেশ দিয়াছেন, জনে জনে ব্যক্তিগত ভাবে। তাহা অপেক্ষাও অধিক উদ্দীপনা পরিবেশন করিয়াছেন পত্রযোগে। বলিতে কি, তাঁহার জীবনকে "পত্রময় জীবন" অ্যাখ্যা দেওয়া চলে। বাংলার কত মহৎ ব্যক্তি তাঁহার এক একখানা পত্র হইতে নিজ নিজ জীবনের গতিনির্ণয় করিয়াছেন। সেই সহস্র সহস্র পত্র সেদিন কেহ রক্ষা করা প্রয়োজন মনে করেন নাই, রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। আজ তাহারই কিছু কিছু সংগৃহীত হইয়া একত্র হইবার পরে লক্ষ্য করিয়া অন্তরে বেদনা অনুভব করিতেছি যে, কি অমূল্য সম্পদই আমরা হারাইয়াছি।

অমৃতং সুন্দরং শান্তং

ত্রিপুরা-চাঁদপুরের একজনের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"আমার এই নশ্বর দেহের বিনাশের সাথে সাথেই আমার মতবাদ অনন্ত-কাল সমুদ্রের ক্ষুদ্র একটী বুদ্বুদের মত মিলাইয়া যাইতে পারে। ইহা আমি এত সম্ভব জ্ঞান করি যে, তোমাদের কাহাকেও আমার মতবাদ গ্রহণের জন্য একটী দিনের তরেও আহ্বান জানাই নাই। তবু তোমরা আসিয়াছ, তবু তোমরা আমাকে ঘিরিয়া আনন্দের মেলা বসাইতে যাইতেছ, তবু তোমরা অপরিকল্পিত নিষ্ঠায় তোমাদের মধ্যে আমাকে ও আমার মধ্যে তোমাদিগকে শাশ্বত সনাতন রূপে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছ। তোমাদের এই নিষ্ঠা ভগবৎ-প্রেরিত জানিয়া ইহাই আমি বুঝিতেছি যে, পৃথিবীর ঝটিকাবর্ত্তে আমি, তুমি, আমার মতবাদ, তোমার নিষ্ঠা সব কিছু উড়িয়া নিশ্চিহ্ন হইয়াও যদি কখনো যায়, তাহা হইলেও ইহার পশ্চাদ্‌বর্ত্তী মহৎ সত্যের কখনও বিনাশ হইতে পারে না। জগতের সকল মতবাদের প্রতি শুশ্রূষু ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন অতি কোমল, ভদ্র ও বিনয়ী মন পাইয়াও কেন আমি নিজস্ব একটী মতবাদ অতি দৃঢ় আস্থার উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে বাধ্য হইলাম ? নিশ্চয়ই ইহা একটী যোগ্য প্রশ্ন। আমার মতবাদের প্রতি আস্থাসম্পন্ন হইবার জন্য তোমাদের নিকটে কোনও আমন্ত্রণ প্রেরণ না করা সত্ত্বেও কেনই বা তোমরা ইহাকেই শ্রদ্ধায় ভক্তিতে প্রীতিতে আপ্লুত হইয়া গ্রহণ করিলে ? ইহাও নিশ্চয়ই আর একটী যোগ্য প্রশ্ন। সেই প্রশ্নের উত্তর তোমরা

নিজেদের অন্তরে অনুসন্ধান কর। তাহা হইলেই বুঝিবে যে, আমি অমৃতং সুন্দরং শান্তং বলিতে কাঁহাকে বুঝিয়াছি এবং কাহাকে বুঝাইয়াছি। শব্দ- কয়টা কাব্যরচনায় অভ্যস্ত লেখনী হইতে নিঃসৃত হয় নাই, কাহারও লেখনী কখনও যেই জগতে প্রবেশ করিতে পারে না, সেই স্থান হইতে স্বতোনিঃস্যন্দিত হইয়া নামিয়া আসিয়াছে।''

দল গড়িতে আসি নাই

ত্রিপুরা-শ্রীঘর-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

''দল গড়িবার জন্য আমি আসি নাই। এই জন্যই কেহ আমার স্নেহপাশ ছিন্ন করিয়া চলিয়া গেলে তাহার জন্য আকুল অধীর হই না, বুঝ-প্রবোধ দিয়া তাহাকে আমার কাছে ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করি না। যে চলিয়া যাইতেছে, সে নিশ্চিতই তাহার বিবেককে অনুসরণ করিতেছে। যেখানে এই প্রশ্ন উঠিবে যে, আমাকে মানিবে, না, বিবেককে মানিবে, সেখানে আমার স্পষ্ট স্বরে নির্দ্দেশ এই যে, বিবেককেই মানিতে হইবে, আমার কথা ভাবিতে গিয়া নিজের মনকে দুর্ব্বল করিও না। বলিতে পার, আমার কাছে সে ঋণী আছে, তাই আমার কথা না ভাবিয়া পারে না। কিন্তু বাছা, সে কি একবার হিসাব করিয়া দেখিয়াছে যে, জগতে কত সময়ে কত অবস্থায় কত জনের কাছে কত প্রকারের ঋণ সে সংগ্রহ করিয়াছে? সে সকল ঋণ কি সে পরিশোধ করিয়াছে, কিম্বা আশা ক'রে যে পরিশোধ করিতে পারিবে? মনুষ্য-জীবন একটা ঋণে পসরা। ঋণ ছাড়া

একটী পদক্ষেপ করিতে পার না, পার নাই। জন্মিয়াছ ঋণের মধ্যে, বাড়িয়াছ ঋণের অধীনে, লয় পাইবে ঋণগ্রস্ত থাকিয়া। ঋণকে শোধ করাই যদি আমার প্রতি তোমার দুর্ব্বল হইবার হেতু হয়, তবে বলিব, আর সকলের প্রতি তোমার ঋণের পরিমাণটাও একবার স্মরণ কর, তাহাদের প্রতিও মনটাকে একটু সরল, সরস, বিনম্র ও কৃতজ্ঞ কর। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সকলের ঋণ শোধের তোমার সামর্থ্য নাই, তাই সবচেয়ে বড় ঋণটি আগে ধর, বিবেকের ঋণ আগে পরিশোধ কর, তার পরে অন্য দিকে মন দিবে। তোমাদের সহায়তা করিতে আমি আসিয়াছি, দাসত্বের নিগড়ে কর-চরণ শৃঙ্খলিত করিয়া নিজের ইচ্ছামত তোমাদের পরিচালন করিতে আসি নাই। তোমরা তোমাদের নিজের পথ পূর্ণবিক্রমে চলিবে; এই জন্যই তোমাদের প্রয়োজন আমাকে। তোমরা সকলে নিজ নিজ পথ চলা বন্ধ করিয়া দিয়া আমার খোঁয়াড়ে ঢুকিবে, এজন্য তোমাদিগকে আমার প্রয়োজন নহে। যেই দলে সকল দলের স্থান, যেই সঙ্ঘে সকল সঙ্ঘের আশ্রয়, যেই মতে সকল মতের মিল, যেই পথে সকল পথের সমন্বয়, আমার লক্ষ্য সেই সঙ্ঘ, সেই মত, সেই পথ. তাই দল গড়িবার বুদ্ধি আমার বৃদ্ধির পক্ষে ক্ষতিকর।''

স্বাধীনতা ভারতীয় ধর্ম্মের শিক্ষা

ঐ পত্রের অপর অংশে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

''প্রত্যেকটি তরুণ-তরুণীর কাণে ও প্রাণে একটী মন্ত্র ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত কর। তাহা হইতেছে 'স্বাধীনতা'। প্রত্যেকে আজ

স্ব-কে চিনুক, চিনিয়া তাহার ইচ্ছার অধীন হউক। লালসা, বাসনা, খেয়াল, খোয়াব, জল্পনা আর কল্পনার অধীনতা নয়, স্ব-এর অধীনতা। সকল পরতন্ত্রতা তাহার বিদূরিত হউক, সে হউক স্ব-তন্ত্র। সে স্ব-কে চিনুক এবং সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সে তার স্ব-ধর্ম্মকে আশ্রয় করুক। ভারতের ধর্ম্ম স্বাধীনতারই শিক্ষা দিয়াছে, আমরা নিজেদের বুদ্ধির প্রাখর্য্যকে সেই সরল, সহজ, শাদা কথাটীকেই জটিল, কুটিল ও গ্রন্থিল করিবার কাজে বিনিয়োগ করিয়াছি। ইহা আমার পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে বেদনাকর, জাতিগতভাবে দুর্ভাগ্যজনক।''

উন্নত চিন্তা ও স্বাধ্যায়

ময়মনসিংহ-জামালপুর-নিবাসী অপর একজনের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

''বিঘ্নসঙ্কুল পিচ্ছিল জীবন-পথে ভুল-ভ্রান্তি-পতনের সম্ভাবনা পদে পদে। উন্নত চিন্তা সেই সময়ে তোমার পথের যষ্টি হউক। যেখানে দেখিবে কাদা, যেখানে দেখিবে পিচ্ছিলতা, সেখানে এই যষ্টিটী মাটিতে ঠেকাইয়া তাহার তল দেখিয়া নিবে, শক্ত করিয়া ইহাকে বসাইয়া ইহার উপরে ভর করিয়া তবে পদক্ষেপ করিবে। উন্নত চিন্তাই উন্নত উপলব্ধির সিঁড়ি। উন্নত চিন্তাকে অন্তরে স্থায়িত্ব দিবার জন্য স্বাধ্যায়কে জানিবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। ভাষণ, ব্যাখ্যান, শাস্ত্র-পাঠ শুনিলে যে কাজ আংশিক ভাবে হইয়া থাকে, প্রত্যহ স্বাধ্যায়ের দ্বারা সে কাজ হইয়া থাকে সর্ব্বাঙ্গীণ ভাবে।

"কিন্তু স্বাধ্যায় কাহাকে বলে ? এক ধার হইতে দুনিয়ার সব বহি পড়িয়া শেষ করিতে থাকিলে, ইহার নাম স্বাধ্যায় নহে। একই মহাগ্রন্থকে দিনের পর দিন, পঠন, পাঠন, শ্রবণ, মনন, ধ্যান, অনুধ্যান ও আলোচনার দ্বারা নিজের রক্ত-মাংস-মেদ-মজ্জায় মিশাইয়া দেওয়ার নাম স্বাধ্যায়। তাহাই তোমাকে করিতে হইবে।"

অদীক্ষিতের ওঙ্কার-জপ

ঢাকা-ইস্‌লামপুর-নিবাসী অপর একজনের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"অদীক্ষিত অবস্থায় মন্ত্রজপে নিষ্ফলতা আসে, ইহাই সাধু-বৈষ্ণব-সজ্জন-গণের মুখে শুনিয়া আসিতেছ। কিন্তু আমি তোমাকে আশ্বাস দিতেছি, দীক্ষিত বা অদীক্ষিত সর্ব্বাবস্থায় ওঙ্কার-জপ চলিবে। দীক্ষাব্যতীত মন্ত্রজপ মরুভূমিতে বীজ-বপন-তুল্য ব্যর্থ হয়, একথার সমর্থনে তুমি শাস্ত্র-বচন আমাকে শুনাইতে পারিবে। কিন্তু শাস্ত্র যাঁহারা রচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই আজ আমার লেখনীর মধ্য দিয়া তোমাকে এই আপ্তবাক্য শ্রবণ করাইতেছেন যে, অন্য মন্ত্রের ব্যাপার যাহাই হউক, দীক্ষিত বা অদীক্ষিত যে-কোনও অবস্থায় ওঙ্কার-জপ করিবে, সেই অবস্থাতেই ইহার শুভ ফল তোমার লব্ধ হইবে,—একটীবারের মন্ত্র-জপও তোমার নিষ্ফল হইবে না, ব্যর্থ যাইবে না।"

দীক্ষার সুফল

ঐ পত্রেই শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন, —

"দীক্ষার অবশ্যই একটা সুফল আছে। দীক্ষা হইতেছে মন্ত্রের খুঁটী। দীক্ষা দ্বারা কোনও মন্ত্র লব্ধ হইলে সেই মন্ত্র বারংবার পরিবর্ত্তনের সুযোগ ও রুচি কমিয়া যায়। ইহাতে মন্ত্রে সাধকের নিষ্ঠা অটুট রাখার সাহায্য হয়। দীক্ষার অন্য সুফলও আছে, দীক্ষাপ্রাপ্ত মন্ত্রের দীক্ষাদাতা নিশ্চিতই সাধনের কোনও কৌশল বলিয়া দিবেন, ইহা প্রত্যাশা করা যায়। কৌশল-সমূহ মনঃস্থৈর্য্য সাধনের সহায়তা করে। দীক্ষা দ্বারা মন্ত্র লাভের তৃতীয় বা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ কুশল এই যে প্রত্যেকটী বিভিন্ন মন্ত্র যেই দার্শনিক ভিত্তির উপরে দণ্ডায়মান, তাহা দীক্ষাদাতার উপদেশে ও জীবন-প্রণালীতে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে। মন্ত্র করিবে জপ, আর তাহার দার্শনিক ভিত্তি সম্পর্কে থাকিবে অজ্ঞ, ইহা সাধক-জীবনে এক স্ববিরোধী অস্বস্তিকর অবস্থা। দীক্ষাদাতা প্রকৃতই উপলব্ধি-সম্পন্ন শক্তিমান্ সাধক হইলে, সাধন-কালে অদৃশ্য ভাবে তাঁহার শক্তির সহায়তা পাওয়া যায়। এই জন্যই দীক্ষা নেওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়ে।"

দীক্ষায় গোপনতার কারণ

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও লিখিলেন,—

"কিন্তু দীক্ষাদানের পশ্চাতে যেখানে দীক্ষাদাতার স্বদল-পুষ্টি বা স্বমত বিস্তারই হইবে প্রধান লক্ষ্য, সেখানে দীক্ষা একটা নিতান্ত esoteric বা গুপ্ত ব্যাপার না হইয়া পারে না। আমি তোমাকে যেই মন্ত্র দিলাম, তাহা যদি দশ জনে জানিতে পারে, তাহা হইলে নানা জনের নানা মন্তব্যে, নানা টিপ্পনীতে, নানা

ব্যাখ্যায় তোমার মন দীক্ষাপ্রাপ্ত মন্ত্র হইতে টলিয়া যাইতে পারে, —তাই তোমার মন্ত্রগুপ্তির খুবই আবশ্যকতা আছে। কিন্তু দীক্ষাদাতারা যে একমাত্র এই আশঙ্কাতেই গুরু-মন্ত্রকে 'গোপয়েৎ মাতৃজারবৎ' করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা নহে। ইহা অন্যতম কারণ হইলেও ইহা অপেক্ষা অনেক বড় একটা কারণ এই মন্ত্র গুপ্তির পশ্চাতে রহিয়াছে। তাহা কেহ কাহাকেও প্রকাশ করিয়া বলেন নাই, কিন্তু অন্তরে অনেকেই অনুভব করিয়াছেন। তাহা হইতেছে দার্শনিক মতবাদের সংঘর্ষে ভীতি। অন্য কথায় ইহাকে দার্শনিক মতবাদের সংঘর্ষে অরুচিও বলিতে পার। হিন্দুর স্বাভাবিক প্রকৃতি সংঘর্ষ এড়াইয়া চলা। ইস্‌লামও মক্কায় থাকা কালে সংঘর্ষ এড়াইয়া চলিতে ভুল করে নাই,—কোরেশী পুরোহিত-তন্ত্রের সহিত প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ এড়াইবার জন্য প্রকাশ্যে দীক্ষা নমাজ প্রভৃতি সম্ভব হয় নাই। মদিনায় আসিয়া সেই গোপনতার প্রয়োজন ফুরাইয়া গেল, তাই সংঘর্ষের ভয়কে পরোয়া না করিয়া প্রকাশ্যে দীক্ষা, নমাজ প্রভৃতি হইতে লাগিল। বৈষ্ণব শাক্তের, শাক্ত বৈষ্ণবের মতবাদকে কেবল অপছন্দই করিয়াছে, তাহা নহে, মনে মনে ভয়ও করিয়াছে। বৈষ্ণব দার্শনিকতায় এমন কোমল পেলব মধুর জিনিষ আছে, যাহার আকর্ষণ শাক্ত-দীক্ষিতকে হয়ত স্বপথ-ভ্রষ্ট করিতে পারে। শাক্ত-দার্শনিকতায় এমন পৌরুষ, এমন বীর্য্য, এমন তেজস্বিতা রহিয়াছে, যাহার আকর্ষণ বৈষ্ণব-দীক্ষিতকে হয়ত টলাইয়া দিতে পারে। বৈষ্ণবের শাক্ত হওয়া, শাক্তের বৈষ্ণব হওয়া কিছু বিচিত্র ঘটনা নয়। শাক্তদের পরম্পরাগত সাহিত্য নাই,

তাই শাস্ত্রীয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শন কঠিন হইতে পারে। কিন্তু বনমালীর নূপুর-নিক্কণে বিতৃষ্ণ ব্যক্তিরা মহামেঘপ্রভা ঘোরা মুক্তকেশী চতুর্ভুজার শোণিত-স্রাবী খড়্গ ঝলকে উদ্দীপ্ত-চেতা হইয়া শাক্ত-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, ইহাও সত্য। বৈষ্ণবদের পরম্পরাগত সাহিত্য আছে বলিয়া অনেক জগাই-মাধাই-এর উদ্ধারের অর্থাৎ শাক্তগণের বৈষ্ণব সাধন গ্রহণ করার প্রামাণ্য দৃষ্টান্ত আছে। বৈষ্ণব নিজের দর্শনকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়াছেন, কিন্তু নিজ শিষ্যকে কালীমন্দির, শিবমন্দির, জৈনমন্দিরে যাইতে সম্মতি দিতে পারেন নাই। শাক্ত সম্পর্কেও ঠিক এই কথাই। বৈষ্ণবের পূজা, উৎসব, কীর্ত্তনাদিকে শাক্ত শুদ্ধ, প্রসন্ন, প্রশান্ত মনে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাহার প্রচ্ছন্ন কারণটী কিন্তু দার্শনিক মতবাদের সংঘর্ষ এড়াইয়া চলার প্রবৃত্তি। অসীম পরমাত্মাকে নাম এবং রূপের দ্বারা সীমিত করিবার পরে তাঁহার সম্পর্কে দার্শনিক বিচারও সীমার পথ ধরিয়া চলিতে বাধ্য। সেই দার্শনিকতা চৌহদ্দী মানিয়া চলিতেই সদা ব্যস্ত,—চৌহদ্দী না কমে, তার দিকে খরদৃষ্টি। সুতরাং প্রকাশ্য সংঘর্ষ এড়াইবার জন্য দীক্ষাকে জীবনের একটী অতীব গোপনীয় আচারে পরিণত করিতে হইয়াছে। দীক্ষা যখন গোপনে হইল, তখন দীক্ষার ফলস্বরূপে অবশ্যম্ভাবী রূপে প্রাপ্ত যে দার্শনিক মতামত, তাহাও স্ব-সম্প্রদায়ের বাহিরের লোকের নিকটে রহিল রহস্যময় ও অজানিত,—তাই তর্কের এবং দ্বন্দ্বের অবসর কমিয়া গেল। এই দিক হইতেও মন্ত্র-দীক্ষার গোপনীয়তা একটা বড় রকমের আবশ্যকতা।"

সর্ব্ব-স্বীকৃতির মহামন্ত্র

শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—"কিন্তু আমি যেই মন্ত্রে দীক্ষিত বা অ-দীক্ষিত নির্ব্বিশেষে সর্ব্বমানবের পূর্ণাধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া যাইতেছি, সেই মন্ত্রে রহিয়াছে সর্ব্বমন্ত্রের স্বীকৃতি, সর্ব্বরূপের স্বীকৃতি এবং সেই জন্য ইহা নাম এবং রূপের উর্দ্ধে। সকলকে যে স্বীকার করে, সে সমষ্টিহেতুতে এত বৃহৎ যে, খণ্ড খণ্ড সর্ব্বনামের স্বীকৃতির মধ্য দিয়া সে অ-নাম বা নামাতীত, খণ্ড খণ্ড সর্ব্বরূপের স্বীকৃতির মধ্য দিয়া সে অ-রূপ বা রূপাতীত। তাই কোনও প্রকার দার্শনিক মতবাদকেই তাহার ভয় করিবার কিছু নাই,—ব্যাঘ্রিণী যেমন তাহার যুবতী কন্যাকে ভয় করে না। এই জন্যই ইহার নাম অখণ্ড-নাম, এই জন্যই ইহার সাধনে গুরু মিলে উত্তম, না মিলে তবু সাধন সফল। সব মন্ত্র সব তন্ত্র সব মত সব পথ যেখানে মিলিয়াছে, এস আমরা সবাই সেখানে আসিয়া পরস্পরের সহিত পরস্পর মিলিত হই। সকলের যেখানে স্বীকৃতি, এস আমরা সেখানে অন্তরের সন্নিধি জানাইয়া পরস্পর পরস্পরকে স্বীকার করি। ওঙ্কার কোনও সাম্প্রদায়িক মন্ত্র নয়, ইহা স্বীকৃতির মহামন্ত্র, মিলনের মহাধ্বনি, সমন্বয়ের চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা।"

হরি ওঁ

শ্রীশ্রীবাবামণি পত্রের শেষাংশে লিখিলেন,—

"এই জন্যই প্রণবকে আপামর জনসাধারণের জন্য প্রকাশ করিয়া ধরিয়া আমি হরিওঁ কীর্ত্তন করিয়া চলিয়াছি।"

"কত দিবা কত রাত্রি
সর্ব্বসুখ করি' বিসর্জ্জন
একান্ত অনন্য-লক্ষ্যে
এই নাম করেছি কীর্ত্তন,
নিদ্রাহীন চক্ষু মম
জ্যোতির্ম্ময়ে করিয়া দর্শন
শ্রান্তিহীন কণ্ঠ মম
দিব্য সুখ করি' আস্বাদন
এক নামে এক গানে
এক প্রাণে রহিয়া মগন
সর্ব্বজীব-সুখ লাগি'
মহামৃত করিল চয়ন।
অসুরে বঞ্চনা করি'
নহে এই সুধা বিতরণ,
দেবভক্ত দেবদ্বেষী
সকলের লাগিয়া অর্জ্জন।

"মহাঘোর কলি-ত্রাণে
লভিনু এ অমূল্য রতন;
সকলেরে সমভাবে
সম মনে করিব বণ্টন;
দূর হ রে ভেদবুদ্ধি,'
বজ্র কণ্ঠে করিব গর্জ্জন।

যারা ছিল ছোট, তারা
হ'ল আজ প্রাণের আপন,
সবারে আনিয়া কাছে
দে রে দুঃখ-হর আলিঙ্গন,
অমৃতের পুত্র তোরা,
মৃত্যু আজ লভুক মরণ।
মৃত্যুরে করিতে দূর
অমৃতস্য-পুত্রের জীবন,
কায়মনোবাক্যে আজ
বিলাইব নামামৃত ধন।

''জানুক শূদ্র, নীচ, চণ্ডাল
এই নামে আছে তার
শত শাস্ত্রের শত বাধাতেও
শাশ্বত অধিকার।
সবারে জানাও প্রেমালু কণ্ঠে
গাহিয়া বারংবার
নীচ, হীন, ছোট সবার লাগিয়া
পবিত্র ওঙ্কার।
ঘরে ঘরে তোল মধু-রাগিণীতে
হরিওঁ—ঝঙ্কার
নামের প্রতাপে নাশ কর যত
সুগুপ্ত শঙ্কার।

বাধা দিবে আসি প্রাণহীন প্রথা,
অসত্য সংস্কার,
নামের প্লাবনে প্রেমের তাড়নে
কর তারে সংহার।
"হাজার হাজার বছর ধরিয়া
কতই না অবিচার
করিয়াছ হায়, নিজেরে করেছ
প্রতিফল-ভোগী তার।
আজি হুঙ্কারি' ক'রে দাও দূর
অতীতের পাপভার,
আনন্দময় ক'রে নাও আজি
এ বিশ্ব-সংসার!
মিলনের সুখে সকলের মুখে
ফুটুক হাসি আবার,
সৃষ্টি যাঁহার, সবাই জানুক,
আমরা সবাই তাঁর।
সবাই জানুক মিছে দলাদলি,
মিছে কথা মুখভার,
সবাই সবারে দিক্ কোলাকোলি
জানি চির আপনার।

"হরি মানে যাহাতে সব-কিছু সমাহৃত হইয়াছে, যিনি সকলকে লইয়া পূর্ণ, যাহার মধ্যে একটী বস্তু, একটী তত্ত্ব, একটী সত্যও অনুপস্থিত নাই। 'হরি ওঁ' মানে 'হে ওঙ্কার, তুমিই হরি',

অর্থাৎ 'হে ওঙ্কার, তোমাতেই সকল মত, সকল পথ, সকল তত্ত্ব, সকল সত্য মিলিয়াছে।' হরি এখানে বিশেষণ, ওঁ এখানে বিশেষ্য। 'ওঁ হরি' বলিতে ইহা বুঝায় না। তাই 'ওঁ হরি' না গাহিয়া আমি 'হরিওঁ' গাহিয়া থাকি। সকল মতকে সকল পথকে অন্তরের অর্ঘ্য দিয়া, সকল মতকে সকল পথকে স্বীকার করিয়া; সকল মতকে সকল পথকে সম্মান দিয়া, কোনও মতকে কোনো পথকে গর্হন না করিয়া, নিন্দা না করিয়া, ছোট না ভাবিয়া মহানাম হরিওঁ কীর্ত্তিত হইতেছে। কাহারও প্রতি এখানে উপেক্ষা নাই।

"আমি যে তোমারি নাম
গাহিয়া চলেছি প্রভু,
সে নহে আমারে দিতে যশ,
দিকে দিকে সবে বাম,
শত বাধা, আমি তবু
তোমারি করুণা-পরবশ।
প্রাণ-মম অভিরাম
তুমি মম, তাই কভু
ভুলিতে পারি না নাম-রস!
স্মরণে হে গুণধাম,
প্রেমজলে ডুবু ডুবু
আঁখি, মূক হৃদয় বিবশ।"

কুসাহিত্যের অপ-প্রভাব

হাওড়া শালকিয়া-নিবাসী অপর একজনের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"গৃহস্থেরা প্রতি জনে নিজ নিজ প্রবৃত্তি অনুযায়ী চলিতেছে। তুমি উহাতে ধ্যান লাগাইও না। গৃহস্থের ঘরে দীর্ঘকাল অবস্থান করিতে বা উপন্যাসাদিতে প্রাকৃত জনগণের মনস্তত্ত্ব অধ্যয়ন করিতে এই জন্যই নিষেধ করি। কয় জন গৃহস্থ সংসারের সহস্র প্রবৃত্তিমূলক কর্ত্তব্য কর্ম্মে রত থাকিয়াও অবিরাম নিবৃত্তির অনুশীলনের চেষ্টা করিতেছে ? প্রবৃত্তির তটিনী-তরঙ্গে হাবুডুবু খাইতে খাইতে গ্রন্থের নায়ক-নায়িকা নিবৃত্তির তটভূমিতে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে, এই দৃশ্য কয়জন উপন্যাস লেখক দেখাইয়া থাকেন ? যে দৃশ্য দেখিলে সাধারণ ক্রেতা গ্রন্থখানাকে রসোত্তীর্ণ বলিয়া অভিমত দিবে, রঙ্গমঞ্চে যে দৃশ্যাবলী বিস্তারিত হইলে সাধারণ নরনারী স্রোতের ন্যায় অবিরাম গতিতে থিয়েটার হলের দিকে ধাবিত হইবে, নিজের জ্ঞাতসারে বা সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে অধিকাংশ লেখক কি তাহাই লিখিয়া যাইতেছেন না ? বৈরাগ্যবান্ মনের ক্রম-বিকাশের তত্ত্ব বিশ্লেষণে ইঁহাদের রুচি কৈ ? এই জন্যই উপন্যাস বর্জ্জন করিতে বলিতেছি। একটা দুষ্ট লম্পট সমগ্র জীবনের চেষ্টা দিয়া যতগুলি লোকের মনকে কলুষিত করিতে পারে, দুষ্ট কলুষিত একখানা গ্রন্থ সুপ্রচারিত হইলে এক বৎসরে তাহার সহস্র গুণ নরনারীর মনকে পাপাসক্ত করিতে পারে। গুরুতর সামাজিক অপরাধ-সমূহের অনুষ্ঠান করিয়া

পরবর্ত্তী কালে যাহারা অনুতাপের অশ্রুজলে বুক ভাসাইয়াছে, যদি তাহাদের আত্ম-স্বীকৃতি কখনও শুনিবার দুর্ভাগ্য তোমার হয়, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে যে, একথা কত সত্য। শক্তিশালী শব্দ-যাদুকরদের সাহিত্য-বিলাস সমাজের মধ্যে কত যে সর্ব্বনাশকর কৃত্রিমতার সৃষ্টি করিয়াছে ও করিতেছে, তাহার পরিমাপ সম্ভব নহে। এই জন্যই ঈশ্বর-ভজন-বিহ্বল কোমলপ্রাণ সাধকেরা এই সকল রচনাকে সাধন-পথের কন্টক বলিয়া বিবেচনা করেন, হউক না কেন তাহা যত বড় সাহিত্য-মহারথীরই রচনা।"

নিজের জন্য সাহিত্য-রচনা

এই পত্রেই শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"নিজেরই জন্য নিজের সাহিত্য রচনা অতি উৎকৃষ্ট অনুশীলন। অন্যেকে দেখাইবার জন্য নয়, নিজেই পরবর্ত্তী সময়ে নিজের অতীত কালের মনটীকে উঁকি মারিয়া দেখিবার জন্য প্রতিদিন ভগবদুপাসনার পরে তুমি ভগবানের সহিত তোমার ভাবের আদান-প্রদান মূলক রচনা লিখিতে পার। তখন সত্য সত্য যাহা মনের ভিতর জাগিবে, তাহাই লিখিও। কষ্টকল্পনা করিয়া কতকগুলি ভাল ভাল কথা লিখিতে চেষ্টা করিও না, কেননা তাহা কপটতা হইবে, নিজেকে এবং ভগবান্‌কে প্রবঞ্চনা করা হইবে। এই সকল লেখা যদি অতি উচ্চ স্তরেরও হয়, তবু কাহাকেও দেখাইও না। দেখাইতে গেলেই ইহার পরবর্ত্তী সব রচনায় কপটতা আসিয়া যাইবে। প্রণয়ী আর প্রণয়িনী পরস্পর একান্তে যে ভাব-বিনিময় করে, তাহা কি বাহিরের লোকের

কাছে বলিতে যায় ? বলিতে গেলেই প্রেম মলিন হইয়া পড়ে। ঠিক্ তেমনি জানিও।"

ভগবত্তোষণ ও লোকরঞ্জন

নোয়াখালী নরোত্তমপুর-নিবাসী অপর একজনের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ভগবৎ-প্রীতি-সম্পাদনকারীর সকল সময়েই লোকরঞ্জক হওয়া বড় শক্ত ব্যাপার। কারণ, ভগবান্ ভাবগ্রাহী, তিনি অন্তরের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত জানেন, তাঁহার সন্তোষ বিধান হইবে অকপট সরলতা দিয়া। আর জগতের অধিকাংশ লোকই হইতেছে বহির্ম্মুখ জীব, কোটি কোটি লোকের মধ্যে দুই একজন দুর্লভ ব্যক্তি ছাড়া আর সকলেরই মন বিষয়-বিলাসী, প্রপঞ্চ-পরায়ণ। তাহারা অন্তরের সরল ভাবকে বুঝিতে পারে না, বাহির দিয়া মানুষকে বিচার করে, যাহার মনের ভাব যাহা নহে, তাহার সম্পর্কে সেই ভাব আরোপ করিয়া সহজ স্বাভাবিক আচরণকে জটিল করিয়া তোলে। তাই তাহাদের মনোরঞ্জন করিতে গেলে সত্য অপেক্ষা অসত্যকে প্রকৃত অপেক্ষা অপ্রকৃতকে, বস্তু অপেক্ষা কল্পিতকে অনেক সময়েই প্রাধান্য দিতে হয়। অপ্রিয় অকপট হিতভাষণ সদুদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইলেও তাহা শুনিবার নৈতিক সৎসাহস অধিকাংশ লোকের নাই। এই কারণে সাধক-ভক্তেরা বহির্ম্মুখমনা লোকদের সঙ্গে বাক্য-ব্যবহারের সম্পর্ক পর্য্যন্ত কমাইয়া দিতে উপদেশ দিয়া থাকেন।"

"তাঁহাদের এই উপদেশ একান্তই জলাতঙ্ক-রোগগ্রস্তের

প্রলাপ-বচন নহে। কিন্তু ত্যাগীই হও আর গৃহীই হও, সংসারের কোটি কোটি বহির্ম্মুখ জীবকে ত্যাগ করিয়া যাইবে কোথায় ? পর্ব্বতে যাও, অরণ্যে যাও, গিরি-কন্দরে গিয়া আত্মগোপন কর, কোনও না কোনো মানুষের সংস্পর্শে আসিবার প্রয়োজন তোমার হইবেই হইবে। নতুবা তোমার চলিবে না। তোমার যদি প্রয়োজন নাও হয়, তথাপি কোনও না কোনও মনুষ্য তোমার সংস্পর্শে আসিবেই। তখন কি করিবে ? তাহাকে দেখিয়া ভয়ে ভয়ে পলাইবে ? একস্থান হইতে পলাইয়া অন্য স্থানে যাও, দুদিন পরে সেখানেও দেখিবে, মানুষ আসিয়া জুটিয়াছে। মনুষ্য-সংস্পর্শ-হীন স্থান জগতে আর পাইবে না।

"তাই শ্রেষ্ঠ সদুপায় হইতেছে মানুষকে প্রপঞ্চ-বিলাসী বিষয়ী বলিয়া তাহার সম্পর্কে নাসিকা-কুঞ্চন না করিয়া তাহার ভিতরেই তোমার পরম আরাধ্য পরমদেবতা বাস করিতেছেন বলিয়া অনুক্ষণ জানিবার চেষ্টা করা। মানুষ তোমার সেবাবুদ্ধিকে বুঝিল না, ইহাতে তোমার কি যায় আসে ? কেহ তোমার সদ্‌বিষয়িনী চেষ্টার অপব্যাখ্যা করিলেই বা তোমার ক্ষতি কি ? যেখানে তোমার অকপট সত্য-ভাষণে মানুষের হিত সাধিত হইবে না, বরং পয়ঃপানং ভুজঙ্গানাং হইবে, সেখানে তাহার উপকার করিবার জন্য অপ্রিয় ভাষণ করিয়া নিজের মহত্ত্বের ও সাধুগিরির জয়ডঙ্কা নাই বা বাজাইতে গেলে ? বিষয়ী লোকের কাছে যাহারা অপ্রিয় বাক্য শুনাইবার পরেও ধীরতা প্রত্যাশা করে, তাহারা অপরকে নিষ্প্রয়োজনে বা সামান্য প্রয়োজনে অপ্রিয়-ভাষণ শুনাইতে বিরত থাকিবার মত সংযম কেন নিজের কাছেও

দাবী করিবে না ? তুমি সাধুপন্থী হইয়াছ বলিয়াই বিষয়ী প্রপঞ্চী বহির্ম্মুখ জীবদের নিকটে অপ্রিয় সত্য কথা বলিয়া বেড়াইবার চাপরাশ পাইয়াছ, এই মিথ্যা ধারণা তোমার মনে তোমার কোন্ শত্রু জন্মাইয়া দিল ?"

আরও অনেক পত্র শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন। অনুলিপি-কারকেরা সব পত্র নকল করিয়া উঠিতে পারিলেন না। বেলা সাড়ে বারোটা বাজিল। শ্রীশ্রীবাবামণি আহার করিলেন। তৎপরে পদব্রজে ময়দাগঞ্জ বাজারের দিকে রওনা হইলেন, সেখান হইতে নৌকা-যোগে আখাউড়া যাইবেন এবং আখাউড়াতে রাত্রি নয়টায় ট্রেন ধরিবেন। দুইটী যুবক ময়দাগঞ্জ পর্য্যন্ত সঙ্গে গেলেন।

সর্ব্বক্ষণ নাম কর

যাইবার কালে সমাগত যুবকদের শ্রীশ্রীবাবামণি উপদেশ দিলেন,—জীবনের সাংসারিক লক্ষ্য তোমাদের যারই বা হউক, সর্ব্বদা ভগবানের নামে লেগে থাক। নাম কর মুখে, মনে, শ্বাসে, হৃৎস্পন্দনে, যখন যে ভাবে সুবিধা, তখন সেই ভাবে। শারীরিক কর্ত্তব্যসমূহ ত' অভ্যাসের ফলে আপনা আপনি হ'তে থাক্‌বে, সুতরাং মনকে তুমি নামে লাগিয়ে রাখতে কেন পারবে না ? কর্ম্মে বা বিশ্রামে, দানে বা সংগ্রামে, শয়নে বা জাগরণে সর্ব্বক্ষণ তাঁর নাম কর্‌বে।

সর্ব্বাবস্থায় নাম কর

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সর্ব্বাবস্থায় তাঁর নাম কর। নির্জ্জনে তাঁর নাম কর, জন-কোলাহলেও তাঁর নাম কর। একা বসে

তাঁর নাম কর, বহু জনে সমবেত হয়েও তাঁর নাম কর। পবিত্র হয়ে তাঁর নাম কর, অশুদ্ধাবস্থায় তাঁর নাম কর। তাঁর নাম কত্তে দেশ-কালাদির বিচার নিষ্প্রয়োজন।

তাঁর নামে সর্ব্বজনের অধিকার

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তাঁর নামে সর্ব্বজীবের সমান অধিকার। স্ত্রীলোকও তাঁর নাম করুক, শুদ্রও তাঁর নাম করুক। কুলীনও তাঁর নাম কুরুক, চণ্ডালও তাঁর নাম করুক। সবাইকে ডেকে এনে তাঁর নাম শুনাও, সবাইকে ডেকে এনে তাঁর নাম করাও।

তাঁর নাম সকলের শুভ-সম্পাদক

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তাঁর নামের ভিতর দিয়ে সর্ব্বজীবের কুশল কামনা কর। যারা তাঁকে মানে না, যারা তাঁর নাম বিশ্বাস করে না, তাদেরও কুশলের জন্য তাঁর নাম কর। যারা রাবণ, কংস হিরণ্যকশিপুর ন্যায় তাঁর বিদ্রোহী, তাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর তাঁর নাম ক'রে ক'রে। জগতে যে যাই হোক্, তাঁর নাম সকলের শুভ-সম্পাদক।

চট্টগ্রাম যাত্রা

নৌকা ছাড়িয়া দিল। শ্রীশ্রীবাবামণি নৌকামধ্যেই পত্র লিখিতে বসিয়া গেলেন। সন্ধ্যার সামান্য আগে নৌকা আখাউড়া পৌঁছিল। ষ্টেশনটায় আলোর সুবন্দোবস্ত নাই। শ্রীশ্রাবাবামণি প্ল্যাটফর্ম্মের এক প্রান্তে বসিয়া সুটকেইসের উপরে একসঙ্গে তিনটী মোমবাতি

ধরাইয়া পত্রের জবাব লিখিতে লাগিলেন। রাত্রি সাড়ে নয়টায় চট্টগ্রাম-গামী-ট্রেন আসিল। আর-এম-এস এর চিঠির বাক্সে পুঞ্জীকৃত পত্র ফেলিয়া দিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি ট্রেণে চাপিলেন।

চট্টগ্রাম

২০ শে চৈত্র, ১৩৪০

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ

শ্রীশ্রীবাবামণি চট্টগ্রাম গিয়াছেন।

চট্টগ্রাম জেলায় যে-কোনও মত-প্রচারকের বড় সহজে প্রতিষ্ঠা লাভ ঘটে। একদল যুবক ও যুবতী কর্ম্মঠ বাহু লইয়া সেই মত-প্রচারকের পৃষ্ঠপোষণে লাগিয়া যায় এবং এভাবে একটা সহরের মধ্যে জনা পাঁচ ছয় মহাপুরুষের অবতার-কল্প প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

ভক্তগণের আহ্বানে শ্রীশ্রীবাবামণি খাতুনগঞ্জ শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দেবের গদীতে বসিয়াছেন।

একজন প্রশ্ন করিলেন,—বর্ত্তমান বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ কে ?

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—কেন বাবা, তুমি ?

প্রশ্নকর্ত্তা।—আমি ত' একজন কীটাণু-কীটতুল্য নগণ্য গৃহী, আমি কি ক'রে মহাপুরুষ হব ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—গৃহীরা বড় বড় মহাপুরুষদের জন্মদাতা হ'তে পারেন, আর নিজেরা মহাপুরুষ হ'তে পার্ব্বেন না ? যিনি যখন আমার চ'খের সামনে পড়েন, আমার দৃষ্টিতে তিনিই জগতের শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ। তুমি কি বাবা জানো যে, কত

অমূল্য রত্নরাজি তোমার ভিতরে লুক্কায়িত আছে ? নিজের অন্তরের খনি খনন কর, ভিতরের সঞ্চিত রত্নাবলী উদ্ধার কর, তখন বুঝ্‌বে, আমি তোমাকেই কেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ বলে মনে কচ্ছি।—ভিতর বাহির করিয়া এক,

নিজের মূরতি খুঁজিয়া দেখ্।

অবজ্ঞা নয়, প্রতীক্ষা

চট্টগ্রাম জেলাতে শ্রীশ্রীবাবামণি সযত্নে আত্ম-গোপন করিয়া চলিয়াছেন। সাধারণ্যে আত্মপ্রকাশ করেন নাই, একটী সভাস্থলেও বক্তৃতা দেন নাই, কিম্বা যে-স্থানে গেলে সর্ব্বসাধারণের সঙ্গে পরিচয় বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা, সে-স্থানে গমন করেন নাই।

এই বিষয় উল্লেখ করিয়া একজন প্রশ্ন করিলেন,—আপনি চট্টগ্রাম জেলাকে অত অবজ্ঞা কেন কচ্ছেন ? আপনার উপরে এই জেলার কি কোনও দাবীই নেই ?

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—অবজ্ঞা নয় বাছা, প্রতীক্ষা কচ্ছি। শুধু চট্টগ্রামই নয়, কাশ্মীর কান্দাহার থেকে সুরু ক'রে আরব উপত্যকা পর্য্যন্ত আর, নৈনিতাল থেকে সুরু ক'রে কলম্বো পর্য্যন্ত সকল স্থানেরই জন্য আমার চলেছে কাল-প্রতীক্ষা। এখন যে যে-মতে, যে যে-পথে চলতে পারে, চলুক। আমার গণেরা আমার জন্য চিরকালই অপেক্ষা ক'রে থাক্‌বে। তার জন্য কোনও প্রচার-কার্য্যের প্রয়োজন হবে না।

পূজা কর আমার হৃদয়ের নিধিকে

গদির সহিত সংলগ্ন ঠিক পশ্চাদ্‌ভাগেই বাসা-বাটি।

সায়ংকালে একটী মহিলা ও কয়েকটী কন্যা আসিয়া পুষ্প-বিল্বপত্রাদি দিয়া শ্রীশ্রীবাবামণির পূজা করিলেন এবং ধূপ-ধূনা দিয়া আরতি করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমাকে পূজা ক'রে কি হবে মা, পূজা কর তোমার আমার হৃদয়ের নিধিকে, যাঁকে পূজা ক'রে দীর্ঘ রজনীর হবে অবসান, যাঁকে অর্চ্চনা ক'রে শত শত খণ্ডে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন দেব-দেহগুলি জোড়া লাগবে, মৃত দেহগুলি বেঁচে উঠবে, শরীরের এক অঙ্গের সাথে অন্য অঙ্গের সম্পর্ক যে ছোট-বড়র নয়, পরন্তু অবিচ্ছেদ্যতার, সে কথা এ আত্মবিস্মৃত জাতি বুঝবে।

মহিলারা কথাগুলি বুঝিলেন কিনা, বোঝা গেল না। তাহারা বরং আরও অধিক পরিমাণ ঘটা করিয়া পূজা শুরু করিলেন।

পাগলা, সাঁকো নাড়িস্‌না

শ্রীশ্রীবাবামণি অট্টহাস্যে গৃহ বিকম্পিত করিয়া বলিলেন,—এও মন্দ নয়। তবে শোনো এক ঘটনা। অনেকদিন আগে আমি ত্রিপুরা জেলারই একটা গ্রামে বাস কচ্ছিলাম। একটী মুসলমান যুবক এসে আমাকে বাঘের মতন ধরল যে, তাকে দীক্ষা দিতে হবে। সে নাকি রাত্রে স্বপ্ন দেখেছে, তাই আমার কাছে তার দীক্ষা নেওয়াই চাই। কত বুঝালাম যে, আমি দীক্ষা দিতে পার্ব্ব না, তোমার গুরু অন্যত্র, কিন্তু সে কিছুতেই বুঝ মান্‌বে না। গ্রামের জমিদারের বাড়ী বাস কচ্ছি, তাই আমার মেজাজেও একটু জমিদারী ভাব এল। তড়াক্ ক'রে লাফ দিয়ে

উঠে এক লাঠি নিয়ে করলাম তাকে তাড়া। সে আমার রুদ্রমূর্ত্তি দেখে ভয়ে বাপ্‌রে মারে বলে চীৎকার কত্তে কত্তে পালাল। সেই বাড়ীর একজন কত্তেন ওকালতি, তিনি বল্লেন,—'কাজটা ভাল কল্লেন না। দেখবেন, এতেই আপনার পসার বেশি বেড়ে যাবে।' কল্পনাও করি নি যে, এমন কথা কখনো সত্য হ'তে পারে। কিন্তু কদিন পরেই দেখলাম যে, উকিল বাবুর কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাচ্ছে। তখন ধরলাম মিষ্টি কথার রাস্তা! আর তাড়া দেওয়া নয়।

এই কথা বলিয়াই শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, —এখানেও ব্যাপার তাই হয়ে দাঁড়াল। বল্লুম আমাকে পূজার প্রয়োজন নেই, অমনি যেন পূজার উৎসাহটা বেড়ে গেল। এ যেন পাগলা সাঁকো নাড়িস্ না।

বলিতেই সকলে প্রাণ খুলিয়া হাসিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণিও হাসিতে হাসিতে সেই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া রাস্তায় নামিলেন।

ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ্য

ব্রহ্মচর্য্য আর সন্ন্যাস সম্পর্কে কথা হইতেছে। শ্রীশ্রীবাবামণি মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব হইতে শুকদেব-জনক-সংবাদ সবিস্তারে বিবৃত করিয়া তৎপর বলিলেন,—জনক-রাজাকে শুকদেব জিজ্ঞাসা করলেন যে, ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কি ? রাজা জনক বল্লেন,—"প্রথমে কর্ত্তব্য ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা দেবঋণ পরিশোধ, তৎপরে কর্ত্তব্য দারপরিগ্রহ ও পুত্রোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ

পরিশোধ, তৎপরে বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসধর্ম্ম পালন।" একথায় কিন্তু শুকদেবের সন্তোষ হ'ল না। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা কর্‌লেন,—"যে পরম জ্ঞান লাভের জন্য ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের পরে গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম পালন বিহিত হয়েছে, তা যদি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমেই কারো লাভ হ'য়ে যায়, তবে তার পক্ষেও কি গার্হস্থ্য গ্রহণ প্রয়োজন ?" তখন জনক রাজা বল্লেন—"প্রথমাশ্রমেই যিনি পূর্ণ সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করেন, তাঁর জন্য আর গার্হস্থ্য আশ্রমের প্রয়োজন নেই।"

আ-কৌমার সন্ন্যাসীর সংখ্যাবৃদ্ধির অন্যতম কারণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই গেল সুদূর অতীতের এক চিত্র। যে যুগে মোক্ষই জীবনের পরম কাম্য, ঐহিক সুখসমৃদ্ধি-বৃদ্ধির প্রয়োজন-বোধের সঙ্গে যে মোক্ষ-প্রার্থনার কোনো সম্বন্ধ নেই, জাতিগত বা দেশগত সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি বা সমৃদ্ধির সঙ্গে যার কোনো সম্পর্ক-মাত্রও নেই। ব্যক্তি তার নিজের মোক্ষ-ভাবনা নিয়েই ব্যস্ত ; প্রতিবেশীর মোক্ষ কিসে ব্যহত হচ্ছে, তার দিকে চিন্তা দিয়ে তপঃকালের অপব্যয় করা ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব। সেই যুগে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমেই যদি জীবনের পরম-প্রাপ্য লাভ হ'য়ে গেল, তবে আর গার্হস্থ্য গ্রহণের কোনো তাগিদ নেই। অবশ্য একটা বিষয় বড়ই চমৎকার রূপে সুস্পষ্ট যে, দারপরিগ্রহ আর পুত্রোৎপাদন যার প্রয়োজন, সে পরম তত্ত্বকে জান্‌বার অনুশীলনী রূপেই দারপরিগ্রহ কর্‌বে। এইখানে

দাম্পত্য জীবনকে স্বীকারের পশ্চাতে এক পবিত্রতার আবহাওয়া সৃষ্টির ব্যবস্থা হ'ল। কিন্তু গার্হস্থ্যের কোলাহলে প্রবেশ না ক'রেও যদি মোক্ষলাভ সম্ভব হয়, তবে ক্রমে ক্রমে অধিকাংশ ব্রহ্মচারীই সোজা সন্ন্যাসে দৌড়ে যাবেন না কেন ? ফলে, পরবর্ত্তী যুগের ধর্ম্মসংস্থাপকেরা ক্রমশঃ সন্ন্যাসীর সংখ্যাবৃদ্ধির কাজে প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে মনোযোগ দিয়েছেন। বুদ্ধদেবের সঙ্ঘে পত্নী-পরিত্যাগী ভিক্ষুর চেয়ে অকৃতদার ভিক্ষুর সংখ্যাই ক্রমশঃ বেড়ে চলেছিল। আচার্য্য শঙ্করের সঙ্ঘে পদ্মপাদ, তোটক, হস্তামলক প্রভৃতি আচার্য্যেরা শ্রীশঙ্করের মতই আকৌমার সন্ন্যাসী।

আকৌমার সন্ন্যাসী ও দারত্যাগী সন্ন্যাসী

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আকৌমার সন্ন্যাসীর পক্ষে কতকগুলি সুবিধা আছে, যা দারত্যাগী সন্ন্যাসীর পক্ষে নেই। আবার দারত্যাগী সন্ন্যাসীর পক্ষে কতকগুলি সুবিধা আছে, যা আকৌমার সন্ন্যাসীর নেই। জীবনমাত্রেই সমস্যার আড়ৎ, সুতরাং উভয় শ্রেণীর সন্ন্যাসীরই কতকগুলি সমস্যা রয়েছে, যার সমাধান ছাড়া তাঁরা মোক্ষলাভের আশা কত্তে পারেন না। আকৌমার সন্ন্যাসী জীবনের অনেক জটিল কুটিল অভিজ্ঞতার কথা জানেন না, যার দরুণ মন তার সহজ সরল অনাবিল, কিন্তু ফাঁদে পড়া তার পক্ষে সহজ। দারত্যাগী সন্ন্যাসীর পূর্ব্বজীবনে এমন অনেক প্রকারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে, যার স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেল্‌তে অক্ষম হওয়ার দরুণ তাঁর অভ্যস্ত ইন্দ্রিয়লৌল্য বারংবার আক্রমণ চালাতে চেষ্টা করে। আবার আকৌমার সন্ন্যাসীর অজ্ঞাত

বিষয়ে কৌতূহলও অনেক ক্ষেত্রে তার ব্রতভঙ্গের কারণ হয়। এদিকে দারত্যাগী সন্ন্যাসীর পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা অনেক ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়-বিষয়ে ঔদাসিন্য ও অনাস্থা এনে দেয়। এ ভাবে উভয়বিধ সন্ন্যাসীরই নানাবিধ সমস্যা আছে। সুতরাং কে যে কখন সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে বেশী লাভবান্ হবেন, তা সম্পূর্ণই নির্ভর করে ব্যক্তি বিশেষের মনের গঠনের উপরে।

সন্ন্যাসী, সংসারী ও সমাজ-সেবা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু সন্ন্যাসীকে আজ বর্ত্তমান যুগের আলোকে বিচার করা প্রয়োজন। যে সকল মৃতদার গৃহী ভদ্রলোক সরকারী চাকুরীতে পেন্সন পাওয়ার পরে ঋষিকেশে গিয়ে বাস করেন আর, পেন্সনের কড়ি খোরাকীতে না খরচ হ'য়ে যায়, সেই জন্য গেরুয়া ধারণ ক'রে 'বাবা কালী-কম্লীওয়ালা'র অন্নসত্রে ভিক্ষা গ্রহণ করেন, সে সব সন্ন্যাসীর কথা বল্‌ছি না। যাঁরা হয় সত্য-লাভকে, নয়, জীবসেবাকে লক্ষ্য ক'রে গার্হস্থ্যের ঘানি-টানা ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাস নিচ্ছেন, তাঁরা সমাজের বড়ই হিতকারী। এজন্যই নিজের মোক্ষলাভের আধ্যাত্মিক প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে ভগবৎপ্রীত্যর্থে দেশ, সমাজ ও সাধারণের সেবা-কার্য্যে আত্মদান ছাড়া এযুগের সন্ন্যাসী লোক-শ্রদ্ধা অটুট রাখ্‌তে সক্ষম হচ্ছেন না। আবার, যাঁরা পত্নীত্যাগ না ক'রে সস্ত্রীক নানা সৎকর্ম্মের ভিতর দিয়ে তাঁদের বহির্ম্মুখ কর্ম্মেচ্ছাকে নিয়োজিত রাখেন, পরন্তু অন্তর্মুখ প্রয়াসে অবিরাম ভগবৎ সাধন করেন, তাঁরাও সমাজের বড়ই হিতকারী। এজন্যই

এসব সৎপুরুষ ও সৎ-নারীর যতকাল আবির্ভাব থাকবে, ততকাল গার্হস্থ্যাশ্রমের প্রতি নিন্দাবর্ষণও লোকে সহজে কর্ব্বে না। সাংসারাশ্রম পরিত্যাগ ক'রে গেরুয়া ধারণ না কর্লেও লোকে এঁদের সন্ন্যাসীর প্রাপ্য পূজাই অবাধে প্রদান কর্ব্বে। আবার, যাঁরা অকৃতদার থেকে সংসারী-জঞ্জালে নিজেদের না জড়িয়ে নিজের কুশল ও জীবের কুশলের দিকে তাকিয়ে আমৃত্যু ব্রতপালন ক'রে যাবেন, লোকে তাঁদেরও পূজা অকুণ্ঠিত চিত্তে কর্ব্বে। পূজা পাবার যোগ্যতা যেখান এসেছে, সেখানেই মানুষ পুষ্পাঞ্জলি নিয়ে এগিয়ে যাবে। মহৎকে পূজা কত্তে মানুষের মন কখনো এই তর্ক নিয়ে মারামারি কর্ব্বে না যে, লোকটা গৃহী না সন্ন্যাসী, আর এই ভেবেও কুণ্ঠিত হবে না যে, ছিঃ, কাকে প্রণাম ক'রে ফেল্‌লুম রে ?

শেরপুর (ময়মনসিংহ)
২৫শে চৈত্র, ১৩৪০

পরমাত্মায় আত্ম-সমাহিত হও

একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —ইহকালের এবং পরকালের সুখের আশায় ত' শত শত দেব-দেবীর পূজা কচ্ছ বাছা ? কত্তে চাও, কর, বাধা দিতে চাই না। কিন্তু তুমি যেমন কর্ম্মফলের অধীন, তোমার পূজিত দেবদেবীরাও তেমন কর্ম্মফলের অধীন। স্বরূপবিচ্যুত হয়ে তুমি যেমন সীমাবদ্ধ শক্তির অধিকারী, দেবতারাও ঠিক তাই। সুতরাং যদি নিত্যসুখের লক্ষ্য তোমার থাকে, তবে সীমাবদ্ধ দেবদেবীর পূজার্চ্চনা না

ক'রে অসীম পরমাত্মায় নামযোগে আত্ম-সমাহিত হও।
ত্রিতাপজ্বালা জুড়াবে, অহং-মমাদি অভিমান দূর হবে,
ত্রিভুবনব্যাপী প্রশান্তির মাঝে আত্ম-স্বরূপ প্রত্যক্ষ কর্ব্বে।

নিজেরে চিনিয়া লও নিজে

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি গাহিলেন,—

নিজেরে চিনিয়া লও নিজে।
বাহিরের আঁখি মুদি'
চেয়ে দেখ নিরবধি
তোমার আপন রূপ কি যে!
নিজেরে ভাবিয়া অতি দীন
দেব-নর-গণে ধরি'
তাদের চরণে পড়ি'
থাকিতে চাহিছ পরাধীন;
দেখ রে দেখ আসি'
আপন রূপের রাশি,—
সুষমার তুমি বারিধি যে।
কন্টক-শয্যায় রচরে শয়ন,
বলি দাও শরীরেরে, বলি দাও মন ;
চিত্তের উল্লাস, বিত্তের উচ্ছ্বাস,
সব কিছু করহ নিধন ;
কামনায় আছ বাঁধা,
চোখে লালসার ধাঁধা,

তাই না পূজিছ মনসিজে ?
ডোবরে ডোবরে আজি জলধি-তলে,
তরঙ্গ যেথা নাহি স্রোতের জলে ;
তোমারি মূরতি রাজে
অতল গভীর মাঝে,
বিশ্বের প্রেম ঘিরি' ব্রহ্ম-বীজে
ইন্দ্রিয়াতীত সুখ সৃজে।

ভৈরববাজার (ময়মনসিংহ)
২৭ শে চৈত্র, ১৩৪০

জীবনের চরম চরিতার্থতা

একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন, —তোমার গর্ব্ব করার কিছু নেই বাছা, দর্প-দম্ভেরও অধিকার নেই। করাল কৃতান্ত বিশাল বদন বিস্তারিত ক'রে সকল জীবকে গ্রাস করার জন্য ছুটে আসছে। আত্মরক্ষার উপায় কারো নেই। যেখানে গিয়ে পালাও, কালের কবল থেকে উদ্ধার পাবে না, পাবে না। কিন্তু একমাত্র ভক্তির অমৃত যদি পান কত্তে পার, তবে দেহান্তর হ'লেও তোমার মৃত্যুজ্বালা থাকবে না। ভগবানে অকৃত্রিম ভক্তিই সকল জ্বালার একমাত্র প্রশমক। ভক্তির মধু-স্রোতে মদ, মাৎসর্য্য, অহঙ্কারাদিকে ভাসিয়ে দাও। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের তীব্র মোহকে প্রেমভক্তির স্নিগ্ধ বর্ষায় পরিস্নাত ক'রে পরিশোধিত কর, তা-ই রূপান্তর পাবে অনবদ্য আত্মসমর্পণে। লম্ফঝম্পে নয়, কলকোলাহলেও নয়, একমাত্র প্রেমস্বরূপের পায়ে নিজেকে

বিকিয়ে দেওয়ার ভিতরেই তোমার জীবনের চরম চরিতার্থতা।

শিবপুর (ত্রিপুরা)
১লা বৈশাখ, ১৩৪০

নববর্ষের উপদেশ

চতুর্দ্দিকস্থ চারিপাঁচটী গ্রাম হইতে কয়েক জন উপদশার্থী আসিয়াছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি উপদেশ করিলেন,—অশ্রদ্ধার অন্ন গ্রহণ কর্‌বে না। অস্পৃশ্য নীচকুলোদ্ভব ব্যক্তিকেও সাক্ষাৎ মহেশ্বর জ্ঞানে সম্মাননা দেবে। তীর্থবাসহেতু কখনো মনে অহঙ্কার নেবে না। সাধুজনের সঙ্গ দ্বারা আত্মোন্নতির ও ভগবদ্‌ভক্তিবৃদ্ধির উপকরণ সংগ্রহ কর্‌বে, কিন্তু তুমি যে সাধুসঙ্গী, জনসমাজে তার জন্য মর্য্যাদাপ্রার্থী হবে না। জীবের পার্থিব দুঃখ দর্শনে তার অপার্থিব দুঃখ দূর করার জন্যও প্রাণে ব্যাকুলতা জাগাবে, কিন্তু ঐহিক বা আধ্যাত্মিক যে ভাবেই জীবের সেবা কর, নিজেকে কর্ত্তা বলে ভাববে না, জানবে সকল কর্ম্মের একমাত্র কর্ত্তা শ্রীভগবান্‌! দান ক'রেও নিজেকে গ্রহীতার নিকটে ঋণী ব'লেই জ্ঞান কর্‌বে। পুণ্য-লোভে দান করবে না, দান করবে তোমার ও গ্রহীতার উভয়ের নিত্যকুশল-স্বরূপ ভগবদ্-ভক্তি লাভ হোক্, এই কামনায়। ভগবানে একনিষ্ঠ ভক্ত-ব্যক্তির বাহ্যতঃ কোনও অন্যায় আচরণ দেখলে, তাঁর অন্যায়কে বিস্মৃত হ'য়ে তাঁর ভক্তিকে অনুকরণ কত্তে চেষ্টা করবে এবং নিন্দা না ক'রে লোকের আত্মোন্নতির সহায়তা কর্ব্বে। লোকের পাপের উপরে দৃষ্টি

নিবদ্ধ না ক'রে লোকের পুণ্যের উপরে দৃষ্টিকে সন্নিবেশিত কর্ব্বে এবং সাক্ষাৎ বা মানসিক সঙ্গের দ্বারা জগতের কাছ থেকে কতখানি ঔদার্য্য, নিষ্কামতা ও ভগবদ্-ভক্তির আহরণ সম্ভব, সেই চেষ্টা দেখবে। ভগবানের সৃষ্ট একটী জীবকেও তোমার পর ব'লে মনে করবে না। সকলের প্রতি আত্মীয়-জনোচিত প্রেমভাব পোষণ কর্ব্বে।

সবারে জানিবে প্রাণের বন্ধু

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি কবিতায় বলিলেন,—

সবারে জানিবে প্রাণের বন্ধু, সবারে জানিবে ভাই,
এজগৎ মাঝে একটী প্রাণীও তোমার শত্রু নাই।

সবাই তোমার আপনার জন,
সবাই তোমার হৃদয়ের ধন,
সবারে তোমার বিশাল বক্ষে আশ্রয় দে'য়া চাই।

সবাই যাহারে করে অবহেলা, সে পাবে স্নেহের ঠাঁই,
সবারে ডাকিয়া প্রেমমধু-ভাষে
নিজেরে সঁপিবে তার দুখ-নাশে,
সকলে যাহারে করিয়া পীড়ন দিল শুধু বেদনাই,
সে যে রে তোমার প্রাণের বন্ধু, সে যে রে তোমার ভাই।

—এই হচ্ছে তোমাদের জন্য আমার নববর্ষের বাণী।

২রা বৈশাখ, ১৩৪১

দুর্ব্বলের বল

অদ্য প্রাতে শ্রীশ্রীবাবামণি শিবপুরে একটী সম্ভ্রান্ত মহিলাকে সাধন-দীক্ষা প্রদান করিলেন।

দীক্ষা-দানান্তে শ্রীশ্রীবাবামণি উপদেশ করিলেন,—জীবনে কত সব অপ্রত্যাশিত ঘটনার আবর্ত্তন আস্‌বে, যা কল্পনা কর নি, তেমন সব ব্যাপার ঘটবে ; কিন্তু মনকে চঞ্চল হ'তে দিও না। সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর মত সব সহ্য ক'রে যাবে, আর সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে, অবিরাম-অবিশ্রাম পরমসুখদাতা নামের আশ্রয় নেবে। নামই অগতির গতি, নামই অনাথের নাথ, নামই অশরণের শরণ, নামই দুর্ব্বলের বল। নামই তোমার নিদ্রায়, জাগরণে, জীবনে, মরণে একমাত্র সম্বল।

জাতিভেদ ও পবিত্রতা

দ্বিপ্রহরের পর শ্রীশ্রীবাবামণি ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌঁছিয়াছেন। অপরাহ্ণে বহু যুবকের সমাবেশ হইল।

একজন প্রশ্ন করিলেন,—হিন্দু-সমাজের মধ্যে যে জাতিভেদ রয়েছে, তা দূর করার উপায় কি ?

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—শুধু হিন্দু-সমাজে কেন, অহিন্দু সমাজেও জাতিভেদ রূপান্তরে রয়েছে। এসব দূর হওয়া বিধাতারই অভিপ্রায় জান্‌বে। তবে এজন্য তোমাকে পরিশ্রম কত্তে হবে না বাবা। মহাকাল নিজের বিষাণ নিজে বাজিয়ে এমন অঘটন ঘটাবেন, যাতে ভেদবুদ্ধির শিকড় পর্য্যন্ত উপ্‌ড়ে উঠে আস্‌বে। তোমরা সবাই প্রাণান্ত যত্নে পবিত্র হও, সুধীর

হও,—তারপরে যা দিয়ে যা করবার, ভগবান্ নিজে হাতে ক'রে নেবেন। অপবিত্র ব্যক্তিরা শিব গড়তে বানর গড়ে, ভাত রাঁধতে হাঁড়ি ফাটায়, জল আন্‌তে আগুন জ্বালে। ভগবানের বৃহৎ অভিপ্রায় পূরণের জন্য যন্ত্রীর হাতের যন্ত্রগুলির হওয়া দরকার একেবারে চক্‌চকে, ঝক্‌ঝকে, সুপরিষ্কৃত, সুদৃঢ়। অতএব, বাছারা যে যেভাবে পার, পবিত্র হও আর পবিত্র হও।

রাত্রি আটটার ট্রেণে শ্রীশ্রীবাবামণি চট্টগ্রাম রওনা হইলেন।

চট্টগ্রাম

৩রা বৈশাখ, ১৩৪১

প্রাতে শ্রীশ্রীবাবামণি চট্টগ্রাম পৌঁছিয়াছেন এবং খাতুনগঞ্জ শ্রীযুক্ত যামিনী মোহন দেবের ভবনে উঠিয়াছেন।

পুত্র-কন্যার প্রতি কর্ত্তব্যের গোড়া-পত্তন

অপরাহ্নে বহু ভক্তলোকের সমাবেশ হইয়াছে।

একজন ভদ্রলোক নিজ পুত্র ও কন্যাদের গুণের খুব প্রশংসা করিতে লাগিলেন। শ্রোতারা সকলেই মনে মনে বিরক্তি অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু শ্রীশ্রীবাবামণি ধৈর্য্য সহকারে আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিলেন। তৎপরে বলিলেন,—নিজ নিজ পুত্র-কন্যাকে নিজৌরসোৎপন্ন জীব-বিশেষ জ্ঞান না ক'রে, তা'দিগকে ভগবানের অবতার ব'লে জ্ঞান কর্ব্বে। ভগবানের পূজাস্থানকে যেমন কেউ অপবিত্র হ'তে দেয় না, তোমার ছেলেমেয়ের ক্রীড়াভূমি তোমার এই সংসারকে তেমনি সকল অপবিত্রতা থেকে মুক্ত রাখবে। মিথ্যা, কপটতা, অসংযম, কদাচার প্রভৃতিকে পুত্র-কন্যার জন্যই

প্রাণ-পণ যত্নে দূরে রাখ্‌বে। মা-যশোদা এবং পিতা-নন্দের মনোভাব শ্রীকৃষ্ণ-ভগবানের প্রতি যেমন ছিল, নিজ সন্তান-সন্ততির প্রতি সেই পবিত্র মনোভাব রাখবে এবং অন্যায্য ব্যবহার ও অনর্হ আচরণ থেকে পরিবারস্থ প্রত্যেকটী ব্যক্তিকে সর্ব্বপ্রযত্নে আত্মরক্ষা করে চল্‌তে বাধ্য কর্‌বে। সংসারটীর প্রতিবেশ সৃষ্টি কর্‌বে পূজার, দিবারাত্রি একটা ভগবদারতির স্পন্দন ভিতরে বাইরে জাগিয়ে রাখ্‌বে। তবে হবে তোমার পুত্র-কন্যার প্রতি কর্ত্তব্য সম্পাদনের গোড়াপত্তন।

পরের ছেলের ভিতরে বালকৃষ্ণ দর্শন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমার নিজের ছেলেটীর ভিতরেই শুধু ভগবৎসত্তা রয়েছে, তা' নয়। পরের ছেলেটীর ভিতরেও ভগবৎসত্তা রয়েছে। পরের ছেলেটীর ভিতরেও সেই বালকৃষ্ণের নিত্যকিশোর মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ কর। ভগবানকে সকলের ছেলের ভিতরে দেখ। তা' হলেই নিজের ছেলের প্রতি কর্ত্তব্য-সম্পাদন তোমার নির্ভুল হবে।

জন্মমাত্র শিশুদের আশীর্ব্বাদ কর

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কোথাও কারো একটী শিশু জন্মেছে শোনামাত্র তাকে প্রাণ ভ'রে আশীর্ব্বাদ কর্ব্বে, সে যেন ভগবানের অবতারত্ব তার মাঝে ফুটিয়ে তুল্‌তে পারে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাবে—'হে পরমেশ্বর, বারংবার প্রতি জীবের মধ্য দিয়ে তুমিই ত' আত্মপ্রকাশ কত্তে চাইছ, কিন্তু আধারের অশুদ্ধতার জন্য তোমার আত্মবিকাশ আর হ'য়ে উঠছে

না। এর ফলে জীবকুল কেবলই মোহান্ধকারে ডুবে ডুবে দুঃখ পাচ্ছে। তুমি ইচ্ছা কল্লেই যে-কোনও অপূর্ণ আধারকে পূর্ণ ক'রে নিতে পার, তুমি ইচ্ছা কল্লেই যে-কোনও অশুদ্ধ আধারকে শুদ্ধ ক'রে নিতে পার। আমার প্রার্থনা এই, তুমি এই নবজাত আধারটীকে শুদ্ধ ক'রে নাও নিজ কৃপা গুণে, পূর্ণ ক'রে নাও তোমার ঐশ্বর্য্যের প্রতাপে, এর মধ্য দিয়ে তুমি নূতন ক'রে পৃথিবীর সহস্র দুঃখ-বেদনা দূর করার ব্যবস্থা কর।'

সবাই অবতার হও

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দেখ, নিজে অবতার হ'য়ে আবির্ভূত হ'য়েও, আরও অবতার হোক, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই ইচ্ছাটা কমে নাই। তাই তিনি বল্লেন, সম্ভবামি যুগে যুগে। তাঁর অবতার হ'য়ে সাধ মেটেনি ব'লেই তিনি পরবর্ত্তী যুগ-সমূহেও অবতার হ'য়ে আসবার বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। আমিও অবতারের অবতরণ জগতের জন্য অতি আবশ্যকীয় মনে করি। কিন্তু একটী দুটী অবতার দেখে মনে সন্তোষ আসে না। আমি চাই সমগ্র জগৎ অবতারে পরিপূর্ণ কত্তে। প্রতি জীবে ভগবানের পরিপূর্ণ অবতারণকে সম্ভব করাই আমার জীবনের সাধনা, আমার সাধনার লক্ষ্য, আমার প্রধান ব্রত, আমার সকল ব্রতের নিষ্ঠা। দুদিন পরে তোমরা হয়ত আমাকেই অবতার ব'লে পূজা সুরু ক'রে দেবে, অবতার-বাদে তোমাদের গত ভক্তি। আমি বল্‌ব না, আমি অবতার নই। কারণ, সত্যকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তোমাদের সেই পূজা আমি চাই

না। যেদিন তোমরা জান্‌বে যে, তোমরা সবাই অবতার, সেদিন তোমাদের পূজা আমাকে তৃপ্তি-তুষ্টি দিতে পারবে। বলো, তোমরা সবাই ভগবানেরই অবতার, জানো তোমরা সবাই ভগবানেরই অবতংস। তোমরা নিজেদের গৃহে গৃহে এমন জগৎ গ'ড়ে তুলবে যে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র, যীশুখ্রীষ্ট, শ্রীবুদ্ধ আদি অবতারেরা তোমাদের প্রতি গৃহে আবির্ভূত হবেন, আর দানবের তাণ্ডব হ'তে জগৎ চিরতরে মুক্তি পাবে। এই চিত্র আমার স্বপ্নের জাগরণ, আমার জাগরণের স্বপ্ন।

চট্টগ্রাম
৪ঠা বৈশাখ, ১৩৪১

শ্রীশ্রীবাবামণি দুই ঘণ্টা সময়ের জন্য খাতুনগঞ্জ হইতে অন্য এক ভক্তগৃহে আসিয়াছেন।

সধবা অবস্থায় মরা

জনৈক মহিলা আশীর্ব্বাদ চাহিলেন,—বাবামণি আমি যেন আমার স্বামীর আগে মর্‌তে পারি।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—তোমার এ প্রার্থনা পূর্ণ হোক্। কিন্তু মা, স্বামীর মৃত্যুর দুদিন, পাঁচদিন, সাতদিন আগে সধবা থাক্‌তে মরবার কামনা ত' এ দেশে হাজার হাজার মেয়েরাই করেন, পরন্তু স্বামী যাতে দীর্ঘজীবী হন, স্ত্রীর আগে না ম'রে যান, তার জন্য কোনো তদ্বির ত' কেউ কিছু করেন না। স্বামীর চিত্তের উদ্বেগ, হৃদয়ের ব্যথা, দারুণ শ্রম কমিয়ে দিয়ে তাঁকে নিশ্চিন্ত মনে দীর্ঘায়ুজনক সৎ-সাধনে লগ্ন হবার সুযোগ ক'জনে দাও ? অমনিই ত' স্বামীর বয়স তোমার চেয়ে

পাঁচ সাত দশ বছর বেশী। তারপরেও যদি তুমি তাঁর আগে মরে সুখী হ'তে চাও, তবে তাঁর পরমায়ু ত' অনেক বৃদ্ধি পাওয়া প্রয়োজন। সেই বিষয়ে তোমার কি করণীয় আছে, সেই কথাটাও চিন্তা ক'রো! শুধু ভাল ভাল আশীর্ব্বাদ যাজ্ঞা কর্ল্লেই কিন্তু চল্‌বে না।

বিপজ্জনক পতিভক্তি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সংসারের অনটন মিটাতে গিয়ে স্বামীকে দিনরাত হয়ত কুলীর মত খাট্‌তে হয়, খাট্‌তে খাট্‌তে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েন। তিনি কেন এত খাটেন, এই কথা ধ'রে তাঁকে তিরস্কার ক'রে, তার সঙ্গে কলহ ক'রে, বৃথা মান-অভিমান ক'রে ক'রে অনেক সধবারা পতিভক্তি প্রদর্শন করেন। এই জাতীয় পতিভক্তি অতীব বিপজ্জনক বস্তু—একে স্বামিহত্যার ষড়যন্ত্র আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। সংসারেরই ঘানি টান্‌তে গিয়ে অনেক স্বামী সকালে জলযোগ করার বা বিকালে ভ্রমণ করার ফুরসুৎটুকু পান না। অনেক সধবারা এই সব স্থলে স্বামীকে মর্ম্মঘাতী কথা ব'লে প্রাণে ব্যথা দিয়ে পাঁজরে অপমানের জ্বালা ধরিয়ে তাঁদের স্বাস্থ্যোন্নতি কত্তে চায়। এদের সতী স্ত্রী না ব'লে সাক্ষাৎ প্রাণহারিণী ডাইনি বলা উচিত। স্বামীর সকল কর্ত্তব্য কর্ম্মের মাঝখানে অনধিকার-চর্চ্চা ক'রে যেই সরল সহজ কাজকে জটিল কুটিল আবিল করা উচিত নয়, অনেক কর্ত্তৃত্বলিপ্সু সধবা সেই সব স্থলে গিয়েও অকারণ হস্তক্ষেপ করে এবং স্বামীকে বৃথা বিরক্ত বা উত্যক্ত করে। তারাও প্রকারান্তরে

স্বামীর আয়ুহরণই করে। সদয়-হৃদয় প্রাণবান্ প্রেমিক স্বামীর একনিষ্ঠ প্রেমের অধীশ্বরী হ'য়ে অনেক সধবা এত দাম্ভিকা ও প্রভুত্বপ্রিয়া হ'য়ে পড়ে যে, এদের কর্ত্তৃত্বের চাপে স্বামী বেচারীর প্রাণ ত্রাহি-ত্রাহি ক'রে কাঁদে, প্রাণের বেদনা বুকে চেপে রেখে নীরবে গোবেচারী স্বামী দাসত্বের পাষাণ-ভার বহন ক'রে বেড়ায়। কাপড়, জামা, জুতা, চাদর, ছড়ি বা ঘড়িটা পর্য্যন্ত স্বাধীন ভাবে কিন্‌বার সাহস থেকে বঞ্চিত হ'য়ে তারা নীরবেই অকালে ম'রে যায়। এমন সব দুর্ভাগা স্বামীর স্ত্রীদের পক্ষে সধবা অবস্থায় মরার প্রার্থনা একটা জ্বলন্ত কপটতা ছাড়া আর কিছুই নয়। যে স্ত্রী তার স্বামীকে মুখের হাসি আর প্রাণের ভালবাসা দিয়ে চালাতে পারে না, চালাতে চায় ক্রোধ, উত্তাপ, অপমান, দুর্ব্বাক্য আর দুর্জ্জয় অভিমান দিয়ে, তাদের সধবা অবস্থায় মৃত্যুর কামনা করা উচিত নয়। যেখানে স্ত্রী একান্ত বিনীতা, সবল দেহে সরল মনে একান্তই সেবিকা, স্বামীকে সেবা দিয়ে মনে অহমিকা নেই, স্বামীকে সেবা দিয়েই তার প্রাণ মন কৃতার্থ, স্বামীর সেবার বিনিময়ে যে প্রতিদানের প্রত্যাশা মাত্রও করে না, যার নিরহঙ্কার আত্মসমর্পণের কাছে এসে আপনা আপনি স্বামীর কর্ত্তৃত্ববোধ প্রভুত্ব-বোধ লোপ পেয়ে যায়, তেমন মেয়ে যখন বিধবা হয়, তখন বনের হিংস্র পশুটা পর্য্যন্ত তার এই স্বামি-বিয়োগ-দুঃখে কেঁদে ওঠে, নির্ম্মম নিষ্ঠুর পাষাণের চোখেও তার জন্য সহানুভূতির অশ্রু ঝরে। কিছুদিন আগে একস্থানে গিয়েছিলাম। একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি মারা গেছেন শুনে তাঁর বাড়ীতে গেলাম শোকার্ত্তদের সান্ত্বনা দিতে। গিয়ে দেখলাম, আরও অনেক দামী দামী লোক

সান্ত্বনা দেবার জন্য গিয়েছেন। এদের দেখেই মৃত ব্যক্তির বিধবা পত্নী ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদ ক'রে একজনের পায়ের উপরে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়্লেন। অনেকেই বিধবা মহিলাটীর নানারূপ প্রশংসা কত্তে লাগলেন। ইনি বিদুষী, ইনি সাধিকা, ইনি ধর্ম্মজ্ঞা, ইনি অতিথি-পরায়ণা, ইনি দানশীলা, ইনি দীন-দুঃখীর প্রতি দয়াশীলা ইত্যাদি নানাবিধ প্রশংসাই হ'তে লাগ্ল। কথা একটীও মিথ্যা নয়, সত্যই এই মহিলা এতগুলি গুণেরই আধারস্বরূপা। মৃত স্বামীরও যথেষ্ট প্রশংসা হ'ল। এভাবে সদ্যো-বিধবা মহিলার শোকের বেগ কিছু শান্ত হ'লে তাঁকে গৃহান্তরে নিয়ে যাওয়া হ'ল। তখন আবার সান্ত্বনাদাতা সজ্জনদের ভিতরে অন্যরূপ কথা সুরু হ'ল। একজন জিজ্ঞাসা কল্লেন,—এত গুণ যাঁর, ভগবান্ তাঁকে বৈধব্য দিলেন কেন ? অপর একজন বল্লেন,—বিধাতার বিধানের বিচার করা আমাদের সাধ্যের অতীত। অপর একজন বল্লেন,—এই মহিলার সদ্গুণের অভাব ছিল না, পতিভক্তিও অসাধারণ ছিল, কিন্তু নিজের কর্ত্তৃত্ব-লিপ্সা-হেতু স্বামীকে এক এক সময়ে মর্ম্মান্তিক অপমানজনক কথা বল্তেন যে, স্বামী তখন মৃত্যু-কামনা কত্তেন। সান্ত্বনা-দাতারা একথা শুনে একেবারে চুপ্ মেরে গেলেন কিন্তু এঁদের মধ্যে একজন লোক ছিলেন বড়ই দুর্ম্মুখ। তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন,—তবে ভগবানের বিচারে ভুল কিছুই হয় নি, জীবন্তে তিনি স্বামীকে মৃত্যুযন্ত্রণা দিয়েছেন, বৈধব্য ত' তার পক্ষে একান্ত সঙ্গত প্রাপ্তি। একথা শোনার পরেই আমি স্থানত্যাগ কর্ল্লাম।

কিসে স্বামীর আয়ু বাড়ে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—স্বামীকে সংযত, ধার্ম্মিক ও সাধননিষ্ঠ করার চেষ্টা কর্‌লে স্বামীর আয়ু বাড়ে। স্বামীর মনকে আঘাতে জর্জ্জরিত না ক'রে প্রাণপণ যত্নে প্রফুল্ল রাখবার চেষ্টা কর্ল্লে স্বামীর আয়ু বাড়ে। শুধু আমার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা কর্ল্লেই হবে না মা, এই কথাগুলিও মনে রাখতে হবে।

বিশ্রামস্থানে আসিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি এক তাড়া চিঠি পাইলেন। কয়েক খানার উত্তর দিলেন। নিম্নে তিন খানার অনুলিপি লিখিত হইল।

কত জনে করে

একজনের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

''মনটা গানের সুরে ভরিয়া গিয়াছে। গাহিতেই ইচ্ছা করে, প্রতিবেশীদের শান্তি-ভঙ্গের ভয়ে গাহিলাম না। তাই গানটী তোমাকে লিখিয়া পাঠাইলাম। যেদিন হাতে পড়িবে, সেদিনই যে সুরে পার গাহিয়া দেখিও। তাহা হইলে বুঝিবে কি তৃপ্তি নিয়া ইহা লিখিলাম।

কত জনে করে কত জনে নির্ভর,
তুমি ছাড়া মোর কেহ ত' আপন নাই,
মাথার উপরে বহিলে বিষম ঝড়,
তুমি ছাড়া আর কার কাছে আমি যাই ?
দিকে দিকে দেখি কত যে বিপদ হয়
কত যে বিপুল তরঙ্গে বহি' যায়,

কত বিচিত্র অকূল জটিলতায়
বাঁধে যে আমারে পার-কূল নাহি পাই॥
শিশু তার মায়ে সবলে জড়ায়ে ধরে,
নির্ভয়ে তার মায়ের কোলেই মরে;
তেমনি আমি যে কেবলি তোমারি' পরে
নির্ভর করি' মুছিয়া যাইতে চাই;
সহস্র যদি বিঘ্ন আসিয়া পড়ে,
তথাপি যেন না অপরের পানে ধাই॥
জীবন-গগনে উদিলে যেদিন আসি'
দেখিনু তোমার নয়ন-সলিলে ভাসি',
বিচার করিনি তব দোষ-গুণ-রাশি,
তব করুণায় তব পায়ে পেনু ঠাঁই,
স্বজনবন্ধু সকল হইল বাসী,
কারো সাথে মোর কোনো বন্ধন নাই॥
যত বন্ধন সকলি তোমারি সাথে
সরস দিবসে নীরব গভীর রাতে,
সন্ধ্যা-আঁধারে উজল মধুর প্রাতে
মোর আঁখি গাহে তোমারি বন্দনাই,
ছল ছল জল-ধারায় আপন হাতে
অনুদিন আমি তোমারি পদ ধোয়াই।
নিঃশেষে আমি নিজেরে উজাড় করি'
ঢালিয়া দিয়াছি তোমারি চরণোপরি,
দুঃখ-বিপদে তাই ত' তোমারে স্মরি,

তোমারে ডাকিয়া প্রাণে কি তৃপ্তি পাই !
তুমি ছাড়া মোর কেহ যে নাহিক হরি,
মোর সান্ত্বনা শান্তি আমার তাই ॥
যদি কিছু থাকে বাহিরের দিকে মন,
হে দয়াল কর আপন হাতে নিধন;
তুমিই আমার একক আলম্বন
জানা-অজানায় হয়ে থাকো হে সদাই ;
তোমারে পাইয়া পেয়েছি সকল ধন,
মনে প্রাণে শুধু এই অনুভূতি চাই ॥''

সকলকে আপন করিবার কৌশল

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

''কোন মঠ, সঙ্ঘ, সম্প্রদায় বা জাতি তাঁহাদের মতামত প্রচারের দ্বারা বা অন্য কোনও উপায়ে দলপুষ্টি করিতেছেন দেখিয়া দুঃখিত, ব্যথিত বা ঈর্ষ্যান্বিত হইবার তোমাদের কোনও কারণ নাই। সকলকে সকলের মত প্রচার করিতে দাও, সকলকে সকলের দল বাড়াইতে দাও, সকলকে সকলের পন্থানুসরণ করিতে দাও। সমগ্র জগতের প্রতিটি নরনারী একটা মাত্র নির্দ্দিষ্ট পথের আশ্রয় কখনও লইবে না, অতএব তোমাদের যদি প্রচারশীলতার প্রসারশীলতার প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলে তোমাদের মতের অনুবর্ত্তী হইবার লোকের কখনও অভাব হইবে না। নানা প্রকার রং-তামাশা দেখাইয়া নানা প্রকারের অদ্ভুত

ব্যাপার করিয়া, কত দল কত ভাবে নিজেদের পরিপুষ্টি করিয়া যাইতেছে, ইহার প্রকৃত মানে কি জানো ? পৃথিবীর লোক মতির কোনও স্থিরতা পাইতেছে না। মনের ধর্ম্মে কখনও তাহার সঙ্কল্পের উত্থান হইতেছে, কখনও বা তাহার পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। কোথায় তাহার প্রকৃত স্থিতি, তাহা সে জানিতে পারিতেছে না, তাই যেখানে উচ্চকণ্ঠে যে কথা হইতে শুনিতেছে, তাহাকেই সত্য বলিয়া মনে করিয়া জাগ্রত মনোভঙ্গীকে আবার ঘুম পাড়াইতেছে। যেখানে আত্মার জাগরণের নাম করিয়া লৌকিক আমোদ-প্রমোদ আস্বাদন করিবার সুযোগ পাইতেছে, সেখানে সহজে তাহার রুচি বেশী হইতেছে। এই সকল ব্যাপার হইতে তোমারা শিক্ষা লাভ কর যে, বিশ্বের সকলের যিনি প্রাণ, তোমাদের প্রাণকে তাঁহার কাছে গচ্ছিত রাখিয়া যেন তোমরা তাঁহার প্রতিনিধি-রূপে সকলকে ডাক দিতে পার। বাক্যের চাতুরীতে নহে, লোক-প্রচলিত আমোদ-প্রমোদের মধ্য দিয়া নহে, পরন্তু সকলের যিনি প্রাণ, তাহাকে অব্যভিচারিণী নিষ্ঠায় ভালবাসিয়াছ বলিয়া সেই ভালবাসারই শক্তিতে তোমরা সকলের প্রাণের মূল ধরিয়া টান দাও। চালাকি বা কৌশলে কে বড় হইল, তাহার বিচার করিয়া সময় নষ্ট করিবার তোমাদের প্রয়োজন নাই। কত সরল ভাবে ভগবান্‌কে ডাকিয়া তাঁহাকে নিজের অন্তরের ভিতরে পাইয়াছ এবং তাহার দরুণ সমগ্র বিশ্বকে টানিয়া কাছে আনিতে পারিতেছ, তাহার দিকে তোমার হউক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। সকলকে আপন করিয়া লইবার ইহাই কৌশল। সকলে তোমার মতানুবর্ত্তী না হইতে পারে, কিন্তু সকলেই তোমার

আত্মার আত্মীয় হইয়া বিশ্বের আপন হইতে পারে। যে স্থলে চারিদিকে কেবলি দেখিতে পাইতেছ যে যতগুলি দল হইতেছে, ততগুলি যুধ্যমান বিরোধী শিবিরেরই মাত্র সৃষ্টি হইতেছে, সেখানে তোমরা জগতে ইহা দেখাইতে সমর্থ হও যে, সকল মতের সকল পথের নিদারুণ বিস্তারের মধ্যেও তোমার বলক্ষয় বা দলক্ষয় করিবার সাধ্য কাহারও নাই। যে যেখানে যে ভাবেই যেই দলটী গড়িয়া তুলুক না কেন, তুমি জানিয়া লও যে, সকলে তোমারই বিরাট দলটীর অন্তর্ভুক্ত হইতেছে মাত্র।"

তোমরাই আমার বাসগৃহ

অপর এক পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"আমাকে সাহায্য করিতে চাহিয়াছ দেখিয়া কি যে খুশী হইয়াছি তাহা বলিবার নহে। সত্যই আমি তোমাদের সাহায্য চাহি। আমার দুইটী মাত্র বাহু যেখানে কাজ করিতেছে, সেখানে সহস্র-কোটি বাহুর আবির্ভাব আমি কামনা করি ; সত্যই আমি চাহি যে, তোমরা আমার বাহু হও। কিন্তু কেমনে তোমরা আমার বাহু হইবে ? তাহার উপায়ও বড় সহজ। তোমরা যে যেখানে থাকিয়া নিজের নিঃশ্রেয়স কল্যাণ সাধনের জন্য ব্রতী হইয়াছ, সে সেইখানে থাকিয়াই আমার কাজ করিতেছ। তোমরা নিজের জন্য যাহা করিতেছ, সে কাজ আমারই কাজ,—কেননা, আমি তোমাদেরই মধ্যে নিয়ত বাস করিতেছি, আমার অন্য কোনও বাসগৃহ নাই। তোমরা আমার বাসগৃহ বলিয়াই আমি তোমাদের মধ্যে পবিত্রতার প্রতিষ্ঠাকে অত অধিক কাম্য বলিয়া

মনে করি। কে না চাহে পরিচ্ছন্ন, পবিত্র স্বচ্ছ স্থানে বাস করিতে ? নিয়ত আমি অনুভব করি, পরমাত্মা তাঁর অতুল মাধুর্য্যে অনুপম সৌন্দর্য্যে অসীম ঐশ্বর্য্যে আমার ভিতরে অবস্থান করিতেছেন। আমি যে তোমাদের মধ্যে সমগ্র প্রেমটুকু নিয়া বাস করিতেছি, তাহা তোমরা কবে অনুভব করিবে ?''

রহিমপুর আশ্রম
৬ই বৈশাখ, ১৩৪১

সারা রাত্রি ট্রেণে জাগিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি অদ্য বেলা এগারটায় রহিমপুর আশ্রমে পৌঁছিয়াছেন। এই তারিখেই এই আশ্রমে শ্রীশ্রীবাবামণির সাম্বৎসরিক মৌনভঙ্গ হইয়াছিল বলিয়া, গ্রামের যুবকেরা এই তারিখটীতে একটী উৎসব করিয়া থাকেন।

হরি-ওঁ কীর্ত্তন চলিতেছে, এই সময়ে শ্রীশ্রীবাবামণি আসিয়া আশ্রমে পৌঁছিলেন।

উল্লাসের তরঙ্গ ছুটিল। জননীদের উলুধ্বনিতে দশ দিক্ প্রকম্পিত হইল। বালক, বৃদ্ধ, যুবা, প্রৌঢ় নির্ব্বিশেষে সকলে মিলিয়া অপূর্ব্ব কণ্ঠে কীর্ত্তন চালাইলেন, —''হরি-ওঁ, হরি-ওঁ, হরি-ওঁ, হরি-ওঁ।''

পাগলা যোগেশ

আনন্দের আতিশয্য কথঞ্চিৎ উপশান্ত হইলে শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহার সুমধুর কণ্ঠে কীর্ত্তন ধরিলেন,—''হরি-ওঁ, হরি-ওঁ, হরি-ওঁ, হরি-ওঁ।

শত কণ্ঠে মেঘমন্দ্রে সুরলহরী-সমন্বয়ে হুঙ্কারিয়া উঠিল,—''হরি-ওঁ, হরি-ওঁ, হরি-ওঁ, হরি-ওঁ।

কখনো মৃদু, কখনো গভীর কণ্ঠে শ্রীশ্রীবাবামণি গাহিতে লাগিলেন,—"হরি-ওঁ, হরি-ওঁ, হরি-ওঁ, হরি-ওঁ।"

অনুরূপ প্রতিধ্বনি করিয়া শত কণ্ঠ গাহিতে লাগিল, —"হরি-ওঁ, হরি-ওঁ, হরি-ওঁ, হরি-ওঁ।"

চম্পকনগর নিবাসী একটী দীর্ঘ-কেশ গৌরতনু যুবক এক-লক্ষ্যে শ্রীশ্রীবাবামণির শ্রীমুখ পানে নির্নিমেষ নয়নে তাকাইয়া অবিরাম অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিলেন।

সহসা শ্রীশ্রীবাবামণি এই যুবককে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন। যুবকের দেহ নিঃস্পন্দ হইল। হস্ত-পদ শিথিল অপ্রযত্ন হইল, সংজ্ঞাহীন হইয়া যুবক শ্রীশ্রীবাবামণির পাদমূলে ঢলিয়া পড়িলেন।

ভক্তপ্রবর গিরিশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ছুটিয়া আসিয়া যুবকের দেহলতা ধরিয়া দেখিলেন, শরীর হিম হইয়া গিয়াছে, শ্বাস-প্রশ্বাস নাই। শ্রীযুক্ত গিরিশ জিজ্ঞাসা করিলেন,—এ কি মৃত ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—না, মৃত নয়, সমাধিস্থ। উচ্চতম অনুভূতির রাজ্যে এই যুবকের মন, প্রাণ, আত্মা, বিচরণ ক'রে বেড়াচ্ছে,—ফিরে এল ব'লে।

মুখে মুখে উচ্চারিত হইল,—ইনি কে, ইনি কে ?

শ্রীযুক্ত গিরিশ বলিলেন,—ইনি হচ্ছেন পাগ্‌লা যোগেশ।

পাগ্‌লা যোগেশকে নিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি একান্তে যাইয়া বসিলেন। কীর্ত্তন-স্থলীতে কীর্ত্তন চলিতে লাগিল।

শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র

পাগ্‌লা যোগেশ বলিলেন,—বাবামণি, এর আগে আর আমি

তোমাকে কখনো দেখি নাই। তবু আজ হঠাৎ এত আপন ব'লে অন্তরে জাগল কেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যাকে কখনো দেখ নি, সেও তোমার অনন্ত-কালের চির-পরিচিত। যাকে ভাব্‌ছ দূরে, অতি দূরে, সেও তোমার একেবারে অন্তরতম। যে অঙ্ক-শাস্ত্রের নির্দ্দেশে দূরত্বের এবং নিকটত্বের হিসাব লোকে করে, তার চেয়ে বড় একটা শাস্ত্র আছে। তারই নির্দ্দেশে সকলে সকলের আপন, সকলে সকলের নিকট। তারই নির্দ্দেশে কেউ কারো দূর নয়, কেউ কারো পর নয়। সেই শাস্ত্র তোমার ভিতরে জেগে উঠেছে। তাই তুমি চিনেছ, তাই তুমি জেনেছ।

তুমি যারে দাও হে চেনা

এমন সময়ে ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী আসিয়া যোগ দিলেন। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে স্বরচিত সঙ্গীত গাহিতে লাগিলেন।

তুমি যারে দাও হে চেনা
　　সে-ই তোমারে চিন্‌তে পারে,
নিজে না দিলে হে ধরা
　　কে চিনিবে এ সংসারে।
তুমিই পিতা, তুমিই মাতা,
তুমি হে বিশ্ব-বিধাতা,
তুমিই জ্ঞান, তুমিই জ্ঞাতা,
　　বল্‌ব কত বারে বারে।

গুরু তুমি, শিষ্য তুমি,
তুমিই আকাশ, তুমিই ভূমি,
গ্রহ-তারা-নক্ষত্রগণ
তোমারি রূপ প্রকাশ করে।

তোমায় ভুলে অনিত্যেতে
স্ত্রী-পুত্র-বিষয়ে মেতে
দু-হাত ভ'রে দুঃখ কুড়াই,
সংসারে সুখ হাড়ে হাড়ে।
গিরিশ বলে, দাও চেনা দাও,
তোমার কোলে নাও টেনে নাও,
জীবন যে মোর বৃথাই গেল
বিষয়-বোঝা নিয়ে ঘাড়ে।

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র গাহিতেছেন আর কাঁদিতেছেন। কখনও বসিয়া কখনও দাঁড়াইয়া, কখনও শ্রীশ্রীবাবামণিকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে, কখনও অপলক নেত্রে তাকাইয়া, কখনও নিমীলিত নয়নে গিরিশচন্দ্র কেবলই গাহিয়া চলিয়াছেন,—তুমি যারে দাও হে চেনা।

অন্তরে তোর অন্তরতম

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্রের ভাবের আবেগ একটু কমিলে শ্রীশ্রীবাবামণি স্বরচিত সঙ্গীতে উপদেশ দিলেন,—

অন্তরে তোর অন্তরতম
ভুবন-মোহন হরি

করিছে বিলাস সুগোপনতম
বাসনার রূপ ধরি'॥
যা ছিল অচেনা প্রেমে হ'ল কেনা,
প্রদানে আদানে জ'মে গেল দেনা,
এ যে তাঁরি দায়, মন কি বোঝে না,
তাই ভয়ে থরথরি'
কাঁপিছে হৃদয় কি জানি কি হয়,
করিয়া এ সংসারী ?
তুই যাঁর, ওরে, সংসার তাঁর,
সব ভুলে তাঁরি হাতে দেরে ভার,
তাঁহারি বিষয়, তাঁহারি বিকার,
কোনো লাভ নাই ডরি';
নির্ভয়ে তুই আগাইয়া চল্
লাজ-ভয় পরিহরি'।
ছুটিতেছে মন সংসার-পানে ?
তোর প্রভু যে রে আছে সেইখানে।
সংসার তাঁর মধুর লীলার,—
যাস্‌না রে বিস্মরি',
নিজেরেই নিজে দেখিবে চাখিয়া,
তাই নিল সব গড়ি'।
তুই তিনি, তোর বাসনাও তিনি,
লালসা-লাস্যে তাঁরি কিঙ্কিণী

বাজে তাণ্ডবে প্রাণোন্মাদিনী
চিত্ত মথিত করি'—
ভয় বিতাড়িয়া সাহস করিয়া
লহ রে তাঁহারে বরি'।

শুনিতে শুনিতে গিরিশচন্দ্র স্থির হইলেন। তাঁহার মুখে চ'খে বিশ্বাসের স্থিরতা ও নির্ভয়ের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল।

ভবিষ্যদ্‌বংশীয়দের জন্য সম্পদ সঞ্চয়

সন্ধ্যার পরে সমবেত উপাসনা হইল। উপাসনান্তে শ্রীশ্রীবাবামণি উপদেশ করিলেন,—* হে পুত্রগণ, তোমরা যদি আমারই সন্তান হ'য়ে থাক, তবে তোমরা মন দিয়ে শোন, প্রাণ দিয়ে শোন, শুধু কাণ দিয়ে শুনলেই যথেষ্ট হবে না। তোমরা ভবিষ্যৎ জগতের প্রজাসমূহের স্রষ্টা, ভবিষ্যৎ জগতের জনগণের পূর্ব্বপুরুষ, ভবিষ্যৎ জগতের ভাগ্যবিধাতা। তোমাদিগকে আজ তপস্যার বীর্য্যে অন্তরস্থ সুপ্ত ব্রহ্মকে জাগিয়ে তুলতে হবে। তোমাদিগকে আজ তপোলব্ধ প্রতিভার বলে জান্‌তে হবে, তোমাদের ভবিষ্যদ্‌বংশীয়দের জন্য কোন্ সম্পদ আজ সঞ্চয় কত্তে হবে। তা কি কামুকতার না সংযমের, হিতাহিত-বোধ-বর্জ্জিত ভোগলোলুপতার, না আত্মবোধ-সমন্বিত ইন্দ্রিয়-দমনের? ভবিষ্যৎ জাতিকে কি তোমরা ভূষিত কর্ব্বে ছাগসুলভ চরিত্রে না দেবদুর্ল্লভ চরিত্রে? মৌখিক উত্তরের প্রতীক্ষা কচ্ছি না, আমি চাই কর্ম্মের মধ্য দিয়ে অভ্রান্ত উত্তর। শত শত সন্ন্যাসীর সৃষ্টির

* কুমারীর পবিত্রতা, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় পত্র।

জন্য আমি আবির্ভূত হই নাই। দুর্লভ সন্ন্যাসী জগতে আপনিই দুই চারিজন আবির্ভূত হবেন, তাঁদের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য কোনো চেষ্টার প্রয়োজন দেখি না। আমার সন্তানেরা অধিকাংশেই গৃহী হবে। কিন্তু গার্হস্থ্য জীবনে তোমরা কেমন সঙ্গিনী চাও ? ভোগলুব্ধতার সৃষ্টিকারিণী নরকদায়িনী রাক্ষসীর সঙ্গ কি চাও? না, ত্যাগপ্রবুদ্ধা সংযমানুরাগিণী ব্রহ্মদান-সুসমর্থা সঙ্গিনী ? কি চাও, স্পষ্ট ক'রে অন্তরকে জিজ্ঞাসা কর এবং স্পষ্ট ক'রে তার জবাব নাও। যদি ত্যাগসুন্দর জীবন যাপনে সহায়তাকারিণী সহধর্ম্মিণী চাও, তবে জেনো, তাকে পাবে সেই সকল কুমারীদের ভিতর হ'তে, যারা পবিত্রতার সাধনা ক'রেছে, যারা বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নিষ্কলঙ্ক রয়েছে। পুত্রগণ, আজ প্রতিজ্ঞা কর, একটী কুমারীরও পবিত্রতানাশে তোমরা কখনো চেষ্টিত হবে না। প্রতিজ্ঞা কর, তোমাদের দ্বারা প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে একটী কুমারীকেও পাপ-পথে টেনে আন্‌বার চেষ্টা হবে না। প্রতিজ্ঞা কর, তোমাদের মধ্যে একজনও কোন কুমারীর পবিত্রতা-নাশের ষড়যন্ত্রকারীকে ক্ষমা কর্‌বে না। প্রতিজ্ঞা কর, তোমরা নিজ নিজ গৃহে নিজ নিজ কুমারী ভগিনীর জীবনকে নিষ্কলঙ্ক রাখবার জন্য প্রয়াস-পরায়ণ হবে। এই সঙ্কল্প যাদের তীব্র হবে, তাদের গৃহ আলোকিত কর্ব্বার জন্য অনাঘ্রাত-পুষ্প-সম পবিত্রতার বিগ্রহ-স্বরূপিণী কুমারীরা আমার কন্যা অর্থাৎ পুত্রবধূরূপে আগমন কর্ব্বে, ভারতে এক মহাজাতি সৃষ্টির আবাল্য-পোষিত আমার মধুময় স্বপ্ন সত্য হবে।

কর্ত্তৃত্ব-বোধ ও সেবা, সেবা-বুদ্ধি ও কর্ত্তৃত্ব

রাত্রে কতিপয় যুবকের সহিত কথা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সেবা-বুদ্ধি নিয়ে কর্ত্তৃত্ব চলে, রাজ্যাধীশ্বর সম্রাটও নিজেকে দীনাতিদীন প্রজার অনুগত ভৃত্য জ্ঞান ক'রে বিশাল সাম্রাজ্যের লক্ষ লক্ষ কর্ম্মচারীদের পরিচালন কত্তে পারেন, তার এই কর্ত্তৃত্ব অব্যাহত গতিতে চলে। কিন্তু কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি নিয়ে সেবা করা চলে না। জেলার মালিক যখন কর্ত্তৃত্বের অহমিকা নিয়ে বন্যা-ক্লিষ্টদের মধ্যে ত্রাণ-কার্য্যের তদারক কত্তে যান, তখন তাঁর প্রদত্ত অন্নমুষ্টি ক্ষুধার্ত্তের ক্ষুধা শান্ত না ক'রে অন্তরের ত্রাসই বরং বাড়িয়ে দেয়। কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি সেবাকে বিকৃত করে, সেবাবুদ্ধি কর্ত্তৃত্বকে সহনীয় এবং রমণীয় করে। সুতরাং তোমরা সবাই সেবক হও, কর্ত্তা হ'তে চেয়ো না। কর্ত্তৃত্ব যদি হাতে এসে যায়, তবে তাকে সেবকের মন নিয়ে চালাও, কর্ত্তার উদ্ধত অহমিকা নিয়ে নয়, ব্যক্তিগত মান-সম্মান-বোধের অন্ধ স্পর্দ্ধা নিয়ে নয়, অপরের সম্মানকে আহত করার মূঢ় বিকার নিয়ে নয়।

অন্তরের প্রভু যখন জাগ্রত হন

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও বলিলেন,—তোমার অন্তরের প্রভু যখন জাগ্রত হন, তখন একবার নিজের অসীম ঐশ্বর্য্যের দিকে তাকিয়ে নেন, তাঁর যে কোনো অভাব নেই, তাঁর ক্ষমতা যে অনন্ত অপরিমেয়। আর একবার তিনি তাকান দুঃখক্লিষ্ট তাঁর অগণিত সন্তানের প্রতি। মনে তাঁর অহমিকা আসে না, করুণায় তিনি বিগলিত হ'য়ে যান। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের বিধাতা হ'য়েও তিনি

তাঁদের দুঃখে অশ্রু-মোচন করেন। তুমি যখন তোমার অন্তরে সেই জাগ্রত প্রভুর সাথে হও ইচ্ছায় এক, তখন তোমার মন থেকেও সকল কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি দূর হ'য়ে যায়, সেবাবুদ্ধি তোমার সমগ্র মনকে করে অধিকার।

নগরপাড়, ত্রিপুরা
৭ই বৈশাখ, ১৩৪১

শ্রীশ্রীবাবামণি যে গোপনে নগরপাড় চলিয়া আসিয়াছেন, রহিমপুরের কেহ তাহা জানেন না। সকলে শ্রীশ্রীবাবামণিকে রহিমপুরে খুঁজিয়া মরিতেছেন। শ্রীশ্রীবাবামণি নগরপাড়ের শ্রীযুক্ত রজনী কান্ত রায়ের গৃহের দ্বিতলে নিভৃতে অবস্থান করিতেছেন।

বহু পত্র জমিয়াছে। অবসর পাইয়া শ্রীশ্রীবাবামণি কতক পত্রের জবাব দিলেন।

হুজুগ-বর্জ্জিত আত্মগঠন তথা মহাজাতি-সৃষ্টি

চান্দলা-ত্রিপুরা নিবাসী জনৈক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"হুজুগ বর্জ্জন করিয়া সু-ধীর প্রয়াসে সুনিশ্চিত লক্ষ্যের দিকে অবিশ্রান্ত গতিতে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া যাইবার যে ধৈর্য্য, দক্ষিণে বামে বা পশ্চাতে ফিরিবার কৌতূহল ও রুচি বর্জ্জন করিয়া একই দিকে অবিরাম চলিয়া যাইবার যে নিষ্ঠা, বিঘ্ন-বাধা, ক্ষতি-ক্ষয় সব কিছুকে গণনার বাহিরে রাখিয়া চরম লক্ষ্য লাভ করিবার জন্য যে অপরাজেয় সাহস, তাহারই সহায়তা লইয়া তোমরা জগতে এক অভূতপূর্ব্ব বীর্য্যসম্পন্ন মহাজাতির

সৃষ্টি করিবে। এই সঙ্কল্প অন্তরে পোষণ করিতে কি গৌরব বোধ কর না ?''

সমবেত উপাসনার জনপ্রিয়তার উৎস

পুপুন্‌কী অযাচক আশ্রমের জনৈক কর্ম্মী ব্রহ্মচারীকে শ্রীশ্রীবাবামণি একখানা অতি সুদীর্ঘ পত্র লিখিলেন। তাহার অংশ বিশেষ নিম্নরূপ ঃ—

''সমবেত উপাসনা দিনের পর দিন জনপ্রিয় হইতেছে। ইহা শুনিয়া নিশ্চয়ই আনন্দিত হইবে। কিন্তু এই জনপ্রিয়তার উৎস কোথায়, তাহা কি বুঝিয়াছ ? আমি খ্যাতিমান্ কোনও ব্যক্তি নহি। বিশেষ করিয়া পল্লীগ্রামের অতি সাধারণ লোকদের সহিতই আমার অধিকাংশ ভাবের আদান-প্রদান। নিজ প্রতিভাকে লোকচক্ষে বিকশিত করিয়া তুলিয়া ধরিবার আমার সময়াভাব এবং চেষ্টারও অভাব। এই দুইই আমাকে গায়ে পড়িয়া কাহারো সহিত পরিচিত হইতে দেয় না। বিশিষ্ট কোনও ব্যক্তি দয়া করিয়া নিজের আগ্রহে পরিচিত হইতে আসিলে আমি তাঁহাকে সম্মান করি, ইহা অবশ্য সত্য, কিন্তু ইহা আমার প্রসিদ্ধি-বৃদ্ধির সহায়ক হয় নাই। জীবনের উদ্দেশ্য বা কার্য্যের লক্ষ্য বিবৃত করিয়া একখানা বিজ্ঞাপন ছাপিবার আমার অর্থ নাই। সহরের সাংবাদপত্র সমূহের মধ্যে এক 'সঞ্জীবনী' ছাড়া আমাকে আর কেহ চেনেন না বা গণনায় আনেন না। নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ে কোনও সংবাদ ইহাদের নিকটে পাঠাইলে এবং সেই সংবাদে আমার প্রসিদ্ধিবর্দ্ধনের অনুকূল বা সেই উদ্দেশ্যমূলক

কিছু না থাকিলেও, এই সকল সংবাদপত্র আমাকে সহায়তা করেন না। কেবল 'সঞ্জীবনী'র কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় অতি সামান্য পরিচয়েই এত স্নেহ-শ্রদ্ধা-ভালবাসা দিয়া ফেলিয়াছেন যে, তাঁহার পত্রিকাতেই আমার অবারিত দ্বার। তবু মনে হয়, সমবেত উপাসনা সম্পর্কিত কোনও সংবাদ বা লেখা 'সঞ্জীবনী'তে'ও কখনও দেই নাই। তবু দেখ, দাবানলের ন্যায় সমবেত উপাসনা বিনা বিজ্ঞাপনে, বিনা প্রচারণায়, বিনা অধ্যবসায়ে আস্তে আস্তে ছড়াইয়া পড়িতেছে। দাবানল বলিলাম এইজন্য যে, দাবানলের গতি অবাধ এবং বিচিত্র,---সে অগ্রসর হইবেই এবং যে পথ দিয়া তাহার যাইবার কল্পনা কেহ স্বপ্নেও করে নাই, হয়ত অজ্ঞাত ও অবজ্ঞাত দুইটী তুচ্ছ বৃক্ষের অতি নিকৃষ্ট কয়েকটী শুষ্ক পত্রকে অবলম্বন করিয়া সে সেই দিকেই পথ করিয়া লইল এবং চকিতে হঠাৎ আবির্ভূত হইয়া নিশ্চিন্ত মৃগকুলকে উচ্চকিত করিয়া তুলিল, চারিদিকে প্রাণিবর্গের ছুটাছুটি সুরু হইয়া গেল। কিন্তু দাবানল দগ্ধ করে, সমবেত উপাসনা স্নিগ্ধ করে। ইহা যে স্নিগ্ধ করে, গ্লানি-মোচন করে, পাপের জ্বালা, অপরাধের তাপ নিবারণ করে, চিত্তকে শান্তি ও আত্মপ্রসাদে ভরিয়া দেয়, ইহাই ইহার শক্তির উৎস। কিন্তু ইহা যে প্রতি জনের অন্তরের উৎস খুলিয়া দিয়া সকল উৎসকে মিলাইয়া তাহাতে উৎসব-সমারোহ সৃষ্টি করে, তাহা ইহার শক্তির মূল উৎস।

''একা একা সকলে কতই না সাধন করিয়াছ, কিন্তু সকলে মিলিয়া কি কিছু করিয়াছ? সকলে না মিলিলে যাহা নিরর্থক,

এমন আধ্যাত্মিক সাধনা কি কিছু কর ? ব্যক্তির মোক্ষ-কামনায় ব্যক্তি অনেক কিছু করিয়াছে, কিন্তু সকল ব্যষ্টিকে মিলাইয়া একটী সমষ্টিরূপে জানিয়া কিছু কি তোমরা কোথাও কর ? একজনের আধ্যাত্মিক আত্মপ্রসাদ অর্জ্জনের প্রয়াস-মধ্যে তোমরা বহিরাগত, আগন্তুক, অভ্যাগত, অতিথি বা প্রদর্শক মাত্র। তোমরা হাত-তালি দিবে বলিয়াই একজন তাঁর আধ্যাত্মিক ব্যক্তিগত সাধনার মধ্যে কিছু আড়ম্বরের আমদানী করিয়া থাকেন। যে আসিবে, যে দেখিবে, যে বসিবে, সে প্রসাদ পাইবে,— তাহাদের সকলের সম্মিলিত কৃতকৃতার্থতা ইহাতে নাই। কিন্তু সমবেত উপাসনায় তাহা আছে। তোমরা যে সমবেত উপাসনা পাইয়াছ, তাহা এই জন্যই নিজের স্বভাবে আস্তে আস্তে ভুবন-বিজয়িনী মূর্ত্তি ধারণ করিতে থাকিবে।"

সমবেত উপাসনার সর্ব্বজনীনতা রক্ষা

এই পত্রেই শ্রীশ্রীবাবামণি আরও লিখিলেন,—

"যতই অধিকতর লোকের সংস্পর্শে ইহা আসিতেছে, যতই বিচিত্রতর চরিত্রের ও সংস্কৃতির নরনারী ইহাতে যোগ দিতেছেন, ততই ইহার সর্ব্বজননীতার পরীক্ষা হইতেছে এবং চূড়ান্তভাবে ইহার সর্ব্বজনীনতা রক্ষার জন্য আমি ইহাতে স্থায়ী রায় দিয়া রাখিয়াছি যে, আমার প্রতি ভক্তির আতিশয্য সত্ত্বেও তোমরা সমবেত উপাসনার মধ্যে আমার প্রতিচিত্রকে নিয়া পূজ্যের স্থানে বসাইবে না, সেখানে একমাত্র পরম পবিত্র অখণ্ড-বিগ্রহই অদ্বিতীয় রূপে অবস্থান করিবেন। প্রাচীন নবীন বা ভাবীকালের

কোনো পরিকল্পিত মূর্ত্তি বা কোনও ব্যক্তিরই প্রতিচিত্র সেই স্থানে অবস্থান করিবেন না। এক,—এক,—এক। মাত্র একই সেখানে থাকিবেন। তুমি বা অন্য কেহ যদি নিজ অভ্যাস, রুচি, সংস্কার বা দীক্ষার অনুযায়ী মনে মনে কোনও অন্য মূর্ত্তি চিন্তা কর, তবে তোমার সে স্বাধীনতায় কেহ হস্তক্ষেপ করিতে যাইতেছে না। ফলে ভিন্ন মন্ত্রে দীক্ষিতেরাও এই সমবেত উপাসনাতে যোগদান করিতে বাধাগ্রস্ত হইবেন না।''

সমবেত উপাসনা ও অখণ্ড-মণ্ডলেশ্বর

এই পত্রেই শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

''আমার পূজাকে প্রতিষ্ঠার জন্য সমবেত উপাসনার আবির্ভাব নহে। ইহা ধ্রুব সত্য। যে যেখানে যে ভাবে যাঁহাকে পূজা করিতেছে, জানিও, সেই পূজা আমাকেই করা হইতেছে। সকলের সকল অর্চ্চনা অনন্তকাল ধরিয়া আমিই পাইয়া আসিতেছি এবং আমিই পাইতে থাকিব। অথবা আরও বিশদতর ভাষায় বলিব যে, আমিই কোটি কোটি জীবে রূপান্তর গ্রহণ করিয়া নানা উপলক্ষ্যের মধ্য দিয়া একমাত্র আমাকেই ভজনা করিতেছি। এত পূজা পাইতেছি যে, আরও পূজা পাইবার জন্য আয়োজনের প্রতীক্ষু আমি নহি। তথাপি তোমরা আমার বর্ত্তমান আবির্ভাবকে সম্মান করিবার জন্য আমার প্রতিচিত্রের মধ্য দিয়া আমার পূজা করিতে প্রলুব্ধ হইতে পার। গুরুর পূজা শিষ্য করিবেন, সঙ্ঘপুরুষকে সঙ্ঘীরা পূজা করিবেন, ইহা পাপও নহে, অন্যায়ও নহে। কারণ, দীক্ষায় আস্থা, মন্ত্রে নিষ্ঠা, সাধনে রুচি এবং

উপলব্ধির পথে অগ্রগমন আসিলে সঙ্গে সঙ্গে নির্ব্বিচারে মনঃপ্রাণ গুরু বা সঙ্ঘপুরুষের প্রতি অবনমিত হইয়া যায়, বিনা তর্কে বিনা সর্ত্তে সেখানে এমন আত্ম-সমর্পণ আসিয়া যায় যে, তাঁহার পূজা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের মত স্বাভাবিক হইয়া যায়। সেই পূজা বিধি-নিষেধের গণ্ডী আঁকিয়া বদ্ধ করিয়া রাখিবে কে ? কিন্তু আমিই কি কোটি কোটি কল্পে কোটি কোটি রূপ ধরিয়া তোমাদের ঘুম ভাঙ্গাইতে আসি নাই ? সেই সকলের স্মরণে ভিন্ন-ভিন্ন-পন্থীরা বিভিন্ন নাম ও রূপের সাহায্যে সেই এক জনকেই যখন পূজা করিতে চাহিবেন, তখন সকলে একত্র মিলিত হইবার পক্ষে এক প্রবল বাধা হইবে জনে জনের ব্যক্তিগত ইষ্টপ্রতীক। সমবেত উপাসনা কালে তোমার গুরুদেবের মূর্ত্তিটী অখণ্ড-বিগ্রহের পাশে বসাইলে একজনে শ্রীরামকৃষ্ণ, একজনে শ্রীগম্ভীরনাথ, একজনে শ্রীসন্তদাস, একজনে শ্রীলোকনাথ, একজনে শ্রীঅরবিন্দ, একজনে শ্রীবিজয়কৃষ্ণের প্রতিচিত্র আনিয়া বসাইয়া দিলে তোমার আপত্তি করিবার পক্ষে একমাত্র গোঁড়ামি ছাড়া অন্য কোনও সদ্‌যুক্তি থাকে না। সুতরাং সমবেত উপাসনাতে কার্য্যকালে একমাত্র তোমার গুরুদেবের অনুগতগণ ছাড়া অন্যকে পাইবার আশা করিতে পার না। কেন না, তোমার যদি গোঁড়ামি হয় সদ্‌গুণ, তাহা হইলে অপরের গোঁড়ামিকে দোষ বলিবে কোন্ যুক্তিতে ?

"তোমরা যে ফাঁপরে পড়িয়া যাইতেছ, তাহা বুঝিতেছি। আমিই তোমাদের সমবেত উপাসনা শিখাইলাম, আর আমিই তাহা হইতে বাদ পড়িয়া যাইব, ইহা তোমাদের মনে মানে না।

আর আমি একা একা নিজেকে পূজিব বলিয়া সমবেত উপাসনার প্রচার করি নাই, তোমাদের সকলকে নিয়া পূজনের আনন্দোল্লাস সম্ভোগ করিব, সমবেত উপাসনা তাহারই জন্য। সুতরাং তোমাদের সমবেত উপাসনায় আমি থাকিব না, ইহা আমারও মন মানিতে চাহিবে না। আমি তোমাদের স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছি, যেখানে অন্ততঃ তিনটী প্রাণীও মিলিত হইয়া সমবেত উপাসনায় বসিয়াছ, আমি সেখানে আছি এবং থাকিব। এই কথার ব্যত্যয় হইতে পারে না। তোমাদের লইয়া যখন আমি সমবেত উপাসনায় বসি, তখন আমার নির্দ্দিষ্ট স্থানটী যেখানে হয়, কদাচ সেই স্থান খালি থাকিতে পারে না এবং সেই স্থানে কদাচ অন্য কেহ বসিতেও পারে না। আমার আসন সেইখানে পাতিও, সেইখানে বসিয়া আমি তোমাদের সকলের সহিত সমসাধক, কাহারও পূজা গ্রহণের জন্য সেই আসনে আমি কখনো বসি না। সেই আসনে আমার প্রতিচিত্র রাখিবার কোনও প্রয়োজন নাই। পূজায় বসিবার আগে কত স্থানে আমাকে কত জনে ফুল মালায় শোভিত করে, আমাকে স্পর্শ না করিয়া করিলে আমি তাহাতে আপত্তি করি নাই। সুতরাং এই আসন ফুলে ও মালায় সুশোভিত করিতে পার, ইহাতেও বাধা দিতে চাহি না।

‘‘অবশ্য বলিতে পার, যখন তোমরা নিজেরা নিজেরা মিলিয়া সমবেত উপাসনা করিবে, তখন বিগ্রহের নিম্নে আমার প্রতিচিত্রটী রাখিতে দোষ কি ? দোষ নাই, কিন্তু মনে জানিও, তখন তোমরা একটী বিশ্ব-সম্প্রদায় নহ, তখন তোমরা একটী অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায় নহ, তখন তোমরা শাক্ত, বৈষ্ণব, গাণপত্যাদির ন্যায়

একটী আলাদা ক্ষুদ্র সম্প্রদায়মাত্র। নিজেদের ঘরে বসিয়া কেহ সাম্প্রদায়িক হইলে তাহা লইয়া বিশ্ববাসীর কোনও মাথাব্যথা নাই। আর, নিজের সম্প্রদায়ের প্রতি অনুরাগ না থাকিলে কেবল হাওয়ার উপরে বচনের তুবড়ী ছড়াইয়া সর্ব্ব-সম্প্রদায়ের আপনও হওয়া যায় না। দেশকে ভাল না বাসিয়া যাঁহারা আন্তর্জ্জাতিক প্রেম দেখাইয়া থাকেন, তাঁহাদের যেমন ভিত্তি নাই, নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি গভীর মমত্ব ও নিজ গুরুর প্রতি অব্যভিচারিণী নিষ্ঠা না থাকিলে সর্ব্বসম্প্রদায়ের প্রতি অসাম্প্রদায়িক প্রীতি-বিস্তারও তেমন একটা ছেলে-ভুলান ছড়া মাত্র। ভারতীয় সংস্কার নাম, নামী ও গুরুতে অভেদবুদ্ধি করিবার অনুকূল উপদেশ কয়েক সহস্র বৎসর ধরিয়া দিয়াছেন। সেই সংস্কারের সহিত লড়াই দিয়া চলিবার রসদও তোমাদের অধিকাংশের নাই। তাই আমাতে ও অখণ্ড-বিগ্রহে অভেদ-বুদ্ধি তোমাদের পক্ষে অপরাধ নহে, অন্যায় নহে, অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু এই বোধকে মনেই রাখিয়া সকলকে লইয়া সমবেত উপাসনা করিবে, যেন তোমার অন্তরের বোধ উগ্র মূর্ত্তি ধরিয়া বাহিরে আসিয়া কলহ সৃষ্টি করিতে না পারে। একাকী নিজের ঘরে বসিয়া কি কর, বা কতিপয় সমভাবের ভাবুক ও সমসাধনার সাধক লইয়া কি কর, তাহার সম্পর্কে বিধি-নিষেধ নাই। কিন্তু মণ্ডলীর মধ্যবর্ত্তিতায় যে অনুষ্ঠান কর, তাহা যে সর্ব্বসাধারণের অনুষ্ঠান, ইহা মনে রাখিতে হইবে। সমবেত উপাসনারই প্রচার প্রতিষ্ঠার জন্য যে-কোনও অনুষ্ঠান কর, তাহা যে বিশ্ববাসীর জন্য, তাহা ভুলিলে চলিবে না।”

সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ব্রহ্মচেতনার উদ্দীপনা

অপরাপর কয়েকটী অপ্রকাশ্য বিষয় লিখিবার পরে এই পত্রের শেষাংশে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সাত বৎসরে পড়িয়াছে যে পুপুন্‌কী আশ্রমটী স্থাপিত হইয়াছে। নানা ভাবে সেখানে জনসেবার চেষ্টা করিতেছি কিন্তু গণ-মানসে ব্রহ্মচেতনা জাগাইবার কাজে আজও কিছুমাত্র অগ্রগমন হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে না। জনসাধারণের ত্রুটী খুঁজিবার আমাদের প্রয়োজন নাই। আমাদের চেষ্টায় কোথায় রহিয়াছে ত্রুটী, তাহাই আজ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। আজ যাহাদিগকে অতি অপদার্থ মনে হইতেছে, একদা হয়ত দেখিতে পাইব যে, তাহাদের মধ্যে কত বড় বড় মহামনা সিংহ-পুরুষেরা রহিয়াছেন। ইহাদের ভিতরে ব্রহ্মকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। বাহিরের শত অপরিচ্ছন্নতার মধ্য দিয়াও ভিতরের সেই নিত্যনির্ম্মল, নিষ্কল, পূর্ণ পুরুষকে বাহিরে টানিয়া আনিতে হইবে। জ্ঞানবলে সংস্কারের মোহজাল ছিঁড়িয়া চির-অনাদৃত এই অশিক্ষিত নরনারীরা যখন আত্মপরিচয়ের প্রশস্ত প্রান্তরে দাঁড়াইবে, তখন শত শত ঋষি ও দেবতারা ইহাদের বন্দনা করিতে ভিড় জমাইবেন। যাহাকে যতটুকু পার, আত্মবিশ্বাস বিতরণ কর। যাহাদের সেবা করিবার সুযোগ পাইয়াছ, তাহাদিগকেই তোমার পূজার বিগ্রহ বলিয়া জ্ঞান কর। তোমাদের গুরু ইহাদের মধ্য দিয়া তোমার কাছ হইতে সেবা পাইতে চাহিতেছেন। ইহাদের প্রতি যতটুকু স্বচ্ছ সরল সরস মনোভাব

লইয়া সেবা-হস্ত প্রসারণ করিবে, ততটুকু শ্রীগুরু-বন্দনা তোমার হইয়া থাকিবে, ইহা সুস্পষ্ট জানিয়া লও। যেখানেই যেটুকু নিষ্কাম সেবা দাও, সবটুকু সেবাই শ্রুগুরুদেবে পৌঁছে, ইহা কি সত্যই বড় মজার কথা নহে ?''

ভক্তি ও ভাবোচ্ছ্বাস

ময়মনসিংহ-জঙ্গলবাড়ী-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলন,—

"ভাবের উচ্ছ্বাস এবং ভক্তি এক কথা নহে। ভক্তি উপজাতা হইলে তাহার ফলে কখনো কখনো ভাবের উচ্ছ্বাস বিকশিত হইতে পারে, কিন্তু উচ্ছ্বাস মাত্রেই ভক্তির ফল নহে। অভ্যাসের দ্বারা মানুষ নিজেকে উচ্ছ্বসিত করিতে পারে, কিন্তু ভক্তি স্বভাবসিদ্ধ বস্তুরূপে মানবজীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভক্তির ফলে যে উচ্ছ্বাস, তাহা স্বভাবজ, অভ্যাসের ফলে যে উচ্ছ্বাস, তাহা কৃত্রিম। কৃত্রিম বস্তু চিরকালই অচিরস্থায়ী, স্বভাবজ বস্তু চিরস্থায়ী। ভক্তির বহির্লক্ষণগুলিকেই অনেক সময়ে ভক্তি জ্ঞান করিয়া তোমরা প্রবঞ্চিত হও,—শুধু তাহাই নহে, অপরকে প্রবঞ্চনাও কর ; কিন্তু প্রকৃত ভক্তি লক্ষণাতীত, ধ্রুবজ্যোতিঃস্বরূপ, নিত্যস্থির এবং অবর্ণনীয় আনন্দের আকর। অন্তরে আনন্দের আস্বাদন নাই আর ভাষার সুষমায় বাহ্যোচ্ছ্বাসকে অবিরাম উচ্ছলিত করিতেছি, ইহা আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া আর কি হইতে পারে ? ভাষা লালিত্য বা কোমল-কান্ত পদাবলী আর ভক্তিমাধুর্য্য সর্ব্বসময়েই এক বস্তু নহে। কখনো কখনো ভক্তির ইহারা

স্বাভাবিক বিকাশ, অধিকাংশ সময়ে অভ্যাসজাত শব্দ-চয়ন-নিপুণতা লোক ঠকাইবার জন্য ভক্তি নামে পরিচিত হয়। তোমরা প্রকৃত ভক্ত হও, ভাবের উচ্ছ্বাসে তলাইয়া যাইও না। বন্যা-প্রবাহে জল থাকে, কিন্তু সে জল সুপেয় নাও হইতে পারে, সে জল অহিত, অমেধ্য, অপেয় হইতে পারে। আবার হিমালয়ের শীর্ষদেশে লোকচক্ষুর অগোচরে যুগ যুগ ধরিয়া সঞ্চিত তুষাররাশি গলিয়া যখন শিবজটা বাহিয়া হরিদ্বারের বক্ষ চিরিয়া নামে, তখন তাহা উচ্ছ্বসিত হইলেও সুপেয়, সুস্বাদু, প্রাণপ্রদ।"

বিদ্যাচর্চ্চা ও ভগবদাশ্রয়

ঢাকা-বজ্রযোগিনী-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্য, সাহিত্য, নাট্য, শিল্পকলা, গীত, বাদ্য প্রভৃতি কোমল এবং কঠোর সর্ব্ববিধ বিদ্যাকে একমাত্র ভগবচ্চরণ-সেবার সহায়ক উপকরণ রূপে ব্যবহার করিতে কৃতসঙ্কল্প হও। ভগবচ্চরণাশ্রয়প্রয়াস হইতে বঞ্চিত হইয়া দর্শন অন্ধত্ব সৃষ্টি করিবে, বিজ্ঞান শুধু হিংস্র মারণাস্ত্র প্রসব করিবে, কাব্য কামকাতর ইন্দ্রিয়সুখরত খেয়ালী স্বার্থপরদের জন্ম দিবে, সাহিত্য উলুবনে মুক্তা আহরণের ব্যর্থ-শ্রমে পর্য্যবসিত হইবে, নাট্য ক্ষণচঞ্চল বিলাসীদের মনোরঞ্জনের উপকরণ হইবে, শিল্পকলা শত-সহস্র লক্ষ-কোটি ক্ষুধার্ত্তের মুখের গ্রাস কাড়িয়া আনিয়া আত্মসুখী মুষ্টিমেয় দুই একজনের উদরপূরণ করিবে, গীতিগুচ্ছ প্রেমের প্রসূন না ফুটাইয়া কামের জ্বালা সৃষ্টি করিবে, বাদ্য-যন্ত্রের মধুর নিক্কণ অভয়ের আরাধনা না করিয়া জগতে শুধু

খলতা, শঠতা, নীচতা, ক্লীবতা এবং ভয়ের মাত্রা বাড়াইয়া চলিবে। বিদ্যার চর্চ্চাকে নিষিদ্ধ করিতে বলিতেছি না, কিন্তু ভগবচ্চরণ-সংশ্রব-শূন্য বিদ্যা যে অবিদ্যা মাত্র, মিথ্যা বিলাস বা বিপজ্জনক ব্যসন মাত্র, সেই কথাই তোমাকে বারংবার স্মরণ করিতে বলিতেছি। বিদ্বান্ হও, কিন্তু অবিদ্যার পোষ্যপুত্র রূপে নহে। জ্ঞানী হও, কিন্তু অজ্ঞানের ঘন-তমিস্রাবৃত গভীর অন্ধকূপে ডুবিয়া গিয়া নহে। কবি হও, কিন্তু নিত্যকালের বাস্তবকে তোমার কামায়ন-কণ্ডূতির অলস-কল্পনা-সাগরে নিমজ্জিত করিয়া দিয়া নহে। সাহিত্যিক হও, কিন্তু নিত্যকল্যাণের সহিত সম্বন্ধ-রাহিত্য সৃষ্টি করিয়া নহে। নাট্যকার হও, কিন্তু জগদ্ব্যাপী মহানাট্যের ইঙ্গিত ভুলিয়া নহে। শিল্পী হও, কিন্তু আত্মধর্ম্মের, আত্মতত্ত্বের, আত্ম-জাগরণের শিল্প-কৌশলে উদাসীন থাকিয়া নহে। গীতজ্ঞ হও, কিন্তু যে মহাসঙ্গীত হইতে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া উঠিল, যে মহাসঙ্গীতের মাঝে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড পুনঃ নদ-গিরি-উপবন সহ দেব-নর-পশু-পক্ষ্যাদি সহ বিলীন হইল, সেই সঙ্গীতের সহিত সঙ্গতি-চ্যুত হইয়া নহে। বাদন-দক্ষ হও, কিন্তু যে মধুর প্রেমবাদ্য অনলে অনিলে নিয়ত বাজিতেছে, চন্দ্রে, মিহিরে, সাগরে, ভূধরে, বনে, উপবনে, নিখিল বিশ্বে অবিরাম বাজিতেছে, তাহার সহিত যতি রক্ষা করিয়া।"

জীবে দয়া

শ্রীহট্ট গোপালটিলা-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"যে জীবের যে বিষয়ে অভাব, তাহার তদ্বিষয়ক অভাব দূরীভূত করিবার জন্য তোমার স্বকীয় স্বার্থের সহিত সম্পূর্ণ সংশ্রব-বর্জ্জিত যে করুণা এবং ঐকান্তিকী কামনা, তাহারই নাম জীবে দয়া। অভাবীর অভাব সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হউক, চিরতরে দূরীভূত হউক,—এই যে কামনা, ইহাই জীবে দয়া। দয়া চিত্তকে ক্ষমতাশীল করে সুতরাং দয়াপাত্র ব্যক্তির অতীত কুকর্ম্মের জন্য তাহার প্রতি তোমার মনে ক্রোধ, বিরক্তি, বিদ্বেষ, অসূয়া বা অনিষ্টেচ্ছা আদৌ তিষ্ঠিতে পারে না। একজন খাইতে পায় না, অনশনে দিন যায়, অন্ন কষ্টের জ্বালায় তাহার জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে—এমন এক ব্যক্তির সম্পর্কে অন্নাভাব বিদূরণের চিন্তা, ইচ্ছা ও আগ্রহ তোমার স্বাভাবিক। কিন্তু একদিন এক বেলা এক পেট খেচরান্ন খাওয়াইয়া তাহাকে বিদায় দিলেই যদি তোমার চিত্ত শান্ত হইয়া আত্মপ্রসাদে পূর্ণ হইয়া যায়, তবে বুঝিও যে, উহা দয়া নহে, উহা মায়া মাত্র। জীবে মায়া মঙ্গলপ্রদা নহে, জীবে দয়াই সর্ব্বমঙ্গলের আকর স্বরূপ। অন্নাভাবীর অন্নকষ্ট চিরতরে দূর করিবার কল্পনা, কামনা, প্রার্থনা ও অধ্যবসায় যদি তোমাকে না অধিকার করিতে পারে, তবে জানিও যে, ঐ ক্ষণস্থায়ী সহানুভূতিকে দয়া বলিয়া সংজ্ঞা দেওয়া আর দয়া শব্দটীকে অপমান করা সমান কথা। কিন্তু কোনও ব্যক্তির অন্নাভাব চিরতরে বিলুপ্ত করিয়া দিতে তুমি সমর্থ হইলেও তাহার অনন্ত-কোটি অভাব জগতে রহিয়া যায়। প্রকৃতই যিনি জীবে দয়াবান্ প্রেমিক পুরুষ, তিনি জীবের একটীমাত্র অভাব বিদ্যমান থাকিলেও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে

পারেন না। এই যে বিষয়বাসনা-কাতর কোটি কোটি নরনারী কল্পিত অভাবের অবান্তর তাড়নায় দাবানলে দাহ্যমান পশুকুলের মত সংসারারণ্যের ধূমাবৃত একটী গহন প্রান্ত হইতে অধিকতর ধূম্রবলয়াচ্ছাদিত গহনতর প্রান্তান্তরে দিগ্বিদিগ্-জ্ঞানশূন্য হইয়া অবিরাম অবিশ্রাম ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া বেড়াইতেছে, এই দুঃখ দেখিয়া কোন্ প্রাণবান্ মহতের প্রাণ না কাঁদিবে ? যেই মহতের ব্যাকুল হৃদয় এই চির-দুঃখার্ত্ত জীবকুলের অনন্ত দুঃখনিচয়ের পিছে পিছে অনুক্ষণ প্রেমাশ্রুপূর্ণ-নয়নে ছুটিতেছে, সেই মহতের অন্তর-প্রদেশে যদি কখনও প্রবেশ করিতে পার, তবেই বুঝিবে, 'জীবে দয়া' এই চারিটি অক্ষরের প্রকৃত অর্থ কি। জীবে দয়ার নাম করিয়া তোমরা জীবের প্রতি কতরূপে কত নির্দ্দয়তা প্রকাশ করিতেছ, তাহার হিসাব তখন পাইবে।"

আত্ম-সেবা ও ভগবৎ-সেবা

বরিশাল-বাগখান-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ভগবৎ-সেবাই তোমার নিত্যব্রত হউক, ভগবৎ-সেবাই তোমার স্বভাব হউক। তোমার সুখ-সম্পদ ও তৃপ্তি বৃদ্ধির জন্য ভগবানকে তোমার ইচ্ছানুযায়ী চলিতে ফরমায়েস না করিয়া নিজেকে নিরন্তর তাঁহার সেবার জন্য উন্মুখ কর। ভদবৎ সোবার নাম করিয়া আত্ম-সেবা করিও না, ভগবৎ-পরায়ণতার ভাণ ধরিয়া আত্মপরায়ণ হইও না। তোমার জপ-তৎপরতার লক্ষ্য তোমার নিজের তৃপ্তি না হইয়া ভগবত্তৃপ্তি হউক। প্রকৃত

পরমাত্মপরায়ণ ব্যক্তির কখনও সুখ-প্রার্থনা থাকে না, সুখ-প্রার্থনার প্রয়োজনও তাঁহার অনুভূত হয় না।"

ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব ও হরিনাম-প্রচার

ঢাকা-পঞ্চসার-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"বাল-বৃদ্ধ, যুবা-প্রৌঢ়, নারী-নর, ধনি-নির্ধন, সংসারি-উদাসী নির্ব্বিশেষে সকলের কণ্ঠে সুমধুর হরিনামের ঝঙ্কৃতি তোল। দিবসে কি রজনীতে, ঊষায় কি প্রদোষে, নিশীথে কি মধ্যাহ্নে সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বত্র হরিনামের কলি-কলুষ-নাশন ত্রিভুবন-পাবন তরঙ্গ-তাড়ন উত্থিত করাও। কত রকমের পূজা, কত রকমের ব্রত আমদানী করিয়া তোমরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ধর্ম্ম-স্রোতের স্বাভাবিক প্রবহমানতায় জটিল ঘূর্ণাবর্ত্তের সৃষ্টি করিয়া সরলবিশ্বাসী সাধারণ ব্যক্তিদের বুদ্ধি-বিভ্রম ঘটাইয়া দিয়াছ। মনসার পূজা করিব, না, মঙ্গল-চণ্ডীকে ডাকিব, শিব-দুর্গা-গণেশ হইতে সুরু করিয়া শেষ পর্য্যন্ত শিল-নোড়া আর কচু-ঘেচুর পূজা কত রকমে কত বিধিতে কত উপচারে নির্ব্বাহ করিব, ঘণ্টাকর্ণ-রাক্ষসের পূজা করিব, না, মাণিক-পীরের সিন্নি মানত করিব,—এই সব দুস্তর সমুদ্র তুল্য অগাধ-সমস্যায় পড়িয়া মানুষগুলি জানিয়া না জানিয়া, বুঝিয়া না-বুঝিয়া অবিরাম ভাবের ঘরে চুরি করিতেছে। একমাত্র ভগবন্নামে সমগ্র নিষ্ঠা ন্যস্ত করিয়া বাকী সব সমস্যার জটিলতা গঙ্গাজলে বিসর্জ্জন দিতে ইহাদিগকে শিক্ষাদান কর। উদয়-গিরি হইতে অস্তাচল

পর্য্যন্ত, সুমেরু-শিখর হইতে কুমেরু-কেন্দ্র পর্য্যন্ত অবিরাম অবিনশ্বর ওঙ্কার-ধ্বনি উত্থিত হউক, আর সর্ব্বজীব এই এক মহানামের মাধুর্য্যের ভিতরে সকল কুসংস্কার, সকল দুর্ব্বলতা ডুবাইয়া দিয়া অভীঃ হউক। যদি ইহা করিতে পার, তবেই তোমরা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য করিলে, নতুবা শুধু যজমানের গৃহের চাল-কলা এবং শিষ্য-গৃহের বার্ষিকের প্রতি নিবদ্ধ-দৃষ্টি হইয়া কতকগুলি শাস্ত্রবচন অর্থবোধহীনভাবে আবৃত্তি করিলেই ব্রাহ্মণত্বের বিজয়-ধ্বজা আকাশে উড্ডীন হইবে না। ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া হরিনাম প্রচারই ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব-রক্ষার একমাত্র উন্মুক্ত পন্থা বলিয়া জানিও। ব্রাহ্মণদিগকে মেদিনী-পৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবার উদ্দেশ্যেই আমি ধরার বুকে ভূমিষ্ঠ হই নাই, ব্রাহ্মণকে নিজ ব্রাহ্মণত্বে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করাই আমার অন্তরের একান্ত আকিঞ্চন।"

নিজের দেশকে চিন

নোয়াখালী-কাঞ্চনপুর-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ভবিষ্যতের জন্য দেশবাসীর জন্য কি দুঃখ-দুর্ভাগ্য সঞ্চিত রহিয়াছে, তাহার প্রতীকারই বা কি, কি প্রকারেই বা ভবিষ্য দুঃখাবলির পীড়ন হইতে দেশকে রক্ষা করিয়া উন্নত ও হাস্যমুখর করা সম্ভব হইবে, তৎসম্পর্কিত যাবতীয় সমস্যার সমাধান-সূত্র তোমাদিগকে বর্ত্তমান বিষম অবস্থার মধ্য হইতেই খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। তোমার দেশের বর্ত্তমান অবস্থাটী প্রকৃত প্রস্তাবে

কি, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ অধ্যয়ন হইতেই এই দুরন্ত দুঃখের নিশ্চিন্ত সমাধানের একটা পথ হইবে। সুতরাং দেশের বর্ত্তমান অবস্থাকে নির্ভুল ভাবে অবগত হইব্যর জন্য বিশেষভাবে যত্নশীল হও। এমনভাবে সকল বিষয় অবগত হও, যেন কোনও মায়াবী যাদুকরের যাদুদণ্ড এক্‌কে আর বলিয়া ভ্রমোৎপাদন করিতে না পারে। সুকৌশলী ধূর্ত্ত ব্যক্তি তোমার অন্নকষ্টকে প্রাচুর্য্য, অবসাদকে নিশ্চিন্ত বিশ্রাম, দুর্ব্বলতাকে শান্তি এবং অক্ষমতাকে ক্ষমা বলিয়া ব্যাখ্যা দিয়া তোমাকে যেন ধোঁকা না দিতে পারে। গ্রামের পর গ্রাম ভ্রমণ কর, শুশ্রূষু কর্ণে গৃহে গৃহে নিরন্নের কাতর ক্রন্দন একান্তে শ্রবণ কর,—নগরে নগরে ভ্রমণ কর, দুয়ারে দুয়ারে জিজ্ঞাসু নয়নে সভ্যতা-বৃদ্ধির নামে নিশ্চিন্ত আত্ম-হননের দৃশ্যগুলি দেখিয়া যাও ; অন্তঃসারহীন বা বহ্বাস্ফোটনের পশ্চাতে যে মৃত্যুর করাল ছায়াই শুধু ঘনাইয়া আসিতেছে, তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব কর,—দেখিবে ইহা হইতেই সমস্যা-সমাধানের সরল পথের নিশানা জুটিবে। দেশকে ভালবাসার-কল্পনা-বিলাস কম দেখ নাই, বক্তৃতা-মঞ্চের লক্ষ-করতালি সম্বর্দ্ধিত আস্ফালন এবং সাহিত্য-সভার সহস্র সমঝদারের সমর্থিত চারু-বচন-বিন্যাস অদ্য পর্য্যন্ত কম হইল না, কিন্তু তাহা দ্বারা দেশের প্রকৃত অবস্থার বাস্তব পরিচয় কয়জনের হইয়াছে, বলিতে পার ? গুপ্তচর যেমন ভাবে আত্ম-গোপন করিয়া খুনী-আসামী খুঁজিয়া বেড়ায়, তোমাকে তেমনি তোমার দেশের সহস্র নগর, সহস্র পল্লী শুধু দুঃখীর দুঃখ, অভাবীর অভাব, দীনের দৈন্য, আর্ত্তের বিপন্নতার খোঁজ করিবার জন্য প্রচ্ছন্ন-পাদচারে বাহির

হইতে হইবে। তবে ত' দেশকে চিনিবে, তবে ত' দেশকে বুঝিবে, তবে ত' দেশের সেবার প্রকৃত পন্থার হদিস পাইবে। সংবাদপত্র তোমার নিকটে তোমার দেশের কতটুকু সংবাদ পরিবেশন করিতে পারে ? সংবাদপত্র কি স্বাধীন ? সে কি ইচ্ছামত সকল কথা কহিতে পারে ? সে কি বিবেকের অনুশাসন মান্য করিয়া খোলা প্রাণে সরল কথা কহিতে গেলে নিজ অস্তিত্ব নিরাপদ রাখিতে পারে ? তাহার স্কন্ধের উপরে কি ডিমোক্রিসের খড়্গ ঝুলিয়া নাই ? কথা কহিবার অধিকারটুকু কোনো ক্রমে নামেমাত্র বজায় রাখিবার জন্য তাহাকে কি বিনা পয়সায় বিবেক-বিরুদ্ধ বিজ্ঞাপন-সমূহ স্তম্ভের পর স্তম্ভ সপ্তাহের পর সপ্তাহ ব্যাপিয়া প্রবন্ধের ছদ্মবেশ ধারণ করাইয়া প্রকাশ করিতে হয় না ? তোমাকে নিজ চ'খে সব দেখিতে হইবে, নিজ কাণে সব শুনিতে হইবে,—প্রতীকার-চিন্তা করিবে তাহার পরে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-সমাপ্তির পরে য়ুরোপের ছাত্রেরা শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ করিবার জন্য Continent (য়ুরোপ মহাদেশের অন্যান্য দেশসমূহ) ভ্রমণে বাহির হয়,—পড়িয়া যাহা শিখে নাই, চোখে দেখিয়া তাহা শিক্ষা করে। তোমাদেরও অন্যভাবে প্রকারান্তরে তাহাই কর্ত্তব্য হইবে। তবে, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়া নহে, নিম্নবিদ্যালয়-সমূহে পড়িবার কাল হইতেই তোমাদিগকে দেশের এবং দেশবাসীর প্রকৃত অবস্থার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্থাপনের প্রয়াসে যত্নপরায়ণ হইতে হইবে। পূজার ছুটি, গ্রীষ্মের ছুটি, বড়দিনের ছুটি, হোলির ছুটি তোমাদিগকে দেশ দেখিবার, দেশ চিনিবার, দেশকে বুঝিবার কাজে নিয়োগ করিতে হইবে। দেশকে

না চিনিয়া না জানিয়া যে কত লোক দেশের নেতা হইতেছে আর ভ্রমের পর ভ্রমে নিপতিত হইয়া বারংবার প্রভাবাধীন কর্ম্মিসম্প্রদায়ের জীবনব্যাপী কর্ম্মব্রতে নানা বিঘ্ন, চ্যুতি, স্খলন ও বিড়ম্বনা ঘাটাইতেছে, ইহার কারণ কি এই নহে যে, তোমরা 'নীত'র দল নিজের দেশের কিছুই জান না ? একদল ক্ষুদ্র নেপোলিয়ান সমগ্র ফ্রান্স জুড়িয়া ছড়াইয়া ছিল বলিয়াই না তাহাদের সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে পরিচালনা করিয়া ত্রিলোক-বিস্ময় নেপোলিয়ানের আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছিল ? নিজের দেশকে চিনে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লক্ষ লক্ষ 'নীত' যখন আপনা আপনি নিজেদিগকে গড়িয়া তুলিবে, তখনই না নিজের দেশকে চিনেন, এমন সুমহান্ ত্রিলোক-স্তম্ভনকারী মহানেতার আবির্ভাব ঘটিবে।''

একনিষ্ঠা ও অসাম্প্রদায়িকতা

নোয়াখালী-চাটখিল-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

''কেহ না রুষ্ট হয়, কাহারও না মতামতের উপরে আঘাত লাগে, এভাবে দুইটী মিষ্টি-কথা কহিতে পারিলেই বাহিরের লোকে তোমাকে মহান্ অসাম্প্রদায়িক বলিয়া প্রশংসা করিবে। এইরূপ সুলভ অসাম্প্রদায়িকতা সম্প্রতি খুবই প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। কিন্তু মুখে অসাম্প্রদায়িকতার চারু-বাক্য বলিয়া অন্তরের অন্তস্থলে সাম্প্রদায়িকতার হলাহল পোষণ করিবার লোকের অভাব কি ? 'সকল মতই সত্য, সকল পথেই ভগবান্‌কে মিলে',— একথা বলিয়া যাঁহারা যত অধিক কলরোল করিবে, তাঁহারাই

আবার মনে মনে ভিন্ন মতের ভিন্ন পথের লোকের প্রতি তত বেশী রুষ্ট, তত বেশী বিদ্বিষ্ট, তত বেশী ঈর্ষ্যান্বিত দেখিতেছি। তোমরা এরূপ অসাম্প্রদায়িক হইও না। মুখে যেমন বলিবে, —'সকল মতই সত্য', মনেও তেমন সকল মতাবলম্বীর প্রতি প্রীতিপূর্ণ শ্রদ্ধাযুক্ত ভাব পোষণ করিবে। তোমার পন্থা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, একথা ভাবিলে দোষ হয় না, বরং তাহা না ভাবিলেই দোষ হয়। কারণ, নিজের পন্থাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া না জানিলে সাধনে একনিষ্ঠা থাকে না, সাধন-কালে মনের বল অটুট রহে না। শ্রীনাথ এবং জানকীনাথ উভয়কেই পরমাত্মদৃষ্টিতে এক জানিয়াও পরম-ভক্ত হনুমান একমাত্র জানকীনাথে মনঃ-প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন,—ইহাকে সাম্প্রদায়িকতা বলিব না। কিন্তু মহাবীর হনুমান জানকীনাথের প্রতি ঐকান্তিকী নিষ্ঠার পরিচয় দিতে গিয়া যদি জগজ্জোড়া শ্রীনাথের মন্দিরগুলি ভাঙ্গিতে সুরু করিতেন এবং শ্রীনাথের ভক্তগণকে পথে ঘাটে তাড়া করিয়া বিপর্য্যস্ত করিতেন, তবেই তাঁহাকে সাম্প্রদায়িকতাবাদী বলিয়া আখ্যা দিতাম। তুমি তোমার ইষ্টকে মনঃপ্রাণ দিয়াই ভজনা কর, একজনকে ছাড়িয়া দশজনে বা এক পথ ছাড়িয়া দশ পথে তোমার মনকে তুমি প্রাণান্তেও বিচরণ করিতে দাও না,—ইহা সাম্প্রদায়িকতা নহে—ইহা একনিষ্ঠা। কিন্তু যেহেতু তুমি তোমার ইষ্টে একনিষ্ঠ, সেই হেতু তুমি অন্য মতের সাধককে অন্য পথের পথিককে ঘৃণা করিবে, বিদ্বেষ করিবে, ঈর্ষ্যা করিবে, তাহার অহিত চিন্তা করিবে, তাহার তপোবিঘ্ন উৎপাদন করিবে, তাহার ভাব নষ্ট করিবার জন্য তাহার মনে নিত্য নূতন দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, শঙ্কা

ও সন্দেহ প্রভৃতির সৃষ্টি করিবে,—ইহারই নাম সাম্প্রদায়িকতা।"

অপরের মনে সংশয়-সৃষ্টির দোষ

ঐ পত্রেই শ্রীশ্রীবাবামণি আরও লিখিলেন,—"অবশ্য তোমার মনে একটী প্রশ্ন স্বতঃই উদিত হইবে যে, ভিন্ন-মতাবলম্বীকে স্বমতে আনয়নের জন্য এবং যেহেতু আমার নিজ পথই জগতের শ্রেষ্ঠ পথ, সেই হেতু তাহাকে আমার স্বপথে আনয়নের দ্বারা জগতের শ্রেষ্ঠ সাধন-কৌশলের অধিকারী করিবার মহদুদ্দেশ্য নিয়া যদি অপরের মত ও পথের সমালোচনা দ্বারা তন্মত ও তৎপথ আশ্রয়কারীর অন্তরে শঙ্কা, সন্দেহ, সংশয় প্রভৃতির উৎপাদন করি, তবে তাহা কেন নিন্দনীয় হইবে ? আমার উত্তর এই যে, এই ক্ষেত্রে তোমার আচরণ নিন্দনীয় হইবে এই জন্য যে,

"প্রথমতঃ, তুমি অপরকে নিজ পথে ডাকিয়া আনিতে গিয়া নিজ ইষ্ট-সাধনার মূল্যবান সময়ের কিয়দংশ অপব্যয়িত করিতেছ,—

"দ্বিতীয়তঃ, তুমি নিজ ইষ্টে সমগ্র মনঃপ্রাণ দিয়া লাগিয়া থাকিলেই বিনা চেষ্টায় ভিন্ন-মতাবলম্বীরা আসিয়া আপনা আপনি তোমার মতে দীক্ষিত হইতে বাধ্য হইবে,—

"তৃতীয়তঃ, তোমার নিজ ইষ্টনিষ্ঠা ও সাধনানুরাগ বর্দ্ধনের জন্য তুমি নিজের মত ও পথের যেটুকু ব্যাখ্যা অপর মত ও পথের নিন্দা না করিয়া বা তাহাদের অবিরোধী ভাবে প্রচার করিবে, তাহা দ্বারাই তোমার ধর্ম্মসঙ্গে সমসাধকের সংখ্যা প্রত্যাশাতীত ভাবে বর্দ্ধিত হইবে,—

"চতুর্থতঃ, তোমার জীবনের দেদীপ্যমানা তপস্যা দর্শনে যাহারা তোমার মতানুবর্ত্তী হইবে, তাহারা বিনা তর্কে বিনা বিচারে তোমার উপলব্ধ সত্যকে অনায়াস-প্রযত্নে গ্রহণ করিবে।

"জানিও, স্বমতাবলম্বী সাধকের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক, —এরূপ কামনা দোষের নহে। বরং জগজ্জোড়া সকল নর-নারী প্রেমিক হউক, সাধক হউক, তপস্বী হউক, শ্রেষ্ঠপথাশ্রয়ী হউক, এই কামনা না করাই একটা নিদারুণ রকমের সঙ্কীর্ণতা। কিন্তু কাহারও মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করার দায়িত্ব তুমি গ্রহণ করিতে পার না। একমতের প্রতি যাহার মনে সংশয় সৃষ্টি করিতে যাইতেছ, পরিণামে হয়ত জগতের সকল মতের প্রতিই তাহার মনে চিরস্থায়ী সংশয় সৃষ্টি হইবে এবং তাহাতে চিরকালের জন্য তাহার পরম ক্ষতি সাধিত হইবে।"

সম্প্রদায়-পুষ্টির বৈধ অধিকার

ঐ পত্রে শ্রীশ্রীবাবামণি আরও লিখিলেন,—

"একটী মাত্র অবস্থা আছে, যেই অবস্থায় স্বমতভুক্ত ব্যক্তিদের সংখ্যাবৃদ্ধির চেষ্টা সাধক মাত্রেরই পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। চতুর্দ্দিকে নাস্তিক, অসাধক, ধর্ম্মদ্বেষী বা বিরুদ্ধ সমালোচকদের দ্বারা চক্রব্যূহে সপ্তরথী কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত অভিমন্যুর ন্যায় অবস্থায় পড়িয়া নিশ্চিন্তে নিরুদ্বেগে কাহারও সাধন-ভজন চলিতে পারে না। নিখিল সংসার তখন শূন্যময় বোধ হয়, কারণ, প্রাণের বেদনা প্রকাশ করিয়া বলিবার জন্য পর্য্যন্ত একটী প্রাণীকে পাওয়া যায় না। প্রাণ খুলিয়া ভগবানের কথা বলিবার জন্য বা

শুনিবার জন্য একটী সঙ্গি-সাথীর দর্শন মিলে না। তখন মুখ ফুটিয়া কাঁদিবার জন্য একটা স্থান পাইলেই যেন কত শান্তি, কত আসান বোধ হয়। এমত অবস্থায় তোমার সম্প্রদায়-পরিপুষ্টির একান্ত প্রয়োজন আছে। যেই পল্লীতে একটী বা দুইটী মাত্র অখণ্ড নিজ নির্ব্বিরোধ উপাসনা-পদ্ধতির প্রতি চতুর্দ্দিকের বিরুদ্ধতার চাপে প্রাণ কণ্ঠাগত বোধ করিতেছ, সেই পল্লীতে তোমার সাধন-গোষ্ঠীর দ্রুত ব্যপকতা সাধনের জন্য সর্ব্বপ্রকার বহির্ম্মুখ প্রচারে লিপ্ত হওয়ার তোমার বৈধ অধিকার রহিয়াছে। কেননা, এই অধিকারের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সফল প্রয়োগের দ্বারা তোমার একনিষ্ঠ প্রযত্নে সাধন-ভজন করিবার সৌকর্য্য ও সুযোগ বর্দ্ধিত হইবে।

"যে ক্ষেত্রে মতহীন, পথহীন ব্যক্তিকে বা ভ্রান্তপথাশ্রয়ী ব্যক্তিকে সত্য পথের সন্ধান দিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত করিলে তোমার নিজের ইষ্টনিষ্ঠা বর্দ্ধনের সহায়ক হইবে, সেই স্থলেও নিজ হিতকল্পেই তুমি স্ব-সম্প্রদায়পুষ্টিতে মন দিতে পার। এই ক্ষেত্রে সম্প্রদায় বিস্তারের সর্ব্ববিধ চেষ্টা তোমার পক্ষে বৈধ এবং অবলম্বনীয়। কিন্তু সম্প্রদায়ের সংখ্যাগত পরিপুষ্টি সাধনের পরে যদি তুমি সাধনে নিষ্ঠাশীল না হইয়া কেবলই বহির্ম্মুখ ব্যাপারে লিপ্ত থাক, তাহা হইলে তোমার অধিকারের সুপ্রয়োগ যে হয় নাই, ইহা নিশ্চিতই স্বীকার করিতে হইবে।"

দেবতার সমাজ চাহি ;—শূদ্র বা ব্রাহ্মণের নহে

ময়মনসিংহ সিংরৈল-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের

উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"জগতে কোনও প্রাণীই নিজ আকৃতির জন্য ঘৃণ্য বা বরণীয় হয় না, প্রত্যেকেরই আদর বা অনাদর সম্পূর্ণ-রূপে তাহার প্রকৃতির জন্য হইয়া থাকে। এই একটী মাত্র কথা স্মরণ রাখিলেই এক জাতি-বিশেষের প্রতি অপর জাতি-বিশেষের সম্মাননা বা অশ্রদ্ধার কারণ সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিবে। কিন্তু একটী শূকর তাহার প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত করিয়া গোজাতির প্রকৃতি আয়ত্ত করিতে সমর্থ নহে, পরন্তু একজন নিম্নাধিকারী মানুষ অভ্যাস, সাধন ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার বলে উচ্চাধিকারী মহামানবের প্রকৃতি অল্পে অল্পে আয়ত্তীকৃত করিতে পারে,—সম্যক্ যদি নাও পারে, অংশতঃ নিশ্চিতই পারে। অভিজ্ঞ পশুপালকেরা এবং দক্ষ বৈহঙ্গমিকেরা পশু বা পক্ষীকে বংশানুক্রমিক ধারায় নির্দ্দিষ্ট ভাবে শিক্ষা দিতে দিতে তাহাদের প্রকৃতির অতি অল্পাংশের মাত্র পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারেন, পরন্তু মানুষ নিজের চেষ্টায় নিজের প্রকৃতিকে জয় করিয়া উচ্চতর স্তরে অধিরোহণ করিতে পারে। বুদ্ধিমান্ পশু-পালক বা বৈহঙ্গমিক তৎ-প্রতিপালিত পশু বা পক্ষীর ভিতরে অপশুসুলভ বা অপক্ষিসুলভ গুণের বিকাশের চেষ্টা না করিয়া পশু বা পক্ষীর অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক প্রকৃতির মধ্যেই কোনও কোনও লোকরঞ্জক বা লোকহিত-বিধায়ক ভঙ্গিমাটীর নিরতিশয় চর্চ্চা করাইয়া তাহারই বিশেষ প্রস্ফুটনের ও পরিপ্রকাশের চেষ্টা করেন। পরন্তু মানবের অন্তরে অনন্ত বিকাশের সম্ভাবনাসমূহ অন্তর্নিহিত থাকায় অপরের দ্বারা বাধ্যীকৃত না হইয়াও মানব নিজের ইচ্ছায়, নিজে রুচিতে,

নিজের চেষ্টায়, নিজের সাধনের বলে, নিজের একনিষ্ঠ তপস্যার মহাশক্তিতে নিজের চণ্ডালত্ব ঘুচাইয়া ব্রাহ্মণত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করিতে পারেন, অথবা নিজের ব্রাহ্মণত্ব খোয়াইয়া চণ্ডালচরিত্র লাভ করিতে পারেন। এই কারণেই জাতি-বিশেষের প্রতি বদ্ধমূল বিরুদ্ধ-ভাব পোষণের কাহারও অধিকার নাই এবং ব্যক্তি হিসাবে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই জাতির গণ্ডীর বাহিরে রাখিয়া বিচার করা কর্ত্তব্য। কাল যে অনার্য্য ছিল, আজ সে নিজ চরিত্রের উন্নতি-সাধন করিয়া আর্য্যোত্তম হইতে পারে। কাল যে অনাচরণীয় ছিল, আজ তাহার তপঃ-সিদ্ধির অলৌকিক প্রভায় তাহার ম্লেচ্ছত্ব ঘুচিতে পারে। কাল যে অনাদৃত অবজ্ঞাত অপাংক্তেয় ছিল, আজ সে ঋষি-সত্তমগণেরও অগ্রগণ্য বলিয়া প্রপূজিত হইতে পারে। নিকৃষ্ট প্রকৃতির জন্যই যদি কেহ নীচ জাতি বলিয়া ঘৃণিত হইয়া থাকে, উৎকৃষ্ট প্রকৃতি লাভ মাত্র তাহাকে উচ্চ জাতি বলিয়া সম্বর্দ্ধনা করিবার বাধা তোমরা কোথায় দেখিতেছ। আমি ত' ইহাতে বাধা দেখি না। যে যত নীচ হইয়া রহিয়াছে, তাহাকে তত উচ্চ হইবার সুযোগ তোমরা দিবে। ইহাদ্বারা তোমাদের উচ্চতার দাবিই বরং সমর্থিত হইবে। সমাজের নিম্নস্তরের লোকগুলির প্রকৃতি যদি দেবজনোচিত হয়, তবে একদিকে তাহা তাহাদের উচ্চতালাভের উপায় এবং কারণ হইবে, অপর দিকে সমগ্র সমাজের ব্যপক উন্নতির উহা সূচনা হইবে। যেই যাহাকে অশ্রদ্ধা বা অনাদর করিয়া থাকুক, কারণ-বশতঃই করিয়াছে, অকারণে করে নাই, এই কথাটী স্মরণ রাখিলে নিম্নস্তরে অবনমিত ব্যক্তিদের উত্থান-লাভের

উপায়াবলম্বনে সত্বরতা আসিবে। আর, প্রকৃতির পরিবর্ত্তন মাত্র ম্লেচ্ছাধম দ্বিজোত্তম হয়, দ্বিজোত্তম ম্লেচ্ছাধম হয়, এই কথাটী মনে রাখিলে সমাজের উচ্চতর স্তরে অবস্থিত ব্যক্তিদের একদিকে সুবিচারের ক্ষমতা বর্দ্ধিত হইবে, অপর দিকে নিজের শ্রেষ্ঠত্বকে ধর্ম্মবলে অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য অধ্যবসায়ের আত্মপ্রকাশ ঘটিবে। শুধু গালাগালি দিয়া, শুধুই কটূক্তি বর্ষণ করিয়া, শুধুই কতকগুলি মনগড়া অভিযোগ বিনাইয়া উত্থাপিত করতঃ উচ্চ ও নীচের মধ্যে একটা চিরস্থায়ী কলহের সৃষ্টি, পুষ্টি ও প্রসার ঘটাইয়া সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইবে, এইজাতীয় গঞ্জিকা-সেবি-সুলভ মতবাদ আমি মানি না। কেন কে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রপূজিত হইয়াছিল, কেন কে নিকৃষ্ট বলিয়া পংক্তি-বহির্ভূত হইয়াছিল, তাহার কারণ তোমরা অপক্ষপাত দৃষ্টিতে অনুসন্ধান কর এবং কে কি করিলে অপরের সহিত কলহ না করিয়া উচ্চতম স্তরে আরোহণ করিতে পারে, তাহারও পন্থা-নির্ণয় কর। অপরকে গালি না দিয়াও উচ্চচরিত্র ব্যক্তি নিজের উচ্চতা অক্ষুন্ন রাখিতে পারে, অপরকে বিদ্বেষ না দেখাইয়াও নিম্নস্তরের নরনারীরা উচ্চচরিত্রের অধিকারী হইয়া স্বাভাবিক ভাবে উচ্চজনের প্রাপ্য মান-মর্য্যাদার অধিকারী হইতে পারে। ধনে নহে, কৌশলে নহে, ফাঁক-ফন্দীতে নহে, একমাত্র নিজ প্রকৃতিকে প্রাকৃত-জনোচিত নীচতার ঊর্দ্ধদেশে স্থাপন করার নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা দ্বারাই তাহা সম্ভব হইবে। এই মূলসূত্র ভুলিয়া গিয়া তোমরা যে যত দিকে যত চেষ্টা করিতেছ, সকলই কুক্কুর-কলহ সৃষ্টি করিতেছে। প্রত্যেকে সর্ব্বাগ্রে নিজ প্রকৃতিকে চিন এবং তাহাকে জয় করিয়া

তাহার উর্দ্ধে নিজেকে স্থাপন করিয়া দেবতা হও। ভারত আজ দেবতার সমাজ চাহে, ব্রাহ্মণ বা শূদ্রের সমাজ নহে।''

অন্তরের পশুত্বকে বধ কর

নোয়াখালী-চণ্ডীপুর-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

''বাহিরে জামা-জুতা পরিয়া দৈহিক সৌন্দর্য্যের সর্ব্ববিধ চাক্‌চিক্য সম্পাদন করিয়া টেড়ী কাটিয়া উড়ানি উড়াইয়া আতরের গন্ধ চতুর্দ্দিকে বিকিরণ করিতে করিতে তুমি যখন নদীর পারের পাথর-বাঁধান প্রশস্ত পথে সান্ধ্য-ভ্রমণ কর, তখন কি তোমার সহ-পথিকেরা কল্পনায়ও জানিতে পারেন যে, তোমার জামার নীচের কদর্য্য দদ্রু তোমার সর্ব্বাঙ্গ ছাইয়া অবিরাম কণ্ডূতি সৃষ্টি করিতেছে ? ঠিক তেমনি তোমার অন্তরের স্বভাব বাহিরের দৃষ্টিতে তুমি নিজেও দেখিতে পাও না, তজ্জন্য অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন। বাহিরে তুমি শ্রেষ্ঠি-পুত্র, ধনীর দুলাল, লক্ষপতির উত্তরাধিকারী, ভিতরে হয়ত তুমি লোভকাতর হীনচরিত্রের দীনতম দরিদ্র। বাহিরে তুমি ব্রাহ্মণ, আর ভিতরে হয়ত শ্বপচের চেয়েও নিম্নবৃত্ত। বাহিরে তুমি বিনয়ী, নম্র লাজুক, ভিতরে হয়ত উদ্ধত, দাম্ভিক ও চরম নির্ল্লজ্জ,—পাপে তোমার লজ্জা নাই, পরস্বাপহরণে তোমার লজ্জা নাই, দরিদ্রের কষ্টার্জ্জিত ক্ষুদকণা সুকৌশলে কাড়িয়া নিয়া তাহাকে পথের ভিখারী করিয়া আত্মপ্রসাদ আস্বাদন করিতে লজ্জা নাই। বাহিরে তুমি পণ্ডিত, বিদ্বান্, কবি, আর ভিতরে হয়ত তুমি কামোন্মত্ত পশু,

হিতাহিতবোধ-বর্জ্জিত সম্বন্ধ-সঙ্গতি-বিচারাক্ষম একটা জঘন্য নারকী মাত্র। তুমি যে ক্রোধের দাস, কামের ক্রীড়নক, একথা কি তোমার বাহিরের কৃত্রিম শিষ্টতা ও অত্যন্ত ভদ্রতা হইতে কেহ অনুমান করিতে পারিবে ? নিজের ভিতরের দিকে দৃষ্টি-প্রেরণ করিলে তুমি নিজে তোমার নিজের অবস্থা বুঝিতে সমর্থ হইবে,—অপর সাধারণের তাহা সাধ্য নহে। যদি কুশল চাও, তাহা হইলে অন্তরের দিকে তাকাও, আর নিজের নীচতা প্রাণান্ত যত্নে দূরীভূত করিয়া প্রকৃত মানুষ হও। জগৎ জুড়িয়া মানুষ খুঁজিয়া মানুষের মুখচ্ছবিতে ধূর্ত্ত শৃগাল, কলহ-রত কুক্কুর আর কদর্য্য-সেবী শূকরের প্রতিচ্ছবি দেখিয়া জগতের পরিত্রাণ-কামী মহাজনগণের প্রাণে আতঙ্ক সৃষ্ট হইয়াছে। তোমরা একে একে প্রাণপণ যত্নে অন্তরের পশুত্বকে বধ করিয়া প্রকৃত মানুষ হও।''

বাসনা, কর্ত্তৃত্বলিপ্সা ও ভগবন্নাম

খুলনা-দৌলতপুর-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

''অন্তরের অন্তঃস্থল ব্যাপিয়া বাসনা যে মূল ও উপমূল সমূহ প্রসারিত করিয়াছে, ভগবানের নামের শক্তি লইয়া তাহা সবলে উপাড়িয়া ফেল। ভগবন্নামই একমাত্র অস্ত্র, যাহার দ্বারা বিষমিশ্রদুগ্ধদাত্রী এই মহারাক্ষসী পূতনাকে বধ করা সম্ভব হইবে। বাসনা-বিমুগ্ধতার সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি হইল কর্ত্তৃত্ব-লিপ্সা। যতক্ষণ তোমার বাসনা শুধু তোমাকে লইয়া খেলা করে, ততক্ষণ ইহার শান্তি-অশান্তির ঝড় একা তোমার উপর দিয়াই বহাইয়া

চলে, কিন্তু যখন ইহা কর্ত্তৃত্ব-লিপ্সার মূর্ত্তি ধরে, তখন বহু ব্যক্তির ব্যক্তিগত বাসনার উপরে ইহা নিজ প্রভুত্বের দাবী করে এবং এমন কি বাসনা-বর্জ্জিত নিষ্কামচেতা তপস্বীর পরানপেক্ষী প্রশান্ত শান্তির উপরে পর্য্যন্ত অশান্তির ছায়াপাত করে। এই জন্যই প্রভুত্ব-প্রয়াসী দুর্য্যোধন সমগ্র জগতের শত্রু এবং ধর্ম্মাশ্রিত প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার বিরুদ্ধবাদী। তোমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংসারে আর আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আশ্রমে এক একটী ব্যক্তির বাসনার শিখা বাড়িতে বাড়িতে তাহাকে দহিয়া পুড়িয়া একেবারে ছাই করিয়া দিয়াও অপার অসীম অকূল ঔদ্ধত্যে বাড়িয়াই যায় এবং কর্ত্তৃত্বলিপ্সার সর্ব্বনাশিনী মূর্ত্তি ধরিয়া, ঐ গণ্ডীটুকুর মধ্যে যতগুলি প্রাণী শান্তিতে নিশায় উপাধানে মস্তক বিন্যস্ত করিত, তাহাদের প্রত্যেকের মনের শান্তি হরণ করিয়া সুখনিদ্রিতের সুখ এবং নিদ্রা উভয়ই সম্যক্ নষ্ট করে। বিষয়-বাসনাই অবারিত ভাবে বাড়িতে বাড়িতে এমন এক নিদারুণ আত্মঘাতী অভিমানের সৃষ্টি করে, যাহার প্রতিবাদ করিবার সাহস কাহারও হইবে না, যাহার প্রতিরোধকল্পে শাস্ত্র হইতে বা সাধু-সন্তের হিত-বচন হইতে উপদেশ-মধু আহরণ করিয়া পরিবেশন করিতে গেলে, শাস্ত্র হইতে বা সাধু জীবন হইতে নহে, কর্ত্তৃত্ব-লিপ্সুর তূণীর হইতে শল্যরূপ মক্ষিকাকুল বহির্গত হইয়া সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিবে। সহস্র বিষয়-বিরাগী শুদ্ধ-চেতা মহদ্ব্যক্তির মাঝখানে হঠাৎ একটী প্রভুত্ব-লিপ্সু ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটা-মাত্র তপোবন কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গনে পরিণত হয়, শান্তিময় ভগবৎ-সঙ্গীতের স্থানে অশান্তিময় কলহ-কোলাহল আসিয়া অভিযান করে। পৃথিবীর

অপরিমেয় দুঃখ এই কর্ত্তৃত্ব-লিপ্সুরা সৃষ্টি করিয়াছে এবং অশান্তির অনলে নিজেরাও দগ্ধ হইয়াছে, অপর শত শত নিরপরাধ ব্যক্তিকেও দহিয়া মারিয়াছে। এই কারণেই বাসনা-রূপিণী যম-যন্ত্রণা-দায়িনী রাক্ষসীকে অঙ্কুরেই বিনাশ করিবার চেষ্টা করা আবশ্যক, যেন তাহা প্রশ্রয় পাইতে পাইতে কর্ত্তৃত্বলোভরূপ এক মহামহীরূহে পরিণত না হইতে পারে। এবং তাহার সুনিশ্চিত ও অভ্রান্ত উপায় হইতেছে ভগবানের নামে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ।"

সুন্দর হইবার উপায়

যশোহর-মাগুরা নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"মনের ভিতরে যে চিন্তাটীর অনুশীলন করিবে, মুখের উপরে তাহার একটা ছাপ পড়িবেই পড়িবে। গঠন-সৌন্দর্য্যে সুন্দর মুখ জগতে কতই দেখা যায়, কিন্তু প্রভাব-সৌন্দর্য্যে কয়টী মুখ প্রকৃতই সুন্দর ? শ্রীরামকৃষ্ণ বা মহাত্মা গান্ধীর মুখমণ্ডল গঠন-সৌন্দর্য্যে গ্রীক-ভাস্করদের নিকট নিশ্চয়ই লোভনীয় হইত না, অনেক সাধারণ এবং সৌন্দর্য্যহীন লোকদের মুখের গঠনই এইরূপ দেখা যায় কিন্তু তবু যে এই দুইখানা মুখ জগতের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোকের কাছে আদরের বস্তু, এমন কি অনেকের নিকটে ধ্যানের বস্তু পর্য্যন্ত হইয়াছে, তাহা কিসের বলে ? ইহা কি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ ? যে চিন্তা বা ভাবের নিকটে আত্মসমর্পণ করিয়া ইঁহারা জগতে অমর হইলেন, সেই চিন্তা বা

ভাব ইঁহাদের মুখমণ্ডলে প্রভাব সৌন্দর্য্য সষ্টি করিয়াছে বলিয়াই না ঐ মুখ ঐ চোখ এত সুন্দর, এত আকর্ষণীয়, এত অপরূপ-মাধুরী-মণ্ডিত ? তোমরাও উচ্চ চিন্তার অনুশীলন কর, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, ত্যাগ, পরসুখেচ্ছা, জীবহিত, জীবে দয়া, নামে রুচি, ভক্তি এবং পরম-প্রেম মুখমণ্ডলে ফুটিয়া উঠিয়া ঐ মুখখানার প্রতি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের ভালবাসা আকর্ষণ করিবে। ওটীন বা হেজেলিন স্নো মাখিয়া মুখের সৌন্দর্য্য বাড়ে না, প্রেমময়ের চরণ-কোনে মন প্রাণকে ডুবাইয়া দিলে চ'খে মুখে যে প্রেমভাব ফুটিয়া উঠে, তাহাই মুখকে সুন্দর করে। গর্ব্বিত চরণে পথের বুকে পদাঘাত হানিয়া যে দলে দলে মূর্ত্তিমান্ দম্ভগুলি, বনচারিণী পার্ব্বত্য গাভীকুলের মধ্যে গর্ব্বিত বনবৃষের মত চরিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদের যে চিনিতে পারিতেছ, উহা তাহাদের ঠোঁটের গঠন বা চোয়ালের আকৃতি হইতে নহে। উহাদের মনের বিকার মুখের উপরে যে প্রতিচ্ছবি আঁকিতেছে, তাহা দেখিয়াই উহাদের চিনিতে পারিতেছ। প্রকৃতই কে সুন্দর, প্রকৃতই কে অসুন্দর, তাহা এই ভাবেই চেনা যায়। মনের গভীরে ডোব, লুপ্ত সুপ্ত সকল হীরা-মাণিক উদ্ধার কর, তাহাদের দীপ্তিকে নিরন্তর অনুশীলনের বলে জাগাইয়া তোল, সেই উদ্ধৃতি সেই জাগৃতি তোমাকেও সুন্দর পরমসুন্দর করিবে।"

(একাদশ খণ্ড সমাপ্ত)